GIFT

গণমাধ্যম : বিংশ শতকে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

এমফিল অভিসন্দর্ভ

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম

465271

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গণমাধ্যম : বিংশ শতকে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

(এমফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

সাদিয়া মাহ্‌জাবীন ইমাম

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ২২৪

শিক্ষা বর্ষ - ২০০৪-২০০৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

465271

465271

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ

অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে 'গণমাধ্যম : বিংশ শতকে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা। জানামতে, এ শিরোনামে এর আগে কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অথবা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

13.7.2011

সাদিয়া মাহ্‌জাবীন ইমাম।

465271

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Dalem Ch. Barman
Professor and Founder Chairman
Department of Peace and Conflict Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

E-mail: dalembarman@yahoo.com
Fax: 880-2-8615583
Phone: 880-2-8618269 (Res.)
Cell: 880-2-01552334300

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এমফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে সাদিয়া মাহ্‌জাবীন ইমামের উপস্থাপিত 'গণমাধ্যম : বিংশ শতকে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' শীর্ষক গবেষণাটি সম্পূর্ণরুপে আমার তত্ত্বাবধানে তৈরী মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে এই শিরোণামে কোন অভিসন্দর্ভ এর আগে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং তা এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

তারিখ

13/7/11

ড.ডালেম চন্দ্র বর্মণ

Professor
Department of Peace and Conflict Studies
University of Dhaka, Dhaka.

অধ্যাপক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা অধ্যায়

১ম অধ্যায় ঃ উদ্দেশ্য-গঠন পরিকল্পনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উপমহাদেশে গণমাধ্যম

২য় অধ্যায় ঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচিতি

৩য় অধ্যায় ঃ বঙ্গভঙ্গ পূর্ব উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান

৪র্থ অধ্যায় ঃ বিংশ শতকে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গার কারণ

৫ম অধ্যায় ঃ গণমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ গণমাধ্যম ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু

৭ম অধ্যায় ঃ বিশিষ্ট জনের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণমাধ্যম

৮ম অধ্যায় ঃ উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায় ঃ উদ্দেশ্য-গঠন পরিকল্পনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উপমহাদেশে গণমাধ্যম

১. উদ্দেশ্য- গঠন পরিকল্পনা

ক. গবেষণার উদ্দেশ্য-পরিধি ও পদ্ধতি

বাংলাদেশের সংবিধানে ২৭ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। ২৮ (১) ধারায় রয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না'। ৪১ এর ১ এর ক নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য ও তা মেনে চলার অধিকার রয়েছে। ৪১ এর ১ এর খ-এ আছে 'প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়ের তাদের ধর্মকে প্রচার, অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অধিকার রয়েছে।' কোন কোন দেশের সংবিধানে দেশকে অসাম্প্রদায়িক উল্লেখ না করলেও সাম্প্রদায়িকতার কথা কোন সংবিধানে উল্লেখ নেই। তারপরও কেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটছে? বিশেষ করে এ উপমহাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুদের মধ্যে দীর্ঘদিনের চলমান সহিংসতা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত। জের বহন করছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। আর এর শেষ যে কেমন করে হবে তারও সুনির্দিষ্ট কোন পথ নেই। মানব সমাজের এই ক্রমাগত ক্ষয়-ব্যধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখেছিলেন। তারই কথায় উঠে এসেছে 'হত্যা অরণ্যের মাঝে/ হত্যা লোকালয়ে/ হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে/ কীটের গহ্বরে অগাধ সাগর জলে/ নির্মল আকাশে/ হত্যা জীবিকার তরে/ হত্যা খেলাচ্ছলে/ হত্যা অকারণে/ হত্যা অনিচ্ছার ফলে'।

সাম্প্রদায়িকতার এ ভয়াবহ ব্যধির ধরণ অসংখ্য। তবে ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় ধর্মীয় অনুভূতি। আলোচনার বিষয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্মের বিরোধের ফলে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে যেসব সাম্প্রদায়িকতার ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম গণমাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যম ইচ্ছে করলেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়িয়ে দিতে পারে, আবার তার পক্ষেই সম্ভব দাঙ্গার উগ্রতা প্রতিহত করা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে তাই গণমাধ্যম বড় নিয়ন্ত্রক। গণমাধ্যম যদি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি যথাযথভাবে পালন করে তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই শুধু নয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে সে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ি তা প্রকাশের সঠিক উপায়ের মধ্য দিয়ে সমাধানের দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

আমি এ গবেষণায় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা, সামাজিক, রাজনৈতীক, অর্থনৈতীক, ধর্মীয় স্থিতিশীলতা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর প্রমান দিতে যেয়ে আমাকে কয়েকটি দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা করেছি। দাঙ্গার পেছনের ইতিহাস, দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার দিনের বর্ণনা, এতে সমসাময়িক গনমাধ্যমের ভূমিকা ও দাঙ্গার ফলাফল কি তুলে ধরেছি।

তথ্য হিসেবে আমি প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি দু'ধরণের তথ্য ব্যবহার করেছি। প্রাইমারি হিসেবে সরাসরি লাইব্রেরীর পুরণো সংবাদপত্র থেকে ঘটনার বিবরণ ও ছবির ব্যবহার, দাঙ্গার সমসাময়িক ব্যক্তিদের সাথে কথা বলেছি, দাঙ্গা ও গণমাধ্যম সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের সরাসরি মতামত গ্রহন করেছি যা এ গবেষণার ৫ম ও ৭ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেকেন্ডারি ডাটা হিসেবে আমি বিভিন্ন বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল, সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্য ও লিংক, ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার সংবাদ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করেছি।

আমার গবেষণার পরিধি ক্ষেত্র ভারত উপমহাদেশ। এখানে ভারতের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেগুলো ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে তৈরি হয়েছে সেগুলো আলোচনায় এনেছি। বাংলাদেশের পাকিস্তান সময়ে ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ধর্মীয় কারণে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন আলোচনা করেছি। অনেক ধরণের হলেও গবেষণায় মূলত গণমাধ্যম হিসেবে ধরা হয়েছে সংবাদপত্রকে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য এ বিষয়টি প্রমান করা যে, গণমাধ্যম আসলে সাম্প্রদায়িকতায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা? এবং প্রতিহত করার ক্ষমতা গণমাধ্যমের রয়েছে কিনা? অতীতের দাঙ্গায় গণমাধ্যম উস্কে দিয়ে মাত্রা বাড়িয়েছে অতএব প্রমান করতে চেয়েছি ইচ্ছে করলে গণমাধ্যম একে প্রতিহত করতে পারতো। আবার অনেক দাঙ্গায় যেখানে পরিস্থিতি আরো অনেক ভয়ানক হবার সম্ভাবনা ছিল সংবাদপত্রই তাকে নিয়ন্ত্রনও করেছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে বড় হাতিয়ার গণমাধ্যম। তাই এ অস্ত্রটির সঠিক ব্যবহারেই সম্ভব ধ্বংস অথবা নির্মাণ।

Dhaka University Institutional Repository

খ.গঠন পরিকল্পনা

১ম অধ্যায়ে- প্রথমেই আমি সম্প্রদায় ও দাঙ্গা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদানের চেষ্টা করেছি। এরপর শিরোনামের সাথে মিল রেখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আসলে কি? এবং কত ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে পারে। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন রুপ। গণমাধ্যম-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছি। উপমহাদেশে গণমাধ্যমের আগমন ও তার ব্যবহার বিষয়ে উল্লেখ করেছি। সংবাদপত্র প্রকাশ ও তার তথ্য প্রদান এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সে তথ্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার ওপর জোড় দেয়া হয়েছে। **২য়** অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচিতির পরিধি ক্ষেত্র হিসেবে উপমহাদেশকে রাখায় এখানে ভারত, পাকিস্ত ান এবং বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো তুলে ধরেছি। যেমন, ১৯৪৬ এর দাঙ্গা, ১৯৫০ ও ৬৪'তে পূর্ব পাকিস্তান রায়ট, ১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদ দাঙ্গা, ১৯৮০ সালে মোরদাবাদ দাঙ্গা, ভিওয়ানদি দাঙ্গা, ১৯৮৯ সালে ভাগোলপুর বিদ্রোহ এবং ১৯৯২ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ দাঙ্গার ফলে দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি।

এর পর **৩য়** অধ্যায়ে বঙ্গভঙ্গ পূর্ব উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচনা করেছি। এ অংশটি উল্লেখ করার কারণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আসলে আজ একবিংশ শতকে যেখানে দাড়িয়েছে সবসময় এই একই রকম ধারাবাহিকতায় ছিল কিনা সেটি স্পষ্ট করার জন্য। এর মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকশ বছর আগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কেমন ছিল এবং বিংশ শতকে কেমন হয়েছে তার উদাহরণ দেয়া হয়েছে এ অধ্যায়ে। এর পরের **৪র্থ** অধ্যায়ে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গার কারণ নিয়ে আলোচনা করেছি। কি কি কারণে সদ্ভাব ছিল এবং কি কি কারণ দাঙ্গার পেছনে অন্তনির্হিত কারণ হিসেবে কাজ করেছে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

এর পরের **৫ম** অধ্যায়ে গণমাধ্যমের চোখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আমি ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময়ের অসহায় মানুষের অবস্থা, শরণার্থী কেন্দ্র, স্টেশনে মানুষের দেশ ত্যাগের ছবি সংযুক্ত করেছি। এই ছবিগুগোলো ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা। ১৯৬৪ ও ৯২ সহ বাংলাদেশের ৯০ এর দশকের পত্রিকার ছবি ও সংবাদ উপস্থাপন করেছি। এখানে ৯০ ও ৯২ এর সময় সংবাদপত্রের উস্কানীমূলক সংবাদ প্রচার এবং ১৯৬৪ সালের সংবাদপত্রের ভাব-মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে। এই সংবাদ- ছবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় আর্কাইভ এর পুরণো সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা। গুজরাট দাঙ্গার সময় গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে ভারতের খোদ প্রেস কাউন্সিলের দেয়া তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। টিভি, রেডিও, ব্লগ, ইন্টারনেট, বই, লিফলেট, পত্রিকাসহ নানারকম গণমাধ্যম উপাত্তের মধ্যে থেকে প্রথমত দাঙ্গার সমসাময়িক পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

বইকে গণমাধ্যমের দৃষ্টি হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **৬ষ্ঠ** অধ্যায়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার সময় আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বইয়ে প্রকাশিত তথ্য থেকে সংখ্যালঘুদের অবস্থানের বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ করেছি। এখানে সংখ্যালঘুদের বর্তমানে নানা বিষয়ে বৈষম্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। **৭ম** অধ্যায়ে বিশিষ্ট জনের কাছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণমাধ্যম ব্যাখ্যা। এ ক্ষেত্রে আমি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা এর ইতিহাস নিয়ে কাজ করা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথা বলে তাদের মতামত তুলে ধরেছি। এদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের বিখ্যাত গান্ধিবাদী অসাম্প্রদায়িক নেতা শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, ১৯৬৪ তে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী গানটির রচয়িতা আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও 'ঢাকার ইতিহাস'সহ উল্লেখযোগ্য অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। এই বিশিষ্টজনেরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কিভাবে দেখছেন এবং তাদের দৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা কি ছিল এবং কেমন হওয়া উচিত এর একটি ধারণা পাওয়া যাবে। **৮ম** অধ্যায় উপসংহার। পুরো আলোচনায় আমি কি বোঝাতে চেয়েছি তার সারসংক্ষেপ বক্তব্য উপস্থাপন করেছি এ অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

২.সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উপমহাদেশে গণমাধ্যম

ক. সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা

সম্প্রদায় শব্দটি জীববিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের বিশেষ্য হলেও সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি আপাদমস্তক নেতিবাচক। তবে ইতিহাস কাল থেকেই এর বিশেষণ নেতিবাচক ছিলনা বর্তমানে এর রুপ নেতিবাচকে রুপান্তরিত হয়েছে। যেমন মৌলবাদ, জঙ্গি বা জিহাদী শব্দ। একসময় যে কোন ধর্মপ্রাণ মানুষকে বা কোন একটি বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিকারি ব্যক্তিকে জঙ্গি সম্বোধন করা হতো, এমনকি জঙ্গি শব্দটি ব্যবহার করে পূর্বে অনেক দল গঠনও হয়েছে কিন্তু এখন এই শব্দ মানেই আপাদমস্তক ত্রাস। তেমনি সাম্প্রদায়িকতাও আপাতদৃষ্টিতে একটি পরিচিতি প্রদানের জন্য ব্যবহার করা নিরপেক্ষ বিশেষণ কিন্তু বর্তমানে শব্দটি নেতিবাচক। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, সনাতন হিন্দু, ধর্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ সে অর্থে মৌলবাদীই হবেন। তবে এ শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটটি ভাববার বিষয়। রেনেসাঁস ও শিল্পবিপ্লবোত্তর পশ্চিম একটি সামাজিক রুপরেখা দাঁড় করিয়েছে, যাকে আধুনিক বিশ্ব অনুসরণ করছে।

পশ্চিমা রাষ্ট্রে এই সমাজের উত্থান ঘটেছে নানাভাবে ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সংকীর্ণ চিন্তাজাত নিয়ম নীতির ফলে দীর্ঘদিন ধরে সমাজের অবক্ষয় ও নানা রকম সংঘর্ষ হতে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসেবে। এর ফলে রাষ্ট্রের সাথে, নতুন সমাজরীতি ও নীতির সাথে নতুন শিক্ষার সাথে, নতুন সংস্কৃতির সাথে ধর্মকে কোন কোন স্থানে সমঝোতার একটি যায়গায় পৌছাতে হয়েছে। তবে সাধারণত ধর্মের মূলনীতি বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তন হয় নি, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও প্রথার ক্ষেত্রেই হয়েছে। এসব বিবর্তনকে অস্বীকার করে কেউ যখন সংস্কারবশত বিলুপ্ত প্রথা অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধ আদিমরুপেই পরিচালনা করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে একই সাথে সেই পুরনো রীতি সমাজে প্রতিস্থাপন করতে চায় তখন তাকে মৌলবাদী আখ্যা দেয়া হয়। তেমনি সাম্প্রদায়িকতা একটি সাধারণ বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধারাবাহিক ঘটনায় শব্দটি একটি নেতিবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে।

একই সরকারের শাষণে একই ভূমিতে যখন এক দল মানুষ বাস করে তাকে সম্প্রদায় বলা হয়। সামাজিকভাবে একই বন্ধনে আবদ্ধ জনগোষ্ঠিও এক সম্প্রদায়ভুক্ত। একই শহরে স্থানীয় একদল মানুষ যখন গোত্রবদ্ধ হয়ে বাস করে সেটাও সম্প্রদায় যেমন প্রবাসী বাংলাদেশিরা যখন বিদেশে একসাথে একই এলাকায় বাস করে সেটাকেও বলা হয় বাংলাদেশি কমিউনিটি যার অর্থ বাংলাদেশি

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায় আবার আমাদের দেশের আদিবাসীরা একটি সম্প্রদায়। তবে এসবই হলো সম্প্রদায়ের সহজ ও অধিক প্রচলিত সংজ্ঞা কিন্তু 'সম্প্রদায়' এ শব্দটির অর্থ আরো বেশি ব্যাপক কারণ সম্প্রদায় বা এ থেকে আসা সাম্প্রদায়িকতা নির্ণয়ের মাপকাঠি আসলে বহুবিধ যেমন সম্প্রদায় তৈরি হয় রাজনৈতিকভাবে- এক রাজনৈতিক মত সমর্থন করলে সেখানে এক সম্প্রদায় তৈরি হতে পারে সেখানে জাতি, ভূমি, বংশগত এসব বিষয় প্রযোজ্য নয়। সম্প্রদায় হতে পারে ভৌগলিকভাবে অর্থাত এক ভূভাগের মানুষ সেখানে আবার রাজনৈতিক মতাদর্শকে উদাহরণ হিসেবে প্রয়োগ না করেও বলা যায় এক সম্প্রদায়ভুক্ত যেমন পাহাড়ীরা। জীবিকার সম্পর্কেও সম্প্রদায় হতে পারে, এক জীবিকার মানুষদেরও একই সম্প্রদায়ভুক্ত বললে তা ভুল বলা হয়না, যেমন তাতী, কামার, মৎস্যজীবী। রয়েছে বর্ণ প্রথা ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিভেদ আসতে পারে। আর সবচেয়ে বেশি যেটা প্রাধান্য পায় সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় সেটি হলো ধর্মীয় বোধ থেকে সম্প্রদায় ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা।

ডক্টর আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার স্বাধীনতা উত্তর কালে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের একজন সক্রিয় সদস্য হওয়ায় তার ভাবনাও চিন্তাশীল। তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে তার মতামত জরুরি। তার মতে, "আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইহজাগতিক দাবি সমূহ নিছক কোন বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী হবার জন্য যখন সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় উপস্থাপনা করতে থাকে, আমার মতে তখনই তা সাম্প্রদায়িকতার মূল বিন্দু হয়ে ওঠে। এর অভিব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের বা বহুবিচিত্র হতে পারে। কিন্তু মূল বিচার্য হল-ইহজাগতিক দাবি সমূহকে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ভাষায় আবরিত করে উত্থাপন করা হচ্ছে কিনা ? সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্র ইহজাগতিকতা; কিন্তু এর বহিরাবরণ প্রায়শই আমাদের প্রতারিত করে।"(১) এটি আরো খানিকটা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন "এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রধানত স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভিজাতদের আশা-আকাংখার প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাকে ভাষা দিয়ে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বাগ্ধারা ও মানুষের আদিম চেতনার প্রতি আবেদন জানাবার জন্য সুকৌশলে সমগ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন-এই ধারণা সৃষ্টি করে। তার সম্প্রদায়ের অস্মিতাকে জঙ্গী ভাষায় জাহির করার পরিণামে জনসাধারণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করার বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করতে গেলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অভিজাতদের পক্ষে তারা সংখ্যালঘু হবার জন্য পক্ষপাতের শিকার হচ্ছেন মনে করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ প্রসঙ্গে যেকথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, তাহলো বক্তব্য যেমন শিখদের মত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে সত্য-আর্থ- সামাজিক বিকাশের জন্য যাদের আশা-আকাংখা দ্রুত বর্ধমান- তেমনি মুসলমানদের মত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও সত্য যারা মনে করেন যে তারা বিকাশের ন্যায়সঙ্গত অংশ থেকে বঞ্চিত এবং সেই কারণে নিজেদের নির্যাতিত বোধ করেন।" (২)

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায় : তাত্ত্বিক সংজ্ঞা

জীববিজ্ঞানের ভাষায় সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠি যারা এক বংশদ্ভুত এবং তাদের পছন্দ, চাহিদা, বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন সর্বোপরি প্রায় এক মানষিকতার পরিচয় বহন করে সংযোগ স্থাপন করে এবং একস্থানে বসবাস করে সেটা একটি সম্প্রদায়।

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সম্প্রদায় হলো একই স্থানে বসবাস করা কিছু মানুষ যাদের নীতি নিয়ম সাদৃশ্যপূর্ণ, একই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পূর্ন জনগোষ্ঠি এবং যাদের সমমনা সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে একই সাথে ভৌগলিক অবস্থানে তারা এক- এমন জনগোষ্ঠিকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সম্প্রদায়ের দুটি ধরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যাশনাল কমিউনিটি বা জাতীয় সম্প্রদায় ও গ্লোবাল কমিউনিটি বা বিশ্ব সম্প্রদায় ।

মানুষের মধ্যে গোত্রীক ও মতবাদী সাম্প্রদায়িক একটা দৃঢ়ঐক্য ও প্রাকৃতিক দৃঢ়তা প্রত্যয় ভিত্তিক ভাবেই হয়ে উঠে। তাই হয় স্থায়ী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আচার-আচরণের বন্ধন। এছাড়া রয়েছে আত্মরক্ষা, আত্মপ্রচার ও প্রসারের এক সহজাত প্রবৃত্তি। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত হলেই আসে প্রচার ও প্রসারের ইচ্ছা। আর এই ইচ্ছা যখন বাধাগ্রস্থ হয় তখন শুরু হয় প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আক্রমনাত্মক মনোভাব। এখান থেকেই সৃষ্টি সংঘবদ্ধ হওয়ার চেতনা। আর তা থেকে তৈরি হয় সম্প্রদায়। প্রাচীনকালেও মানুষ যখন বনজঙ্গলে থাকতো, থাকতো গুহায়-পাহাড়ে তখনও সম্প্রদায় বিষয়টি ছিল। তখন বন্যপশুর আক্রমন থেকে নিজেকে রক্ষা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরের জন্য, খাবার সংরক্ষণের জন্য, বংশবৃদ্ধি ও জৈবিক প্রয়োজনের কারনে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়েছে। একটি গোষ্ঠি অপর গোষ্ঠির আক্রমন থেকে রক্ষা পেতে প্রতিহত করতে এক হয়েছে, তৈরি হয়েছে সম্প্রদায়। তাই সম্প্রদায়ের চেতনা শুধুমাত্র দাঙ্গার সময়কাল বা উপমহাদেশের ধারণার সমসাময়িক নয়। মানুষের ইতিহাসের মতই আদিম ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের রুপ। তবে এই উপমহাদেশে সম্প্রদায়ের বোধ দীর্ঘদিনের হলেও তা কখনো ভাবনার বিষয় হয়নি যতদিন না দাঙ্গা বা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জাত্যাভিমান দেশভাগের মত ঘটনার জন্ম না দিয়েছে। অতীতে অখন্ড ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন ধর্মাশ্রিত জনসমষ্টি থাকা সত্ত্বেও ধর্ম নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের সংঘাত কখনও ঘটেনি। তাছাড়া মুঘল আমলের পূর্বে ভারত সত্যিকার অর্থে কখনও একটি অখন্ড সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। মুঘল আমলে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ঠিকই এবং তারা অনেকদূর এগিয়ে গেলেও গোটা ভারতবর্ষ একটি অখন্ড উপনিবেশ হিসেবে রুপ পায় বৃটিশ শাষনামলে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাষনামল থেকে অখন্ড উপনিবেশ পরিচয়ে পরিচিত হলেও এ সময় থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িকতা। যেন দীর্ঘদিনের বহন করে আসা একটি ক্ষোভ বিদেশি পরাধীনতার মুখে এসে ফেটে পড়েছে। তবে এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ জমা হয়েছিল কয়েকশ বছর ধরে। প্রাচীন ভারতবর্ষে মুঘলরা ছিল বহিরাগত, বাবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সকলকেই এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে তৎকালীন ভারতে অবস্থিত স্বাধীন রাজ্যগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু যাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল তারা শুধু হিন্দু শাষক ছিল তা নয় মুসলমান শাষকও ছিল। তবে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল অত্যধিক বেশি। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বহিরাগত বিজয়ী মুসলমানদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ যে পরিমান দানা বেধেছিল ততখানি স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে হয়নি। মুসলমান মুঘলদের সাথে সহজভাবে মুসলমান পাঠানরা মিলে গিয়েছিল কিন্তু ধর্মীয় অনুশাষণ ও ধর্মীয় ব্যাখা-অপব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতায় হিন্দুরা তত সহজভাবে মুঘল মুসলমান বহিরাগত শাষকদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। তবে ঐতিহাসিক সত্য এও যে প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য অর্থাৎ যেখান থেকে হিন্দু ধর্ম শুরু তারাও ভারতবর্ষের আদিবাসীদের অর্থাৎ অনার্যদের সাথে যুদ্ধ করে মাটির দখল নিয়েছিল অর্থাৎ তারাও একসময় এখানে বহিরাগতই ছিল। তখন অনার্যদেরও স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ছিল আর্যদের প্রতি। তবে আর্যরা এদেশে বসতি স্থাপনের পর একটি সামাজিক অবকাঠামো গঠনের প্রক্রিয়ায় বিজিত অনার্যদের হিন্দু ধর্মাশ্রিতদের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু সে অবকাঠামোতে পেশাভিত্তিক যে বর্ণবিভাগ নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখান থেকে বিজিতদের অবস্থান ছিল একান্তই নিচুতলায়, এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত সেই নিচুতলার হিন্দু সম্প্রদায় উপরতলার সামাজিক নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। আজও ভারতের অন্ত্যজ বলে চিহ্নিত সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থান থেকেই তা প্রমানিত। এই কারণে এই অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুরা এক সময় যখন ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা ইসলামের সামাজিক সাম্যের প্রতি ক্রমান্বয়ে আকৃষ্ট হয় এবং সামাজিক নির্যাতনের রুদ্ধশ্বাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ মুক্তির নিশ্বাস নেয়ার জন্য ক্রমান্বয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে থাকে। বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণীর এই স্বেচ্ছায় ধর্মগ্রহন বঙ্গদেশেই ঘটেছিল দীর্ঘদিন ধরে।

এই ভুখন্ডে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে। তখন থেকে উচু শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতি নীচু হিন্দু বর্ণের ক্ষোভ তা বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন একসময় সনাতনী এই হিন্দু ধর্মের থেকেই বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মের মত কয়েকটি ধর্মের জন্ম হয়। এর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে চীন, জাপান এবং ছোট-বড় আরো অনেক দেশে ঘটেছিল। তাই বলা চলে ভেতরে সুপ্ত ক্ষোভ কয়েকশ বছরের

Dhaka University Institutional Repository

পুরণো। তারপরও বহুকাল ধরে তাদের নিয়ে সহাবস্থানে ছিল ভারতবর্ষ। ধর্মাশ্রিত জনগনের মধ্যে ছিল একটি মানবিক বন্ধন। নয়তো দীর্ঘদিনের এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হতোনা।

কিন্তু একসময় এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে ফাটল শুরু হয় প্রকটভাবে। ব্রিটিশদের আগমন ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। বাণিজ্যের অজুহাতে প্রবেশ পরবর্তীতে রাজ্য শাসনের উচ্চাশা। ভারতে তখন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সহাবস্থান। সংখ্যায় হিন্দুরা বেশি কিন্তু শাষণ ক্ষমতায় বেশি মুসলমানরা। সুচতুর ইংরেজরা লক্ষ করে যে অন্ত্যজ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মনে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সম্পর্কে ভেতরে একটি চাপা ক্ষোভ রয়েছে ফলে বিপরীতে হিন্দুদের একটি ক্ষোভ মুসলমানদের প্রতি আছে। এই দুর্বল দিকটির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে ব্রিটিশরা শুরু করে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নকঁশা। তখন থেকে শুরু হয় ডিভাইড এন্ড রুল মানে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করে নিজেদের শাষন প্রতিষ্ঠিত করা। এরপর টানা দুইশ বছর এই হিন্দু-মুসলমান বিভেদ প্রক্রিয়া নানাভাবে পরিচালিত করে করে উস্কে দিয়েছে ব্রিটিশ শাষকেরা। আর জাত্যাভিমানী আবেগি হিন্দু-মুসলমান সেই উস্কানীতে, দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে প্রাধান্য দিয়ে স্থুল মস্তিস্কের পরিচয় দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িকতায়।

পাকিস্তানে এক শ্রেণীর মুসলিম ও ভারতে একশ্রেণীর হিন্দু রাজনীতিক- এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন। তাই দু'দেশে সমাজ কেবল ধর্মের কাছে দুর্বল নয়, দুর্বল সাম্প্রদায়িকতার কাছেও।

সম্প্রদায়গত উন্মেষের ব্যাখ্যায় ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন উল্লেখ করেছেন-

"যে প্রেক্ষিতে, পূর্ববঙ্গে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে সে প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক অবস্থানের মধ্যে সম্প্রদায়গত ভিন্নতা ও বিরোধ।"(৩)

-এই সম্প্রদায়গত বিরোধ ও ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণীর ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ব্যক্তির সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত অবস্থানের মধ্যে বিপরীত সহমর্মিতা ও সহযোগীতা নির্নীত করেছে।

1. **Aristotle (384 BC - 322 BC)**, The best political community is formed by citizens of the middle class./ *Politics*

2. **Kristin Hunter**, First it is necessary to stand on your own two feet. But the minute a man finds himself in that position, the next thing he should do is reach out his arms. /*O Magazine, November 2003*

Dhaka University Institutional Repository

3. **Niccolo Machiavelli (1469 – 1527)** **:** God creates men, but they choose each other. / *quoted in O Magazine, November 2003*)

খ.দাঙ্গা

দাঙ্গা ! শব্দটি কানে যাওয়া মাত্র হিমশিহরণ বয়ে যায় শরীরে। শব্দটির সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে নির্বিচারে হত্যা, নিরাপরাধের রক্তস্রোত, আঘাত, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, মানুষের চোখের জল, হাহাকার ও অগ্নিসংযোগে ছাই হয়ে যাওয়া দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, লাখ লাখ কর্ম দিবসের জলাঞ্জলি। সেই সাথে সমস্ত অসামাজিক ক্রিয়া কলাপ। এখানে দরিদ্র দেশ উল্লেখ করার কারণ মূলত দাঙ্গা বলতে যা বোঝায় তার বেশিরভাগই অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশেই সংঘটিত হয়। আর দাঙ্গায় সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির মুখে পরে সমাজের নীচু শ্রেণীর মানুষেরাই। দেখা যায় অনাহারে থাকা, সামজিকভাবে অনিরাপদে এবং ঝুঁকির মুখের দেশগুলোতেই দাঙ্গার মাত্রা বেশি। দরিদ্রদেশগুলোর দাঙ্গা- সংঘর্ষে প্রথম ধাপে আক্রান্ত হওয়া নিয়ে বি জনসন উল্লেখ করেছেন- The poor suffer twice at the rioter's hands. First, his destructive fury scars their neighborhood; second, the atmosphere of accommodation and consent is changed to one of hostility and resentment.- **Lyndon B. Johnson**

মানুষের শত শতাব্দীর সাধনায় অর্জিত সভ্যতা সংস্কৃতি যুক্তিবাদের অনুশীলনকে নিমিষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাকে উন্মত্ত এক জীবে পরিণত করে তার আদিম বর্বরতার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে দাঙ্গার ফলাফল।

ভারতে হিন্দু মুসলমান-হিন্দু শিখ, শিয়া-সুন্নী, হিন্দু- বৌদ্ধ-জৈন-খ্রিষ্টান, মুসলমান- বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের নামে দাঙ্গা ছাড়াও হিন্দু সমাজের মধ্যেই জাতের নামে অগ্রসর- অনগ্রসর ও আদিবাসী, ভাষার নামে মারাঠী-গুজরাটি-কন্নড়, অসমীয়া-বাংলা-ওড়িয়া-হিন্দি-উর্দু অথবা নদীর জল ও বিদ্যুতের ভাগ কিংবা রাজ্যের সীমানা নিয়ে নানা অজুহাতে দাঙ্গার যেন আর শেষ নেই। তবে একটি বিষয়ে আলোচনা করা জরুরি তা হলো দাঙ্গার স্বরুপ।

Dhaka University Institutional Repository

এক পক্ষ আক্রমন করলে অন্য পক্ষ যখন প্রতিহত করার চেষ্টা করে বা পাল্টা আক্রমন চালায় তখন দাঙ্গার মত ভয়াবহ ব্যাপকতা তৈরি হয়। কিন্তু আক্রমন যদি শুধু একপক্ষের হয় তবে তা দাঙ্গা নয় হয় সন্ত্রাস। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদাহরণ সবচেয়ে বেশি ভারতে। বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণে যে অস্থীতিশীলতা তৈরী হয় সেটি একপ্রকার নীরব সন্ত্রাস।

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি অবর্ণনীয়। জঙ্গী বা চড়মপন্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের অব্যাহত অভিযান, মার্কিন শাষকদের তাতে সাহায্য এবং বিপরীতে জঙ্গিদেরও প্রতিহত ও হামলার ফলে সেখানে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আত্মঘাতি বোমা হামলা ও প্রাণনাশের ঘটনা ঘটছে। দেশটিতে মূল সমস্যা চরমপন্থীদের সাথে শাষক ও সাধারণ জনগণের। আবার একই ধর্মের অনুসারী হয়ে দুটি ভাগের মধ্যে শিয়া-সুন্নীদের বিরোধেও সবসময় একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ওদিকে কোন কোন দুর্গম এলাকার জনগনও মনে প্রাণে তালেবান শাষণই কামনা করছেন। পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তানে তালেবান ও আলকায়দা বিরোধী অভিযানে দেশটিও পুরো ধ্বংসের মুখে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে দাঙ্গার মত বড় সহিংসতা তৈরি হয়নি কিন্তু সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটি শীতল সম্পর্ক এবং যে কোন ধরনের উস্কানীতেই যখন তখন সংঘর্ষ বেধে যাবার মতো একটি চাপা অস্থির অবস্থা রয়েছে। তার উপর এ দেশে বহুবার সংশোধন করা সংবিধানে ধর্মের পরিবর্তনের বিষয়টিও দেশটির জনগণের ধর্মীয় চেতনা ও মনসতাত্ত্বিকভাবে প্রভাব ফেলেছে। দাঙ্গা না ঘটলেও ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমনকি ভাঙ্গার আগেই মিথ্যে খবরের কারণে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠে। "১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে সদ্য পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় একসাথে কয়েক হাজার হিন্দু নিহত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। ৩৫ লাখ হিন্দু বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে শরনার্থী হয়ে"(৪)।

২০১০ সালের ৭ জানুয়ারীতে চট্টগ্রামে পটিয়ায় বাইতুল ইকরাম মসজিদে অবস্থানকে কেন্দ্র করে ওয়াহাবী ও সুন্নীদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়। রাজধানীতে কাদিয়ানীদের সাথে সুন্নীদের বিরোধ ঘটেছে। এখানে যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো এর সবই সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত অথবা ধর্মীয় মনোভাব থেকে সৃষ্টি দাঙ্গার উদাহরণ। কিন্তু দাঙ্গা- সংঘর্ষের কারণ ও পরিধি আরো অনেক বেশি বিস্তৃত। খাবার- বাসস্থান, ভূমি-প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার, জাতিগত সহিংসতা, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, টিউশন ফি কমানোর আন্দোলন, শেয়ার বাজারে দরপতন, বাজারে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, প্রশাষনে দূর্নীতি এমন হাজারটা বিষয় নিয়ে যে কোন সময় দাঙ্গার ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে চলেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আফ্রিকার সোমালিয়া, কঙ্গো, সুদান, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকে অস্ত্রর সন্ধানের কথা বলে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী আক্রমন, ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিন-ইজরাইল এবং থাইল্যান্ডে ২০১০ এর এপ্রিলে আগাম নির্বাচনের দাবিতে সাবেক শাষক থাকসিন সিনাওয়াত্রা ও তার সমর্থনে বাম দলের সমর্থকদের সাথে সরকারের দাঙ্গায় একই দিনে ২১ জন নিহত হয়েছিল। আহত প্রায় এক হাজার মানুষ। তিউনেশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ মিশরে ৩০ বছরের হোসনি মোবারকের ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ আর এই আন্দোলনে ৩ শতাধিক মানুষের প্রাণহানী। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্টের অপসারণের দাবিতে উপজাতি ও সরকারের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা শতাধিক। গণতন্ত্রের দাবিতে লিবিয়া, বাহরাইন, সিরিয়া ইয়েমেন সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সরকার সমর্থক ও বিদ্রোহীদের মধ্যে দাঙ্গার ঘটনা গণমাধ্যমের আলোচনার বিষয়।

মার্টিন লুথার কিং দাঙ্গাকে তুলনা করেছিলেন অধিকার নামঞ্জুরের ভাষার সাথে। তাই বলেছেন

A riot is the language of the unheard.

তবে বিরোধ থেকে সংঘর্ষের ভয়াবহ রুপই হলো দাঙ্গা। এদিকে, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বিরোধকে দাঙ্গা বলে অভিহিত করা হয় না। দাঙ্গা হচ্ছে দুই বা ততোধিক জনগোষ্ঠির মধ্যকার বিরোধের চরমতম রুপ। এই বিরোধ হতে পারে সুবিধা ভোগিদের সাথে সুবিধা বঞ্চিতদের, হতে পারে সাদার সাথে কালোর, শাষকের সাথে শোষিতের। তবে দাঙ্গা যে কারনেই হোক একটি বিষয় পরিস্কার যে একপক্ষ নিজেদেরকে মনে করে বছরের পর বছর ধরে তারা তাদের নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত। এই যে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ তৈরি হয় তারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে দাঙ্গার আকারে। যেহেতু দাঙ্গা হলো সংঘর্ষের চূড়ান্ত রুপ তাই এই ভয়াবহতার সাথে জড়িয়ে পড়া মানুষগুলোও হলো তাদের সহনীয়তার মাত্রা অতিক্রম করে যাওয়া।

নির্যাতন বা বেঁচে থাকার মৌলিক নূন্যতম চাহিদা পূরণ হওয়া পর্যন্ত মানুষের বিরোধ সংঘর্ষ পর্যন্তই থাকে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষেরই আর সংঘর্ষের পরবর্তি ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনার অবস্থান থাকেনা এবং সে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। তবে দাঙ্গার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হলো সবসময় যে মানুষ তার প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝে দাঙ্গায় জড়ায় তা নয়। গোষ্ঠিগত ভাবনা থেকে অথবা উসকানি মূলক আচরণ থেকেও মানুষের চাহিদার সাথে উপযোগ পূরনের উপাদানগুলো পর্যাপ্ত অথবা অপর্যাপ্ত হিসেবে তার কাছে ব্যাখ্যা পায়। দাঙ্গা ঘটে কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া তাই যুদ্ধ আর দাঙ্গা

Dhaka University Institutional Repository

এক নয়। অতর্কিত কোন আক্রমন থেকে শুরু হয় দাঙ্গার সূত্রপাত। মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পরে এবং দুই পক্ষ তাতে সহজেই জড়িয়ে পরে। কেউ প্রতিহত করতে কেউ প্রতিশোধ নিতে দাঙ্গায় জড়ায়।

1. Some punishment seems preparing for a people who are ungratefully abusing the best constitution and the best King any nation was ever blessed with, intent on nothing but luxury, licentiousness, power, places, pensions, and plunder; while the ministry, divided in their counsels, with little regard for each other, worried by perpetual oppositions, in continual apprehension of changes, intent on securing popularity in case they should lose favor, have for some years past had little time or inclination to attend to our small affairs, whose remoteness makes them appear even smaller. **Benjamin Franklin**

2. With society and its public, there is no longer any other language than that of bombs, barricades, and all that follows.) **Antonin Artaud.**

গ.সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সহজ কথায় সম্প্রদায়ে- সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দাঙ্গা বা বিরোধ তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উপমহাদেশের মানুষ সম্প্রদায়গত বিভেদ বলতে প্রথমেই বোঝে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা দেয়া হয় তাকে। এটি প্রধান শ্রেণীভাগ হলেও এই সম্প্রদায়গত পার্থক্য নির্ণয় হয় আরো বিশেষ কিছু বিষয়ে যেমন জাতিগত, রাজনৈতিক মত পার্থক্য, অর্থনৈতিক বিষয়, পেশাগত শ্রেণীভেদ এমনকি একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও রয়েছে নানা রকম সম্প্রদায়। আর এর যে কোন একটি থেকেও হতে পারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তেমনি দাঙ্গার কারনও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

তবে উপমহাদেশে ঘটে যাওয়া দাঙ্গাগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এখানে দাঙ্গা বা সংঘর্ষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বেশি। এক ধর্মাবলম্বীদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আবার একই ধর্মের মধ্যে নানা শ্রেণীভেদে সাম্প্রদাকিতার বিরোধের সূচনা হয়। কখনো কখনো অবশ্য এমন নজির

Dhaka University Institutional Repository

আপাত দৃষ্টিতে উন্নত ও অগ্রসর অঞ্চলেও যেমন সাবেক যুগোশ্লোভিয়ায় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার রুপ, জার্মানীতে নব্য নাৎসিদের উত্থানের চিহ্ন দেখা যায়। যে কোনরকম স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সংকীর্ন বিকারে মানবতা সংকটাপন্ন হচ্ছে। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা দুটি একটি রাজনৈতিক অপরটি ধর্মীয়। মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক চেতনার লালন ও বিকাশ। কিন্তু এ উপমহাদেশে যথার্থ গণতান্ত্রিক আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ সৃষ্টি হয়নি বলে মানুষের মূল সাংস্কৃতিক আশ্রয়স্থল হচ্ছে নিজ নিজ ধর্ম, যেখানে তারা কেবল স্বতন্ত্র নয়, হিন্দু-মুসলিমে বহু বিষয়ে বিবাদমান প্রতিপক্ষ। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে শান্তি ও সম্প্রীতির বাহন ধর্ম মোক্ষম ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং সাধারণত তাই করে চলেছে যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। " Communal riots have become a distinct feature of communalism in India. Whenever conflicting groups from two different religions, which are self –conscious communities, clash, it results in a communal riot. An event is identified as a communal riot if (a) there is violence, and (b) two or more communally identified groups confront each other or members of the other group at some point during the violence.1" (৫)

উপমহাদেশে ঘটে যাওয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে, ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের জের ধরে বাবরী মসজিদ দাঙ্গা, ভাগলপুর বিদ্রোহ, আহমেদাবাদ দাঙ্গা, জামশেদপুর দাঙ্গা, বাংলাদেশে আহমদিয়াদের সাথে কাদিয়ানিদের বিরোধ, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক এবং পাকিস্তানে তালেবান, আলকায়দাদের বিরুদ্ধে সরকারের অব্যাহত অভিযান, শিয়া-সুন্নী বিরোধ। এগুলো হলো ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তবে সবটাই আবার দাঙ্গা বলতে যে ভয়াবহ ব্যাপকতা বোঝায় সে পর্যন্ত গড়ায়নি, কোন কোনটা সংঘর্ষ পর্যন্ত থেকেছে, কোনটা প্রাত্যহিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা তবে এর ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকেই হোক আর ভূমি দখল, প্রতিটি দাঙ্গা ও সংঘর্ষের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে রাজনীতি। আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বড় ভূমিকা রাখছে গণমাধ্যম।

এবার আসা যাক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব যেমন দাঙ্গার ক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণ সবার উপরই কোন না কোন ভাবে পরে তেমনি সাম্প্রদায়িকতা এবং তা থেকে প্রতিশোধের কর্মকাণ্ডের সাথে এখন নানা বয়সী নারী-পুরুষেরও সম্পৃক্ততা তৈরি হচ্ছে। শুধুমাত্র সমাজের পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দাঙ্গায় সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলনা বলে নারী শিশুরা কখনোই দাঙ্গা থেকে রেহাইও পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী অপেক্ষাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত মনে করলে তা ভুল হবে, নারী পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নড়ম প্রকৃতির ও শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও তারা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত নয়। একসময় নারী ধর্মীয় কঠোর অনুশাষণ ও সামাজিক প্রথার ফলে শুধু অন্দরমহলের মানুষই ছিল সে হিন্দু বা মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েই, তখন নারী সরাসরি রাজনীতি-অর্থনীতির সাথে জড়ায়নি। কিন্তু দাঙ্গা সংঘর্ষের ভয়াবহতার হাত থেকেও রেহাই পায়নি। যেক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি সেখানে পরোক্ষভাবে হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে নারী ধর্মীয় অনুশাষণ থেকে অনেকাংশে সামাজিক প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করে ঘরের বাইরে এসেছে। অর্থনীতিতে অবদান রাখছে ফলে পরিবারে বেড়েছে তার সিদ্ধান্তর গ্রহনযোগ্যতা। তেমনি রাজনীতির ময়দানেও বেড়েছে সম্পৃক্ততা ফলে একই সাথে নারীও জড়িয়েছে সাম্প্রদায়িকতার জালে। রাজনীতিতে পাকিস্তানের মত ইসলামী রাষ্ট্রে নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বেনজির ভুট্টো, ভারতে শাষণ করেছেন ইন্দীরা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি হয়েছেন প্রতিভা পাতিল, বাংলাদেশে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের চেয়ারপার্সনও নারী। ২০১১র মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামফ্রন্টকে সরিয়ে প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। এছাড়া পার্লামেন্টে, রাজ্যসভা-বিধানসভা ও সংসদে নারী সদস্যদের উপস্থিতি যথেষ্ট। একই সাথে সমাজকর্মী, সাংবাদিকতা, অর্থনীতিবিদ সবক্ষেত্রেই নারীর সরব উপস্থিতি এখন চোখে পড়ে। তেমনি সম্প্রতি উপমহাদেশের রাজনৈতিক চড়মপন্থী দলগুলোর খবর পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় চড়ম পন্থীদলগুলোতে যথেষ্টভাবে বাড়ছে নারী সদস্যদের সংখ্যা। সাম্প্রদায়িকতার অসুখটি তাদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে কখনো প্রয়োজন কখনো অধিকার কিংবা প্রতিশোধের আকাংখা থেকে।

সাম্প্রদায়িকতার ইঞ্জেকশন দেবার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জামাত এ ইসলামী, বাংলাদেশের ছাত্র শিবির, আল্লাহর দলের সদস্য, হিযবুত তাহরীর এর মত দল ও গোষ্ঠিরা বিশেষ সংগঠন দাড় করিয়েছেন যাতে নারীদের মাধ্যমে ওইসব দল ও গোষ্ঠির বিশেষ মতবাদ পরিবারের মধ্যে ব্যপ্ত হয়। শিশুরা যাতে বাল্যকাল থেকেই ওই বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতে দিক্ষীত হয়ে উঠে। এমনকি দীর্ঘ প্রস্তুতিতেও এখন নারীদের সম্পৃক্ততা চোখে পড়ার মত। শ্রীলংকার তামিল গেরিলা থেকে ভারতের মাওবাদী- এ দেশের আল্লাহর দল-হিযবুত তাহরীর সব চড়মপন্থী দলে রয়েছে নারীদের অংশগ্রহন। বিংশ শতকে যেমন দাঙ্গায় সময় নারী তার পাশের বাড়ীর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মহিলার সাথে নিরাপত্তাহীনতার কারণে দুরত্ব বজায় রেখেছে একবিংশ শতকে নারী নিজেই সরাসরি অংশ নিচ্ছেন। অনেক সময় তারা বাড়ীর পুরুষকে অন্দরমহল থেকে সমর্থন যোগানোর নজিরও রয়েছে বটে। কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতার বোধ তৈরি না হলেও পরিস্থিতি তৈরি করেছে সাম্প্রদায়িক আচরণ করতে। যেমন ২০১০ শালে ভারত শাষিত কাশ্মীরে

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে যাওয়া দাঙ্গায় নারীরা তার সন্তান হত্যার প্রতিবাদে পুরুষের পাশাপাশি প্রতিশোধ নিতে রাস্তায় নেমে এসেছেন ।

(৬).

Women have borne the brunt of the conflict and / Women have joined protests in large numbers bbc news.

(৭.১ ও ৭.২)

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের কট্টর হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংগঠন বিজেপি'র নারী সদস্যরা।

শ্রীলংকায় এলটিটিই র নারী সদস্যদের ছবি

বিভিন্ন ইসলামী চড়মপন্থী দলে আছে নারী সদস্যদের উপস্থিতি তেমনি ভারতের হিন্দুদের একপ্রকার রক্ষণশীল দল বিজেপিতে মহিলা নেত্রীদের সরব উপস্থিতি। এবার বাংলাদেশের দু একটা সংবাদের উদাহরণ দেয়া যাক।

Dhaka University Institutional Repository

" এবার চাঁদাবাজির মাঠে নেমেছে কারাবন্দী শীর্ষ সন্ত্রাসীদের স্ত্রীরা। নতুন করে তারা বাহিনী সংগঠিত করছেন, নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন করাগারে থাকা স্বামীর সঙ্গে। কারাগার থেকে পাওয়া গাইড লাইন অনুযায়ী কাজও চলছে। সম্প্রতি কারাবন্দী দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীর স্ত্রীর মোবাইল ফোন রেকর্ড করে এসব তথ্য জানতে পেরেছে র‍্যাব। সম্প্রতি র‍্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইং শীর্ষ সন্ত্রাসীদের স্ত্রীদের গতিবিধি নজরদারি শুরু করে। কথোপকথন রেকর্ড করতে গিয়ে তারা জানতে পারেন, কারাগার থেকে দেয়া গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করছে তাদের স্ত্রীরা। সালমা নামে এক শীর্ষ সন্ত্রাসীর স্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করছেন ৩০ থেকে ৪০ জন সন্ত্রাসী।"(৮)

" বাংলাদেশে ২০০৯ সালের শুরুর দিকে রাজধানীর ইব্রাহিমপুর থেকে আটক করা হয় হিযবুত তাহরীরের কয়েক নারী সদস্যকে যাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় বিস্ফোরক দ্রব্য ও দলের বই পত্র, লিফলেট। এর আগে ২০০৭ সালের ১০ জুলাই রাজধানীর মিরপুর থেকে আটক করা হয় জেএমবি নেতা আসাদুল ও তার স্ত্রীকে। তার স্ত্রীর কাছ থেকেও উদ্ধার করা হয় অস্ত্র। এই আসাদুল ঝালকাঠি জেলার দুই বিচারক হত্যা মামলার আসামী। তার স্ত্রী তাকে সহযোগিতা করতেন। ভারতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেছিলেন নলীনি নামে এক মহিলা আত্মঘাতি হয়ে। পাকিস্তানে চড়মপন্থী দলগুলোতে রয়েছে নারী সদস্যদের উপস্থিতি।"(৯)

" পাকিস্তানের বাজাউর এলাকায় খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিনের দিনে এক মহিলা আত্মঘাতির বোমা হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত।"(১০).

একই সাথে সাম্প্রদায়িকতায় শুরু হয়েছে শিশুদের সম্পৃক্ততা। পরিবারের কাছ থেকে শিশুরা যখন শৈশবেই কঠোর ধর্মীয় অনুশাষণের শিক্ষা পাচ্ছে, অভিভাবকের আচরণ দেখছে তার মধ্যেও ঢুকে যাচ্ছে সেই প্রবনতা ফলে অল্প বয়সেই সেও হয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িক এক শিশু।

(11). Pakistan: Taliban brainwashes kids with visions of virgins

Dhaka University Institutional Repository

The military says that the children are told that these are rivers of milk and honey, that the women are the virgins that await them in heaven.

পাকিস্তানে ২০১১ সালে জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবের গভর্ণর সালমান তাসিরের হত্যাকারি তার দেহরক্ষী মুমতাজ কাদিরের বয়স বিশের কোঠা পার হয়নি। পাকিস্তানী ব্লাসফেমী বা ধর্মদ্রোহ আইন নিয়ে ভিন্ন মনোভাব পোষণ করায় সালমান তাসিরকে হত্যা করেছিলেন মুমতাজ। ২০০৮ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে হোটেল তাজ-এ জঙ্গিদের আক্রমনে ১৭০ জনের প্রাণহানী হয়। পরে ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের আটক করা হলে দেখা যায় এর মধ্যে ২০ বছরের কম বয়সীরাও রয়েছে। এছাড়া শ্রীলংকায় বিদ্রোহী তামিল গেরিলা ও ভারতের মাওবাদীদের মধ্যে রয়েছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বেশ উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী সমর্থক ও বিভিন্ন কট্টোরপন্থী ইসলামী দলগুলোতে রয়েছে অল্প বয়স্ক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি। এসব তথ্য থেকে ধারণা করা যায় সাম্প্রদায়িকতায় যেমন নারী শিশুর সম্পৃক্ততা বাড়ছে তেমনি ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংকট। সর্বস্তরে এই ধরনের মনোভাব ছড়িয়ে পড়ায় পূর্বে কোন দাঙ্গায় যে নারী হয়তো পরিবারের অন্যদের নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করতেন তিনিই হয়তো নিজেই সামিল হবেন আত্মঘাতি হতে বা দলের প্রচারণায়। অথবা কোন হিন্দু নারীর হাতে মুসলমান নারী শিশু কিংবা মুসলিম নারীর হামলায় খ্রিষ্টান নারী পুরুষ নিহত হওয়ার ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকবে।

ঘ.গণমাধ্যম

গণমাধ্যম হলো মুলত জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও, বই, লিফলেট, পোস্টার, দেয়াল লেখনি, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এসবই গণমাধ্যম। তবে স্বীকৃত গণমাধ্যম হিসেবে ধরা হয় সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও বইকে কারণ এর পরিধির ব্যাপ্তি এবং প্রভাব। গণমাধ্যমে যা লেখা হয় বা যে সংবাদ প্রকাশ করা হয় জনগনের কাছে তা খুব সহজেই পৌঁছে যায় এবং জনগন মোটামুটি তাতেই বিশ্বাস স্থাপন করে। তাই গণমাধ্যমে রয়েছে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা। এ কারণে প্রতিটি গণমাধ্যমের কিছু নীতি নির্ধারনী থাকা অত্যন্ত জরুরী। এই নীতি নির্ধারণীর মধ্যে কোন বানান কিভাবে লেখা হবে তা থেকে শুরু করে সংবাদের গুরুত্ব ও এর ফলাফল বিবেচনা করে তা প্রকাশের উপায়েরও নিয়ম নীতি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন বেশিরভাগ গণমাধ্যমেরই তাদের নিজেদের কোন নীতি নির্ধারনী তো নেয়ই

Dhaka University Institutional Repository

বরং অন্যের কাছ থেকে ধার করে নেয়া নীতি অথবা বহু আগে তৈরি নির্ধারণীটাও তারা ঠিকমতো মেনে চলেনা।

আজকের গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ আগামীকালই হয়ে যায় ইতিহাসের অংশ,স্বাক্ষী ও বাহক। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জনগণ তার পরিপার্শ্বের গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং এরই ভিত্তিতে মানুষ তার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে রাজনৈতিক ঘটনা এবং তা সংবাদে প্রকাশ। বিশেষ করে যখন দেশের কর্ণধাররা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনগনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে তখন এইসব খবর জানার প্রথম এবং একমাত্র ভরসাই হলো গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের মূলত কাজ কি? গণমাধ্যমের কাজ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে তার পর্যবেক্ষণ জনগনের কাছে পৌঁছে দেয়া। তাই বলা হয় মিডিয়া মূলত ওয়াচ ডগের দায়িত্ব পালন করে। গনমাধ্যমের কাজ কি বলতে যেয়ে সাংবাদিক আনিসুল হক তার একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলেন "গণমাধ্যমের কাজ কি?- গণমাধ্যমের কাজ পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ অনুযায়ী গণমাধ্যম তথ্য দেবে, বিনোদন দেবে, শিক্ষা দেবে আর প্রেরণা যোগাবে। "(১২)

গণমাধ্যমের ইতিহাস ঃ-

কয়েকশ বছর আগেও মঞ্চে যে নাটক প্রদর্শিত হতো সেটাকে আধুনিক সভ্যতার প্রথম গণমাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা যায় তবে স্বীকৃত গণমাধ্যম হলো পত্রিকা। পত্রিকার প্রথম প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায় ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে চীনে। তবে সে সময় কাগজের উচ্চ মূল্য এবং মানুষের নিরক্ষরতার পরিমান বেশি হওয়ায় সেই প্রকাশিত সংবাদপত্র আর উন্নতি করতে পারেনি, টিকেও থাকেনি দীর্ঘদিন।

প্রথম প্রকাশিত বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় ইউরোপে। ১৪৫৩ সালে জোহানেস গুটেনবার্গ নামে জনৈক এক ব্যক্তি ছাপাখানা থেকে বই প্রকাশ করেছিলেন, এটি ছিল মুদ্রন করা এবং চামরা দিয়ে বাধাঁই।

আর ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রচার ও প্রসার ঘটে বিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক হলো টেলিভিশন, রেডিও, ভিডিও চিত্রের ইতিহাস। এর পরবর্তীকালে এসেছে টেলিফোন, ইন্টারনেট। তবে আধুনিক বিশ্বে গণমাধ্যমের ইতিহাস কয়েকশ বছর আগের হলেও লাইব্রেরি, বই, হাতে লেখা চিঠি দূত দিয়ে পৌঁছে দেয়ার নজীর প্রাচীন রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে আরো অনেক পূর্বেও রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিককালে ছিল গুহা চিত্র, তখন এক

Dhaka University Institutional Repository

প্রজন্মের মানুষের সুখ, দুঃখ, জীবন যাপন, শিকার-আক্রমন বিষয়ে তার পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারতো গুহায় এঁকে রেখে যাওয়া ছবি থেকে। পাথরের গায়ে খোদাই করা নকশাঁ থেকে খবর পড়া হতো। তাই বলা যায় মূল গণমাধ্যম যে বিষয়টি অর্থাৎ জনগনের কাছে তথ্য পৌঁছানোর যে মাধ্যম সেটি মানুষের ইতিহাসের মতই প্রাচীন আর পুরণো। সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে আবিস্কার হয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তি, কৌশল ও মাধ্যম। উন্নত হয়েছে যোগাযোগের মাধ্যম। তবে গণমাধ্যম বলতে নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যবস্থার নাম উল্লেখ করা হলেও আসলে এর পরিধি আরো বিস্তৃত।

কিছুদিন আগেও যখন টেলিফোন ছিলনা, ছিলনা পোষ্ট অফিস তখন পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে ঢোল বাজিয়ে জমায়েত হওয়ার জন্য কয়েক গ্রামের মানুষকে আহ্বান করা হতো, সেই শব্দ শুনে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হতো মানুষ। এই যে ঢোলের শব্দের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছে দেয়া এটা যেমন একটি ব্যবহার্য মাধ্যম তেমনি গান, নাটক, কবিতা বা যেকোন মুখে মুখে প্রকাশিত সাহিত্যও এর আওতাভুক্ত। কেননা এর মধ্যে দিয়ে দর্শকের কাছে সংবাদ পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বা সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে কোন বিষয়ে। রাস্তার পাশে পোস্টারে বা বিলবোর্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন পণ্যের গুনাগুণ তাই বিলবোর্ডটিও এই মাধ্যমের আওতাধীন। তবে যে কোন ধরণের গণমাধ্যমেরই কিছু না কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। কারণ গণমাধ্যমই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকে।

আর গণমাধ্যম সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে দিতে পারে এত অনস্বীকার্য। যেমন উস্কে দিতে পারে সাম্প্রদায়িকতার আগুন তেমনি সংবাদ প্রচারের গুনে সাম্প্রদায়িকতার দাবানল নির্বাপন করার ক্ষমতা গণমাধ্যমের রয়েছে। তাই এর নিয়ম নীতি ও অধিকার নিয়ে রয়েছে অনেক নিয়ম কানুন।

গণমাধ্যমের ধারণা দিতে যেয়ে লিবলিং, আলবেরতি, ড্যানফরত বলেছেন 1. 'Freedom of the press belongs to the man who owns one'. --A.J. Liebling.

2 "Nothing overshadows truth so completely as authority." --Alberti

3 "People that are really weird can get into sensitive positions and have a tremendous impact on history." --J. Danforth Quayle

<u>গণমাধ্যমের প্রকার</u> ঃ যে মাধ্যমই সংবাদ বহন করতে সক্ষম তাই গণমাধ্যম। একসময় টেলিফোন শব্দটি অপরিচিত ছিল, সময়ে সেই টেলিফোনকে পিছে ফেলে এখন মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সবই গণমাধ্যমের আওতাধীন আর সংবাদপত্র, দেয়াল লিখন, লিফলেট, প্লাকার্ড,

Dhaka University Institutional Repository

ব্যানার, ফেস্টুন এমনকি মঞ্চে মঞ্চায়িত নাটকের মধ্যে দিয়ে দর্শকের কাছে যে তথ্য পৌঁছে দেয়া হয় তাও গণমাধ্যমের আওতায় পরে। যুদ্ধকালীন সময়ে গান-কবিতা রচনা করে লেখকরা যোদ্ধাদের উৎসাহ দেন সেটিও এই ধারায়ই পড়ে, হোক তা সোভিয়েত ইউনিয়নের ফলো দ্য মস্কোভা ডাউন টু গোর্কি পার্ক বা ভারতের বন্দে মাতরম, ওমা তুঝে সালাম কিংবা মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি কিংবা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী। তবে যে গণমাধ্যমটি একই সাথে সব জনগণ ও পাঠককে খবর পৌঁছে দিতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে এবং সবচেয়ে বেশি গ্রহন যোগ্য তা হলো সংবাদপত্র। কেননা এর জনগণের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধতা এবং প্রতিদিনের চলমান সংবাদ প্রচার। এটি সরাসরি সংবাদের সাথে জড়িত এবং সংবাদপত্রেই সবচেয়ে বেশি রাজনীতির খবর উঠে আসে। তবে তত্ত্বের ভিত্তিতে গণমাধ্যমকে কয়েকটি প্রকারে ভাগ করা যায় যেমন ঃ-

১. পাবলিকেশন্স ও প্রিন্ট মিডিয়া (বই, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাময়িকি, লিফলেট)

২. ব্রডকাস্টিং মিডিয়া (টিভি, রেডিও, কেবল মাধ্যম)

৩. ডিজিটাল মিডিয়া (ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট)

৪. রেকর্ডিং এবং প্রডাকশন (রেকর্ডস, টেপ, ক্যাসেট, কারটিজ, সিডি)

৫. ফিল্ম (সিনেমা, নাটক, ডিভিডি)

এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং দাঙ্গা তৈরিতে উপমহাদেশে যে গণমাধ্যমটির প্রভাব সবচাইতে বেশি সেটি সংবাদপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঙ. উপমহাদেশে গণমাধ্যম

মূলত ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের সূচনা ব্রিটিশ শাসনের প্রথম সময় থেকে। ইংরেজ কোম্পানীর শাসন পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য, পণ্যপরিবহন, জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত খবরাখবর জানা ও তা প্রচারের প্রয়োজনয়ীতা থেকে ব্রিটিশরা প্রয়োজন বোধ করে গণমাধ্যমের, যাতে তারা দ্রুত খবরাখবর আদান প্রদান করতে পারে। বিকাশমান বাণিজ্য বাজারও খবরের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। এই মাধ্যমের প্রথম গোড়াপত্তন করেন কলকাতায় বসবাসকারী ইউরোপীয়রা। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারী জেমস অগাস্টাস হিকি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট ' বা 'ক্যালকাটা' জেনারেল এডভারটাইজার প্রকাশ করে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের সূচনা করেন। এরপর মুদ্রন শিল্পের ক্রম বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং শিক্ষিত পাঠকশ্রেনী তৈরি হওয়ায় সংবাদপত্র প্রকাশের বিস্তৃতি ঘটে।

465271

পলাশীর যুদ্ধের পর কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের স্নায়ু কেন্দ্রে পরিণত হয়। সতের শতকের শেষ দিকেই কলকাতায় গড়ে ওঠে ইংরেজি যানা ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশ ।

আঠারো শতকের চতুর্থ পর্বে কলকাতার সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং নগরীর আকর্ষন বৃদ্ধি পায়। ফলে কলকাতা রাজধানী শহরে পরিণত হওয়ার সমর্থ হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক কলকাতার চেহারা পাল্টাতে থাকে বেশ দ্রুত। সুপ্রিমকোর্ট, থিয়েটার, এশিয়াটিক সোসাইটির মত দ্রুত কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। ছড়িয়ে পড়ে নতুন সংস্কৃতি। আর এখান থেকেই সারা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে সংস্কৃতির আবহাওয়া। কলকাতার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সে সময় বাস করতো প্রায় ১২২৫ জন ইউরোপীয় যারা অধিকাংশই বাণিজ্যিক কাজের সাথে জড়িত ছিল। বাণিজ্যিক এসব গুরুত্বের কারণেই এ শহরে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজন হয়। তবে বাণিজ্যিক খবরের সাথে সাথে আইন বহির্ভূত কর্মকান্ড- কুকীর্তি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার ভয়ে সরাসরি সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে কোম্পানী কখনোই রাজী ছিলনা। এর সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায় মার্গারিটা বার্ণসের একটি বইয়ে। সে তার ইন্ডিয়ান প্রেস গ্রন্থে বলেছেন - 'কোম্পানীর শাসন ও একচেটিয়া অধিকারে অসন্তুষ্টরাই ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন।'

তবে ১৭৮০ সালে হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের চার বছর আগে ভারতে সংবাদ পত্র প্রকাশের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যা আর সফলতার মুখ দেখেনি তবে সেটাই ছিল প্রথম চেষ্টা। ১৭৭৬ সালে উইলিয়াম বোল্টস নামে এক ওলন্দাজ ব্যবসায়ী যিনি ক্লাইভের সাথে কাজ করতেন অত্যন্ত সন্মানী পদে কিন্তু কোম্পানীর স্বার্থ না দেখার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে চাকুরিচ্যুত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন। চাকুরিচ্যুত হয়ে তিনিই প্রথম চেষ্টা করেছিলেন সংবাদপত্র প্রকাশের। কিন্তু তখনও ভারতবর্ষে ইংরেজদের কর্তৃত্ব তত স্থায়ী হয়ে বসেনি তাই এমন সময়ে সরকার বিরোধী এক চাকুরিচ্যুত কর্মচারীর সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি মিলেনি।

১৭৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত বেঙ্গল গেজেট ছিল সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা। প্রতি শনিবার এটি প্রকাশিত হতো। ৪ পৃষ্ঠার পত্রিকাটি ছিল বার ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি চওড়া। যার অধিকাংশ যায়গা জুড়ে ছিল বিজ্ঞাপন। এ পত্রিকায় স্থান পেত স্থানীয় ও বিদেশি সাংবাদিকদের রচনা, কবিতা, কলকাতায় বসবাসকারি ইউরোপীয়দের কথাবার্তা, সাধারণ জনগণের প্রতি সরকারের সহমর্মিতার কথা, বিদেশি অন্যান্য পত্রিকার কিছু খবর ইত্যাদি। তবে ব্রিটিশ শাষকদের অভ্যন্তরীন কলহে দু'পক্ষের একে অন্যকে সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে আক্রমন চালালে পরিস্থিতি খারাপ হওয়া শুরু করে। এ অবস্থায় ১৭৮০ সালের ১৪ নভেম্বর সরকারি নির্দেশ জারির মাধ্যমে বেঙ্গল গেজেট বিলি নিষিদ্ধ করা হয় এবং সম্পাদক হিকির বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় মামলা। পরের বছর জুনে হিকিকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয় তবে হিকি কারাগারে বসেই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এসময় বেঙ্গল গেজেটের ভাষা আরো তীব্র ও আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে। এতে করে পত্রিকাটির প্রতি পাঠকের আকর্ষন আরও বেড়ে যায়। পরের বছরই অর্থাৎ ১৭৮২ সালে হিকির ছাপাখানা আটক করে তা বিক্রি করে দেয় ইংরেজ সরকার। প্রকাশের দুই বছরের মাথাতেই ইতি ঘটে ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্রের। তবে ১৭৭৬ সালে বোল্টসের সংবাদ পত্র প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টার পর হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ ও তা দিয়ে তোলপাড় করে দেয়া নিসন্দেহে এ উপমহাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাসের প্রথম মাইল ফলক।

বেঙ্গল গেজেট বন্ধ হয়ে যাবার পর পরই কলকাতায় ও ভারতের অন্যান্য শহরে শুরু হয় সংবাদপত্র প্রকাশ। ইতিহাসে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৭৮০ থেকে ১৭৯৯ এই ১৯ বছরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র হলো

১৭৮০ - বেঙ্গল গেজেট, ইন্ডিয়া গেজেট। ১৭৮৪- দি ক্যালকাটা গেজেট। ১৭৮৫- বেঙ্গল জার্নাল। ১৭৮৬ -দি ক্যালকাটা ক্রনিকাল। ১৭৯৫- ক্যালকাটা কুরিয়র, ইন্ডিয়া এপেলো। ১৭৯৮- বেঙ্গল হরকরা। ১৭৯৯- দি রিলেটর।

এছাড়া সমসাময়িক কয়েকটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবার খবরও পাওয়া যায়। তবে সংবাদপত্র ও তার সম্পাদক প্রকাশক কর্মচারিদের শুরু থেকেই দমন পীড়ন ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারের ইতিহাস রয়েছে। ১৭৯৯ সালে মে মাসে সংবাদপত্র সম্পর্কে কঠোর নিয়ম-কানুন প্রনয়ণ করা হয়। এ আইন ৫দফা রেগুলেশন নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

এই রেগুলেশনে ছিল ১. প্রত্যেক পত্রিকার শেষে পৃষ্ঠার নিচের দিকে মুদ্রকের নাম ছাপতে হবে। ২. সরকারের প্রধান সচিবের কাছে প্রতিটি পত্রিকার সম্পাদক, স্বত্বাধিকারীর নাম পাঠাতে হবে। ৩. রোববার কোন পত্রিকা প্রকাশ করা যাবেনা। ৪.সরকারের প্রধান সচিবের অজান্তে কোন পত্রিকাই প্রকাশ করা যাবেনা। ৫. উপরে উল্লেখিত চারটি নির্দেশের যে কোন একটি অগ্রাহ্য করলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সবাইকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৮ শতকের শুরু থেকে ১৯ শতকের প্রথম দু'দশক পর্যন্ত মূলত ইউরোপীয়রাই সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন। সংবাদপত্রের পরিচালকেরা সবাই ছিলেন ব্যবসায়ী। আসলে ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিই বাংলা সংবাদপত্রের আদি উৎসাহ। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলা সংবাদপত্রগুলি বিদেশি ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । ইংরেজিগুলো যখন শুধুই লাভ ও বাণিজ্যিকিকরনের জন্য বিনোদনের খবরে ভর্তি হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তখন বাংলা পত্রিকাগুলোতে প্রকাশ করা হতো সমাজ সংস্কার, শিক্ষা এবং নানা সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংবাদ। তবে একটি কথা উল্লেখ করা জরুরি তা হলো সংবাদপত্রের চাহিদা ধরা হয় পাঠক সংখ্যার নির্ণয়ে। প্রথম দিকে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর পাঠক ভারত বর্ষের মানুষ ছিলনা। ছিল ইংরেজরাই। পরবর্তীতে বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে এ দেশের পাঠক তৈরি হতে থাকে।

১৮ শতকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সমূহ

১৮১৮ বঙ্গাল গেজেট (বাংলা), ক্যালকাটা জার্নাল (ইংরেজি / প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র), সমাচার দর্পণ (বাংলা)। ১৮২১- জন বুল ইন দ্য ইস্ট (ইংরেজি), সম্বাদ কৌমুদী (বাংলা), ব্রাহ্মন সেবী (বাংলা)। ১৮২২-সমাচার চন্দ্রিকা (বাংলা), মীরাৎ-উল-আখবার (ফার্সি)। ১৮২৯- বঙ্গদূত (বাংলা), বেঙ্গল হেরাল্ড (ইংরেজি)। ১৮৩১- সমাচার সভারাজেন্দ্র (ফার্সি অনুবাদসহ বাংলা সাপ্তাহিক), জ্ঞানেন্বষণ, সংবাদ প্রভাকর (বাংলা)। ১৮৩৫- সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় (বাংলা)। ১৮৩৭- সংবাদ সুধাসিন্ধু (বাংলা)। ১৮৩৮- সংবাদ দিবাকর (বাংলা), সম্বাদ সৌদামিনী (বাংলা), সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী (বাংলা)। ১৮৩৯- সংবাদ প্রভাকর দৈনিক হিসেবে শুরু (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র), সংবাদ ভাস্কর (বাংলা), সংবাদ রসরাজ (বাংলা), সংবাদ অরুণোদয় (বাংলা)। ১৮৪০- মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী / কলকাতার বাইরে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা, সংবাদ সুখরঞ্জন, আয়ুর্বেদ দর্পন, গভর্নমেন্ট গেজেট, জ্ঞানদীপিকা। ১৮৪১- সংবাদ ভারতবন্ধু, সংবাদ নিশাকর। ১৮৪২- বেঙ্গল স্পেকটেটর / দ্বিভাষি পত্রিকা। ১৮৪৩- তত্ত্ববোধনী । ১৮৪৪- কায়স্থ সৌরভ, সর্বরসরঞ্জিনী, সংবাদ রাজধানী। ১৮৪৬-নিত্রদর্মানুরঞ্জিকা, পাষণ্ডপীড়ন, সত্যসঞ্জায়িনী,

Dhaka University Institutional Repository

সমাচার জ্ঞান দর্পন, জগবন্ধু। ১৮৪৭-উপদেশক, দুর্জনদমন মহানবমী, সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন, হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদ্বয়, সংবাদ কাব্য রত্নাকর, হিন্দু বন্ধু, জ্ঞানসঞ্চারিনী, সংবাদ সাধুরঞ্জন, সংবাদ সুজন বন্ধু, সংবাদ দিগ্বিজয় । ১৮৪৮- সংবাদ মনোরঞ্জন, সংবাদ অরুনোদয়, সংবাদ কৌস্তভ। ১৮৪৯- বেঙ্গল রেকর্ডার, সংবাদ রসসাগর,মহাজন দর্পন।

জন অ্যাডাম ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন করার ঘোষণা দেন ১৮২৩ সালে। এই নীতি ভারতে কুখ্যাত অ্যাডাম গ্রাগ নামে পরিচিত। ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারতের সব প্রদেশের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা কলকাতায় সমবেত হন। তারা গভর্নর জেনারেলের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। ১৮৩৫ সালে অস্থায়ী গভর্নর হন চার্লস মেটাকাফ। তিনিও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় ছিলেন বিশ্বাসী। স্বাধীন সংবাদপত্র সরকারের কাজকে সহজ করে দেয় বলে বিশ্বাস করতেন মেটাকফ। তাই নতুন দায়িত্ব গ্রহনের পর পরই সর্বাগ্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আইন প্রনয়নে উদ্যোগী হন। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইন বিষযক সদস্য মেকলে এমনভাবে আইনটি তৈরি করেন যাতে নতুন আইন প্রবর্তনে ১৮২৩ এর অ্যাডাম রেগুলেশনস, ১৮২৫ র রেগুলেশনস সব কিছুই প্রত্যাহৃত ও বাতিল হয়ে যায়। নতুন আইনে কোন সংবাদপত্র বা পত্রিকা প্রকাশ করতে অনুমতি বা লাইসেন্সের প্রয়োজন রইলো না। ১৮৩৫ এর পর সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনায় স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এর ফলে সংবাদপত্র প্রকাশে এগিয়ে আসে দেশের শিক্ষীত মধ্যশ্রেণী।

১৮৫০ - সর্বশুভকরী। ১৮৫১- বিবিধার্থ সংগ্রহ (বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র সাময়িকপত্র)। ১৮৫২-কুইল (ইংরেজি)। ১৮৫৪- সমাচার সুধাবর্ষন। ১৮৫৬- অরুনোদয়। ১৮৫৮- সোমপ্রকাশ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত)।

সংবাদপত্রকে কিভাবে নির্ভর যোগ্য রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা যায়- সোমপ্রকাশ তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। এর আগের বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনা হিসেবে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করার জন্য সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রন আইন জারি করে। যদিও এই বিদ্রোহে সংবাদপত্রের তেমন কোন ভূমিকা ছিলনা। এই আইন ১৮৫৭ সালের ১৫ আইন নামে খ্যাত। যদিও আইনের স্থায়ীত্ব ছিল এক বছর কিন্তু এর লক্ষ্য ছিল মহাবিদ্রোহের সমর্থক সংবাদপত্র, ছাপাখানা এবং পুস্তক প্রকাশনা বন্ধ রাখা। সামরিক আইন জারি করে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গ্রহন ছিল একটি নির্মম প্রহসন। তবে সরকার চালিত ইংরেজি পত্রিকাগুলো তখন ছিল এই রোষমুক্ত যাতে শুধু সরকারের গুনগানই

Dhaka University Institutional Repository

গাওয়া হতো। এক ডজনেরও বেশি বাংলা পত্রিকা সে সময় এ আইনে পরে চড়মভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরের বছর ১৮৫৮ সালে ওই একই তারিখে ১৫ আইন প্রত্যাহৃত হয়।

এ শতকের প্রথম ভাগটি ছিল সংবাদপত্র সংহত করার যুগ। এক্ষেত্রে সহায়তা করে অধিকাঠামো ও প্রযুক্তির বিকাশ। দ্বিতীয়ার্ধ সংবাদপত্র বিস্তারের সময়। এ সময় থেকে সংবাদপত্র কলকাতার গন্ডি ছাড়িয়ে ছোট বড় শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়।

কলকাতায় আঠারো শতকের শুরুতে সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা হলেও পূর্ব বাংলায় তা শুরু হয় প্রায় অর্ধশত বছরের ব্যবধানে। এর পেছনে অনেক যুক্তি রয়েছে। ব্রিটিশ শাষণের পর কলকাতা কেন্দ্রীক জীবন ও রাজনীতি ব্যবস্থা গড়ে উঠা, ফলে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব লোপ, ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের গুরুত্ব কমে যাওয়া, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা, পশ্চাদপদ অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সমসাময়িকভাবে কলকাতার সাথে সাথে পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রের বিকাশ হয়নি। তবে প্রায় ৫০ বছরে অবস্থার উন্নতি হওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

এ শতকের ষাটের দশক থেকে পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশের সময় কাল হিসেবে ধরা হলেও সবচেয়ে প্রথম যে সংবাদ পত্রটি প্রকাশ করা হয়েছিল সেটি ১৮৪৭ সালে রংপুর থেকে। এই সংবাদ পত্রের নাম ছিল 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। রংপুরের কুন্ডি পরগণার জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী একটি ছাপাখানা স্থাপন করে প্রথম প্রকাশ করলেন পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র। এটি ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিংয়ের সেই ১৫ নং আইনে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক। ১৮৫৬ সালে 'ঢাকা নিউজ'।

প্রকাশিত সংবাদপত্র সমূহ

১৮৪৭- রঙ্গপুর বার্তাবহ । ১৮৫৬- ঢাকা নিউজ। ১৮৬০-রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, কবিতা কুসুমাবলী, মনোরঞ্জিকা, নব্যব্যবহার সংহিতা, সংস্কার, সংশোধনী। ১৮৬১------ঢাকা প্রকাশ, ফরিদপুর দর্পণ, গদ্যপ্রসূন। ১৮৬২------চিত্তরঞ্জিকা, ঢাকা বার্তাবহ, অবকাশ রঞ্জিকা, অমৃতবাহিনী। ১৮৬৩------গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ঢাকা দর্পণ, উদ্যোগ বিধায়নী । ১৮৬৪-----মাসিক রচনাবলী, মাসিক কাব্যপ্রকাশ, মাসিক পাবনা দর্পণ। ১৮৬৫--------সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী, সাপ্তাহিক হিন্দু হিতৈষণী, বিদ্যোন্নতী সাধিনী। ১৮৬৬--------- হিন্দু রঞ্জিকা, ১৮৬৭----------পল্লী বিজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৮----------অমৃতবাজার ১৮৬৯------------ বেঙ্গল টাইমস এবং অবলাবান্ধব ১৮৭০---- আর্যধর্ম প্রকাশিকা, বঙ্গবন্ধু, বরিশাল বার্তাবহ।

১৮৬৩ সালে মে মাসে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে একজন দরিদ্র সৎ শিক্ষক প্রকাশ করেছিলেন গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা। যা প্রথম গ্রামের মানুষের কষ্ট-দুখের কথা তুলে ধরে এবং সমস্ত অন্যায় অবিচার নিয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৮ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলা ভাষায় ৮৭টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৫০টি ত্রৈমাসিক, ৭টি পাক্ষিক, ২২ টি সাপ্তাহিক, একটি ত্রি-সাপ্তাহিক ও একটি দৈনিক। এতগুলো বাংলা কাগজে জনমতের প্রতিফলন সরকারকে বিচলিত করে তোলে সে কারনেই লর্ড লিটন ভাইসরয় ১৮৭৮ সালে ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করেন। কিন্তু এই অ্যাক্ট নিয়ে শুধু ভারত নয় ব্রিটেনেও ঝড় উঠে।

১৮৭১------------উইকলি ইস্ট, শুভ সাধিনী, হিতকরী, ধুমকেতু, হিতসাধিনী, সমাজদর্পণ। ১৮৭২-----------বঙ্গ দর্পন, জ্ঞানপ্রভা, পরিমল বাহিনী, জ্ঞানাঙ্কুর। ১৮৭৩---------- জ্ঞানবিকাশিনী, বালারঞ্জিকা, গ্রামদূত, পল্লীদর্শন মহাপাপ বাল্যবিবাহ। ১৮৭৪------ বান্ধব, বাঙ্গালী, পাক্ষিক। ১৮৭৫---------- সত্যপ্রকাশ, প্রমোদী, সুহৃদ, রাজশাহী সমাচার, ঢাকা দর্শক, ভারত মিহির হিতৈষিণী। ১৮৭৬-------- শ্রীহট্ট প্রকাশ, ভারত সুহৃদ, বিশ্ব সুহৃদ, চিত্রকর, ধর্মপ্রকাশ। ১৮৭৭--------- জ্ঞানভেদ, ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট । ১৮৭৮---------- কৌমুদী, সুহৃদ, আর্য্যপ্রদীপ, চন্দ্রশেখর ১৮৭৯----------- পূর্ব প্রতিধ্বনী, সঞ্জীবনী, সংশোধনী, ভারত সুহৃদ, রজনী, বিশ্ববন্ধু, ভারত ভিখারিনী। ১৮৮০---------পরিদর্শক, আর্য্য প্রভা, ত্রিপুরা বার্তাবহ, অপূর্ব রহস্য, দি স্টুডেন্ট জার্নাল। ১৮৮১--------- সুধাকর, চারুবার্তা, ভিষক, বিক্রমপুর প্রকাশ, শ্রীক্ষেত্র চিত্র, সাহিত্য দর্শন, সদান্দ, ঋষিতত্ত্ব, আচার্য্য, বঙ্গ সুহৃদ। ১৮৮২--------- বার্ত্তাবহ, রামধনু, ভারত হিতৈষী, নবীন, দর্পন, প্রতিভা, হরিভক্তি তরঙ্গিনী, বঙ্গবিলাপ, জ্ঞান বিকাশিনী, উষা, আর্যরঞ্জন, ফুলতত্ত্ব প্রকাশিকা, রঙমহল ভারতবাসী। ১৮৮৩--------- কিরণ, সারস্বপত্র, বালিকা, বৈষয়িক তত্ত্ব । ১৮৮৪---------- প্রান্তবাসী, বিক্রমপুর বার্ত্তাবহ, রত্নাকর, আখবারে এসলামিয়া, বৌদ্ধবন্ধু, আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী। ১৮৮৫------------বিজলী, পূর্ববঙ্গবাসী, মহাবিদ্যা, হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক, পূর্বদর্পণ, শিল্পকৃষি পত্রিকা, দিনাজপুর পত্রিকা। ১৮৮৬----------- গরীব, ঢাকা গেজেট, আহমদী। ১৮৮৭---------- হিতৈষী, চট্টলা গেজেট, দ্বিভাষিকী, বাসন্তী, অধ্যয়ন, যুবক সুহৃদ, কামনা, কাঙ্গালের ব্রহ্মান্ডভেদ, সচিত্র কৃষি শিক্ষা, হিন্দু মোসলমান সম্মিলনী। ১৮৮৮----------- গৌরব, উদ্দেশ্য মহত, সুখী পাখী, শিক্ষা, ক্রীড়া ও কৌতুক, শ্রীহট্ট

Dhaka University Institutional Repository

সুহৃদ, শক্তি, কাশীপুর নিবাসী। ১৮৮৯---------- সম্মিলনী, শুক-শারি, আলো, শিক্ষা পরিচর, ফরিদপুর হিতৈষিণী। ১৯৯০------ হিতকরী, সমালোচক, নববিধান মৃতসঞ্জীবনী, এপ্রিল ফুল, এপ্রিল রহস্য, নবমিহির, নবযুবক সহযোগী, আশালতা। ১৮৯১---------- শ্রীহট্ট, মিহির, প্রকৃতি, রসরাজ, সেবক। ১৮৯২---------- শ্রীহট্টবাসী, সদর ও মফস্বল, গদাধর, ঝংকার। ১৮৯৩---------- শ্রীহট্টবাসী, আরা, মান্তি, ছাত্রসহচর, লতিফা। ১৮৯৪------- বিক্রমপুর,হীরা, হিন্দু পত্রিকা, ত্রিপুরা প্রকাশ, আভা, উষা । ১৮৯৫----- বগুড়া দর্পণ, ঘোষক, সচিত্র গান ও গল্প, শিক্ষা দর্পণ, সুদর্শন। ১৮৯৬---------- বরিশাল হিতৈষী, শৈবী, পারিজাত, ভিক্ষুক, তত্ত্ববোধ। ১৮৯৭------- সঞ্চয়, উৎসাহ ১ ও ২, আওয়ার বন্ড, মোহিনী। ১৮৯৮-----অঞ্জলী। ১৮৯৯---- ধর্মজীবন, মধুকর, কোকিল, ঐতিহাসিক চিত্র, প্রচারক।

এ শতকের ৭০ এর দশকে পূর্ব-বাংলা থেকে অসংখ্য পত্রিকা বের হতো। ঢাকা ছাড়াও রাজশাহী,পাবনা চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ থেকে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশ করা হতো। কিন্তু এসব পত্রিকায় সামাজিক প্রভাব ততটা ছিলনা। এ দশকেই পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সাংবাদিকতার অঙ্গনে প্রবেশ করতে শুরু করে। পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্রটির নাম 'পারিল বার্তাবহ'। ১৮৭৪ সালে মানিকগঞ্জের পারিল গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় এটি। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই একচল্লিশ বছরে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত ৬০ টির মতো পত্রিকার নাম পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০০ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল ৯০৫টি। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২৪০টি।

১৮ শতকের ৯০ এর দশকে কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদীরা ইটালীর মাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডী, রাশিয়ার নিহিস্টি এবং আয়ারল্যান্ডের ফেনিয়ান আন্দোলনের কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা গ্রহন করেন। এ সময় সন্ত্রাসবাদকে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্য গীতার নতুন ব্যাখা দেয়া হয়। সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদের প্রসারের ফলে বিভিন্ন স্থানে নানা ধরণের বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। এসব ঘটনায় ভারতে ব্রিটিশ সরকার কঠোর হাতে সব নিয়ন্ত্রন করার কথা ভাবতে থাকে। তাদের উদ্যোগেই ১৮৯৮ সালে ১২৪ (ক) ধারা পরিবর্তে রাজদ্রোহ মোকাবেলায় আরো কঠোর একটি ধারা 'পেনাল কোড'- এর সংযোজিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ প্রচারের দায়ে শাস্তি দেবার জন্য সংযোজিত হয় ১৫৩ (ক) ধারা এবং সরকারী কর্মীদের উস্কানী দেয়ার দায়ের শাস্তি দিতে সংযোজিত হয় নতুন ৫০৫ ধারা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩ (ক) ধারায় বলা হয়, 'ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সংকেতাদি, বা দৃশ্যমান কলামূর্তির সাহায্যে, বা প্রকারান্তরে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করে, বা সৃষ্টির উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ২ বছর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।' নব্বইয়ের দশকের শেষ প্রান্তে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করার জন্য এই কালাকানুনটি প্রণীত হয়।

জন্মলগ্ন থেকে সংবাদপত্রকে মুখোমুখী হতে হয়েছে শাসক শক্তির খড়্গহস্তের, সইতে হয়েছে নির্যাতন নিপীড়ন।

উনিশ শতকে সংবাদপত্রের প্রভাব লেখাপড়া জানা গ্রাহকদের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর প্রসারিত হয়েছিল। এ প্রভাব শুধু শহর নয় প্রত্যন্ত গ্রামেও গিয়ে পৌঁছেছিল তাই তৈরি হয়েছিল অসংখ্য অসংখ্য পাঠক। ক্রমশ সংবাদপত্রকে ঘিরে গড়ে ওঠে পাঠাগার। রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি, জাতীয়তাবোধের সঞ্চার, ঔপনিবেশিক শাষনের মুখোশ উন্মোচনের মাধ্যমে সংবাদপত্র সরকার বিরোধী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও পালন করে। সরকারের সব আইন, সব নীতির সমালোচনা হতো সংবাদপত্রে। তবে তার মধ্যেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। মফস্বল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে সে সেময় উঠে এসেছে জমি, জমিদার, কৃষক, স্থানীয় বিদ্রোহের কথা। সরকার বিরোধী বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে মফস্বলের পত্রিকাগুলো তত বেশি সোচ্চার হয়নি তখন, সেটা সম্ভবও ছিলনা। শহর কেন্দ্রিক পত্রিকাগুলোতে সরকারের সমালোচনার খবর বেশি প্রকাশিত হতো। কিন্তু প্রথম সময়ে পত্রিকার আউটলেট নিয়ে কোন পরিকল্পনা ছিলনা। তাই দেখা যেত প্রথম পৃষ্ঠাটি বিজ্ঞাপনেই ভরা থাকতো। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা ছাপা হতো। প্রকাশিত সাহিত্যের গুনগত মানের চাইতে রচয়িতার গুন প্রাধান্য পেত অধিক। সংবাদ সংগ্রহ, যোগাযোগ ও তা প্রকাশ ও পরে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়ার মধ্যে ছিল অনেক প্রতিকূলতা। এতকিছুর পরেও সে সময়ের সভা সমিতি আন্দোলন, তীব্র ব্যঙ্গ সবই হতো সংবাদপত্রকে ঘিরে।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতকে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম

নতুন শতকের শুরুতে নতুন প্রত্যাশা নিয়ে জাতি বরণ করে নিয়েছিল নতুন শতাব্দী। নতুন শতাব্দীর প্রথম থেকেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হবার জন্য শুরু হয় জাতির স্বপ্ন দেখা। স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বাঙ্গালী। পরাধীনতা থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য ফাঁসির মঞ্চে নিজেকে সপে দিতে এগিয়ে আসে শত সহস্র তরুণ দেশপ্রেমী। বিশ শতকের শুরুতে রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ উন্মোচিত হয়। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙ্গালির আত্মপ্রত্যয়, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়। এ সব ঘটনার নেপথ্যে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে আমেরিকার স্বাধীনতা, ফরাসি বিদ্রোহের আদর্শ, আয়ারল্যান্ডের হোমরুল, ইটালী ও জার্মানীর জাতীয় আন্দোলনের ঘটনা। এ ঘটনা এদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাংখাকে দুর্বার করে তোলে। চলতে থাকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি। সংবাদপত্র হয়ে ওঠে তার যোগ্য বাহন।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক বাংলা সংবাদপত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে শোষিত মানুষ মাথা তুলে দাড়ায়। সামাজিক পরিবর্তনের অর্গল মুক্ত হয়ে যায়। মানুষের মনে বিশ্বাস জাগে যে, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা শুধু স্বপ্ন নয়। দেশপ্রেম আন্ত র্জাতিক চেতনায় উজ্জল হয়ে উঠে। নারীর সমঅধিকারের দাবি প্রাণশক্তি অর্জন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অংশ গ্রহনের অপরিহার্যতা স্পষ্ট হয়। এসব ঘটনা সংবাদ পরিমন্ডলে সৃষ্টি হয় নতুন আবহ।

(মূলত সংবাদপত্রে জোয়ার এসেছিল স্বদেশ প্রেমের চেতনায় ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার সংবাদ দিয়ে, দেশকে ইংরেজ শাষকদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যে বিপ্লবী চেতনা তৈরি হয়েছিল রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, ছাত্র-শিক্ষদের মধ্যে সেই সময় গৃহিত নানা পদক্ষেপ। এক হওয়ার আহ্বান একই সাথে এর বিরুদ্ধে সবক্ষেত্রে সরকারের দমন নীতি এসব খবর যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া শুরু করে তখন থেকে সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পায়। এর আগ পর্যন্ত দুএকটি সংবাদপত্র ছাড়া বেশির ভাগই ছিল বিলাসী পাঠকদের বা সমাজের উচু শ্রেণীর পাঠকদের জন্য প্রকাশিত। আর যে সব সংবাদপত্র ততকালিন সময়ে সরকারের কঠোর বিরোধিতা করেছে তাদেরকে অসংখ্য আইনের বেড়াজালে পরে হয় প্রকাশনা বন্ধ করতে হয়েছে নয়তো পাল্টাতে হয়েছে সংবাদের সুর। তবে শুরু থেকেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে দ্বৈত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। কেননা সংবাদপত্র মূলত ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং এই ব্যক্তিরা ছিলেন কোন না কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে অন্তত ধর্মীয় মতাদর্শে প্রভাবিত। আর এই প্রভাব পড়তো

Dhaka University Institutional Repository

তার প্রকাশিত সংবাদপত্রে। যেমন কোন পত্রিকা প্রকাশ করতো বঙ্গভঙ্গ হওয়া উচিত কোন পত্রিকা এর বিরোধিতা করতো তেমনি একজন হিন্দু প্রকাশকের পত্রিকায় যেমন প্রাধান্য দেয়া হতো স্ব সংস্কৃতি ধর্মের নানা দিক তেমনি মুসলমান প্রকাশকও অলিখিতভাবে সংবাদপত্রটিকে নিরপেক্ষ নয় প্রতিযোগিতা করে একটি মুসলিম পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারের চেষ্টা করতেন। যদিও ব্রিটিশ শাষন থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা উভয় স্থানের সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে তেমন কোন বড় ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়না কিন্তু ততকালিন সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর নাম এবং খবরের ভাষা ও শব্দের প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দিলে কোনটি একজন হিন্দু ও কোনটি মুসলমান প্রকাশকের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা স্পষ্ট ছিল। এর মূল কারণ হয়তো দীর্ঘদিনের জাত্যাভিমান এবং এক সম্প্রদায়ের চাইতে অন্যসম্প্রদায়ের তুলনামুলক অনগ্রসরতা। একইসাথে কারো কারো পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপক্ষে সমর্থনের কারনেও এই সমসাময়িক দ্বৈত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এরই পরিবর্তিত পরবর্তী চরম রুপ সাম্প্রদায়িকতায়। ১৮ শতকের ৯০ এর দশকে কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি পূর্ব বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদীরা ইটালীর মাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডী, রাশিয়ার নিহিস্টি এবং আয়ারল্যান্ডের ফেনিয়ান আন্দোলনের কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা গ্রহন করেন। এ সময় সন্ত্রাসবাদকে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্য গীতার নতুন ব্যাখা দেয়া হয়।

সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদের প্রসারের ফলে বিভিন্ন স্থানে নানা ধরণের বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। সে সময় বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসবাদও মিলে মিশে এক হয়ে যায় আর তখন থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সাম্প্রদায়িকতা। সংবাদপত্রের ভূমিকাও তখন টালমাটাল। কোনটা আসলে সত্যিকার বিপ্লব আর কোনটা সমর্থনের নামে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়তো।

ফলে যেমন ব্রিটিশদের সময়ে সরকার চালিত ও ভারতের জনগণের প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে বিভেদ ছিল তেমনি দেশ ভাগ হওয়ার পর এমনকি দেশে ভাগ হওয়ার পূর্বেও দেখা যেত পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে বেশ কিছু ব্যবধান রয়েছে। আবার হিন্দু মালিকের প্রকাশিত সংবাদপত্র ও মুসলমান মালিকের প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যেও ছিল দেখার দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তর ব্যবধান।

এরপর আসা যাক পরিবর্তনের স্রোতধারার দিকে। সুযোগ যখন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় তখন একপর্যায়ে তা অভ্যাসেও পরিণত হয় তেমনি সংবাদপত্র যখন প্রথম দিকে বিপ্লবীদের দেশপ্রেমে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বুদ্ধ করতে সাহস যোগাতো সেই সহায়তা নিয়েই এক পর্যায় দেখা যেত একই সংবাদপত্র গোত্রগত দ্বন্দ্বে বা বিশেষ দলের মতাদর্শকে সমর্থন করছে ততদিনে জনগনের কাছে তার গ্রহনযোগ্যতা যথেষ্ট তাই সহজে সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হতো।

বিংশ শতকে প্রকাশিত সংবাদপত্র

১৮৯৯ সালে জানুয়ারী মাসে লর্ড কার্জন ভারতের নতুন ভাইসরয় হয়ে আসার পর ভারতীয়দের প্রতি তার অসীম অবজ্ঞা থেকে আরো গাঢ়ো হয়ে উঠে স্বদেশ প্রেমের চেতনা। এর প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় স্বদেশী আন্দোলন। তার আগমনের সময় থেকে ১৯৪৭ এ ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৮ বছর ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা সঙগ্রামের কাল হিসেবে চিহ্নিত।

ভারতে এসে তিনি মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট (১৮৯৯) জারি করেন। ১৯০২ এর জানুয়ারীতে তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, জুনে রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং ১৯০৪ সালে পাশ করা হয় বিশ্ববদ্যিালয় সংক্রান্ত আইন। এতে বেসরকারী কলেজের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রন আরো জোড়দার হয়। মধ্যবিত্ত সমাজ এই আইনকে ভালোভাবে নিতে পারেনি। প্রতিবাদ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে এই সময় থেকে শুরু হয় শতাব্দীর শুরু ও শুরু হয় পত্রপত্রিকাগুলোতে এ আইনের বিরোধিতা।

সাপ্রু কমিটি তদন্ত শেষে তার রিপোর্টে ১৯০৮ ও ১৯১০ সালের সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন বাতিল করার সুপারিশ করেন। তার পরিবর্তে 'রেজিস্ট্রেশন অব দি প্রেস এন্ড বুকস অ্যাক্ট (১৮৬৭)' সংশোধনের কথা বলেন। আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সাপ্রু তিনটি বিষয়ে সুপারিশ করেন। ১.শাস্তি হিসাবে কারাদণ্ডের মেয়াদ হবে সর্বাধিক ছয় মাস। ২. রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য বাজেয়াপ্ত করা। ৩. প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকের নাম অবশ্যই ছাপতে হবে।

১৯০১------------ মোসলমান পত্রিকা, আরতি, সোলতান, বালক, ভারত সুহৃদ, নুরুল ইসলাম। ১৯০২-----------বঙ্গবামা বন্ধু। ১৯০৩------------হানিফি (হানাফি মাজহাবের মুখপত্র), (সোলতান, মাসিক মোহাম্মদী) কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ১৯০৪------------প্রতিনিধি, ধূমকেতু, নববিকাশ, আশা। ১৯০৫------------ ভারত মহিলা। ১৯০৬------------ইসলাম সুহৃদ। ১৯০৭------------শ্রীদেশ বার্তা। ১৯০৮------------- কোরক, নগর। ১৯০৯------------- প্রজাশক্তি, মৈত্রী। ১৯১১------------ কোহিণূর।

১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়, ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৩ সালে সংবাদপত্রের কারিগরি উন্নতি ঘটতে থাকে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ছাপার জন্য ফ্ল্যাটবেড এর বদলে রোটারী

Dhaka University Institutional Repository

মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে রাজনীতি অনেকখানি ঝিমিয়ে পরে তবে বিপ্লবী কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে সংবাদপত্র জগতে পরিবর্তন আসে। এ বছরই ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন, ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এবং ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক নিয়ম চালু করবে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু বাস্তবে তা না হলে জনগন ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করতে সরকার এ শোষন নীতি চালু করার ঘোষণা দেন। এসময় শাসন সংস্কারে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সেচ, বিচার, স্বায়ত্বশাসন বিভিন্ন দফতরগুলো ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়। এই সময় কিছু ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে দেয়া হলেও মুল চাবি কাঠি রেখে দেয়া হয় ব্রিটিশদের হাতে। নতুন সংস্কারের নামে মূল ক্ষমতা ব্রিটিশদের হাতে থাকায় এর বিরোধিতা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

১৯১২----সুখী পাখি, প্রভাত। ১৯১৩----হিতবার্তা, ইসলাম আভা। ১৯১৪-১৯১৫--- দেশ বন্ধ। ১৯১৬----সুনীতি। ১৯১৭----মসজেদ, সাপ্তাহিক দেশবার্তা, দ্য হেরাল্ড। ১৯১৯----আল হক, মুসলমান শিক্ষা সমবায়, মানিক সাধনা। ১৯২০---- জনশক্তি, নূর, ভাস্কর, ধ্রুবতারা।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে ১৯২১ সালে ইংরেজ সরকার তেজ বাহাদুর সাপ্রুকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ভারতের সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। তদন্তের জন্য কমিটি লিখিত বিবৃতি ও ব্যক্তিগত সাক্ষ্য গ্রহন করে। কয়েকজন খ্যাতনামা সাংবাদিক বিবৃতি ও সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানান, তা সত্ত্বেও কমিটি আটটি লিখিত বিবৃতি পনের জন সম্পাদকসহ ১৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহন করেন। এই তদন্তে সাপ্রু লক্ষ্য করেন, সংবাদপত্রগুলো আয়ের জন্য বিজ্ঞাপন অপেক্ষা বিক্রির ওপর বেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া, বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে যে সব তথ্য বেরিয়ে আসে তার মধ্যে রয়েছে- ১.সংবাদপত্রের মালিকানা কখনো কখনো ছাপাখানার হাতে থাকে। সেখানে সম্পাদক বেতনভুক্ত কর্মচারি মাত্র। ২. বৃহৎ ছাপাখানাগুলো সরকারী আইন ভাংতে উৎসাহী নয়। ৩. পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রক অধিকাংশ সময়ই পত্রিকার নীতি, প্রকাশিত রচনার গুরুত্ব এবং সরকারি আইন সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নয়। ৪. সম্পাদক ও মুদ্রকরা সাধারণভাবে মালিকের হাতের পুতুল মাত্র।

১৯২১---- পাঞ্জজন্য, আন্নেসা, জ্যোতি, আল বুশরা, সিলেট ক্রনিক্যল। ১৯২২----শ্রী শ্রী সোনার গৌরাঙ্গ। ১৯২৩----আইনুল ইসলাম। ১৯২৪-----সংসারী, রওশন, হেদায়েত, দেশের কথা, হাফেজ শক্তি, যুগবানী। ১৯২৫----শিক্ষা পত্রিকা, তরুনপত্র, নাজাত। ১৯২৬-----উন্মেষ, যুগের আলো, নকীব, দরদী, বেপরোয়া, সবুজ পল্লী, অভিযান। ১৯২৭----শিখা, কাসেদ, ইসলামবাদ, সুরমাভ্যালি ম্যাগাজিন, দি সিটিজেন। ১৯২৮----আল কাদেরী, সুরমা উপত্যকা, তাইদে এছলাম,

Dhaka University Institutional Repository

বাসন্তী, জাগরণ, জনশক্তি, মোয়াজ্জিন, সঞ্চয়, তরুণ, বাণী । ১৯২৯-----আল হক ম্যাগাজিন, দৈনিক পাঞ্চজন্য। ১৯৩০-----বগুড়ার কথা, মাদ্রাছা ম্যাগাজিন, মকতব, সেবকের বানী, যুগভেরী, মুক্তি, সিলেট বার্তা, আওয়াজ, রাষ্ট্রবার্তা।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সংবাদপত্র জগতে বিস্তৃতির লক্ষণ স্পষ্ট সশস্ত্র আন্দোলন, অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওই সব পত্র -পত্রিকার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এই সুবর্ণক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তেমনি অহিংস পথেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ সাংঘাতিকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ইংরেজ সরকার বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বিবিধ অর্ডিন্যান্স জারি নিস্পেষণ শুরু করে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে জনমত দমনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অনেকগুলো পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ করা জরুরী যে ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতের সংবাদপত্রের ওপর নতুন কোন বিধি নিষেধ জারী করা হয়নি। ১৯৩০ এর ২৩ এপ্রিল জারি করা হয় নতুন প্রেস অর্ডিন্যান্স। এর ফলে ১৯১০ সালে করা সংবাদপত্র আইনকে জাগিয়ে তোলা হয়। নতুন অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে ভারতের ১৩১ টি সংবাদপত্রকে সিকিউরিটি জমা দিতে বলা হয়। সে সময় সরকারী তহবিলে প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জামানত জমা পড়েছিল। বন্ধ হয়েছিল ৯ টি সংবাদপত্রের প্রকাশনা। অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে ২ দিন বন্ধ ছিল পত্রিকা।

১৯৩০ এর প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে আয়েঙ্গার এর সভাপতিত্বে ভারতীয় সম্পাদকদের সর্বপ্রথম এক ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক থেকে সংবাদপত্র দমনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেও এ প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সরকার সংবাদপত্র দমন নীতি বহাল রাখে। ১৯৩১ সালে নতুন করে এক বছরের জন্য প্রেস ইমার্জেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৩১-এ সংবাদপত্র জরুরী ক্ষমতা আইন ১৯৩১ জারি করা হয়। আইনে যে কোন সংবাদপত্র ও পুস্তকে উত্তেজনা সৃষ্টি বা খুনের অনুমোদন অথবা হিংসাত্মক কাজে উস্কানি দেওয়া ছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের কোন সেনা বা পুলিশকে প্ররোচিত করা বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করার বা কাউকে ভয় দেখানোর, সরকারি কর্মচারিকে তার কাজ করতে বাধা দেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্যতম ইঙ্গিত থাকলেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়। ওই আইনে ডিক্লারেশন বাতিল, জামানত বা প্রেস বাজেয়াপ্ত ছাড়াও কারাদন্ডের ব্যবস্থা আরোপিত হয়।

১৯৩১----- রংমহল। ১৯৩২----পুরবী, আল-ইসলাহ, মনিপুরী, শান্তি, হরফুল কোরান, অঞ্জলী, পল্লীমঙ্গল। ১৯৩৩-----মুকুলিকা, অভিযান, জনমত। ১৯৩৪----উদয়কাল, পল্লী দীপিকা,

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিবিজ্ঞান, সত্যবার্তা, ইসলাম প্রচার, যুগধর্ম, যুগশঙ্খ, ফরোয়ার্ড (কলকাতা থেকে প্রকাশিত)। ১৯৩৫----- দেশপ্রিয়, প্রতিভা, আজান, খ্রিষ্টান জগত। ১৯৩৬-----জনমত, পুরবী, করতোয়া। ১৯৩৭----নকীব, বাঁশ ও বাঁশী, আত্রাই। ১৯৩৮----জাগরণ, অরুন, প্রভাতী, অভিযান, অধিকার, পার্বণী, খোশরোজের সওগাত, দৈনিক কৃষাণ। ১৯৩৯----বলাকা, মোজাহিদ, যুগের আলো, দি আসাম হেরাল্ড, নিউ এজ, আসাম লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট রিভিউ, তৌহিদ। ১৯৪০----- সূর্যোদয়, আল জালাল, কাল বৈশাখী, ত্র্যহস্পর্শ, সংহতি। ১৯৪১----সাহিত্য, নওরোজ, কণিকা, ঠাকুরগাঁ দর্পণ, দি এওয়েকিং। ১৯৪২----প্রভাতী, তকবীর, জালালাবাদ, নবারুণ, প্রলুব্ধ ভারত, অযাত্রিক, বণ্যা, ভবানীপুর পল্লী মঙ্গল। ১৯৪৩----সুরমা উপত্যকা, অগ্রদূত, পল্লীবাণী। ১৯৪৪-----সন্ধানী। ১৯৪৫---- মিল্লাত,স্বাধীনতা (কলকাতা থেকে প্রকাশিত)। ১৯৪৬----পূর্ব-পাকিস্তান (তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠনের জল্পনা কল্পনা চলছে)। ১৯৪৭-----আজান, যুদ্ধবার্তা, সেবক, শান্তি, আশা, দেশের কথা, প্রজাবাহিনী।

আগষ্টের পূর্বে পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক জিন্দেগী, দৈনিক পয়গাম, সাপ্তাহিক ইনসাফ, পাক্ষিক তকবীর, মাসিক সীমান্ত, মাসিক কৃষ্টি, পাক্ষিক আনসার, সাপ্তাহিক ফরিয়াদ, সাপ্তাহিক ছাত্রলীগ।

"বিদেশী শাষন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার ব্যাপারে বাংলা সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলনা। ৪৭ পূর্ববর্তী পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ পত্রিকার মালিক সম্পাদক ছিলেন হিন্দু। দেশ বিভাগের ফলে এদের অনেকেই ভারতে চলে যান। এর ফলে পূর্ব-বাংলার সংবাদপত্র জগতে শূণ্যতা দেখা দেয়। সেই সময়ে ঢাকায় কোন দৈনিক সংবাদপত্র ছিলনা। ঢাকা ও পূর্ব-বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রকাশিত কিছু সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা এই অঞ্চলের মানুষের সংবাদপত্রের চাহিদা পূরণ করতো। এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো কলকাতা থেকে প্রকাশিত কিছু পত্র -পত্রিকা।"(১৩)

বিশ শতকের চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ মহাভাঙ্গনের কাল হিসেবে পরিচিত। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, যুদ্ধ, ঝড়, কৃষক আন্দোলন একের পর এক আঘাতে তোলপার করে দিয়েছে গোটা বাংলাকে।

১৯৪৮----- নওবেলাল, নতুন আলো, তাওহীদ, নওরোজ, তকবীর, নবনূর, জিহাদ, সৈনিক, সংকেত, মুকুল, যুগের দাবী, নয়াসড়ক, নিশান। ১৯৪৯----- ঝংকার, আজান, মাহনও, মিনার, রেনেসাঁ, চন্দ্রবিন্দু, সুলতানা, অন্ন চাই আরো চাই, দিলরুবা, তানজীম, অগত্যা, নজরুলিকা, জনমত, পাকিস্তান, নওবাহার, ইমরোজ, দ্যুতি, প্রবাহ, তরজমানুল হাদিস, পাকিস্তান অবজারভার

Dhaka University Institutional Repository

(ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা), ইত্তেফাক, দীপালী। ১৯৫০--- ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট, তাহজিব, মুকুল, নতুন সকাল, হোমওপ্যাথ, মুফতি, ইনসাফ, খেদমত, হুল্লোড়, জিন্দা, তকবীর, মানসী, উদয়ন, কো-অপারেশন, সমবায়, তাবলীগ, কোহিনুর, সিনেমা, দিশারী, তওফিক। ১৯৫১---- পাক হিতৈষী, পাক সমাচার, সবুজ নিশান, রুপছায়া, পরিচিতি, এলান, কাসেদ, পঞ্চায়েত, ইশারা, কাজের কথা।

খায়রুল কবিরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক সংবাদ। (দৈনিক সংবাদের নামকরণ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব) এখানে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। সেসময়ে সংবাদ নাম নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছিল। এটি একটি সাহসের ব্যপার ছিল বটে। ১৯৫২---- দৈনিক মিল্লাত, পাকিস্তানী খবর, মার্কিন পরিক্রমা, মাসিকপত্র আজকাল, সবুজপত্র, দৈনিক আমার দেশ, আলোর পথে, যাত্রিক ।

তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরী সংবাদ ও সাময়িকপত্র বা যে কোন ধরণের খবর ভারত ও পাকিস্তানে যে পরিমাণ সাম্প্রদায়িকতার স্বপক্ষে প্রকাশতি হয়েছে সে সময়ে পূর্ব বাংলা এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো সে তুলনায় ছিল যথেষ্ট অসাম্প্রদায়িক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। যেমন ১৯৫২ তে ভাষা আন্দোলনের ৫ মাস পর প্রকাশিত হলো মিল্লাত। এর প্রকাশক ছিলেন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)। এসময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের সাথে ছিল তার ক্ষমতার লড়াই। নুরুল আমীনের বেতার ভাষণের বক্তব্য লেখা হয়েছিল মিল্লাতের সাংবাদিক খোন্দকার আবদুল হামিদকে দিয়ে। কিন্তু যে দিন ভাষণটি প্রচারিত হয় তার পরের দিনই মোহন মিয়ার নির্দেশে মিল্লাতে সম্পূর্ণ বিপরীত যুক্তি দিয়ে সম্পাদকীয় ছাপা হয়। এর মধ্যেও অবশ্য কিছু কিছু পত্রপত্রিকা কখনো সরাসরি জনগনের দাবি-ইচ্ছেকে সমর্থন না করে পুরোপুরি সরকারের সাফাইও গেয়েছে।

যেমন ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় বিদ্রুপ করা হয়েছে। ১৯৫৩----চিত্রালী, প্রতিভা, স্পন্দন, মোহতাদী, বিদ্যুত। ১৯৫৪---- আলাপনী, নূর, জামানা, অভিযান।

পঞ্চাশের দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। এ নির্বাচনে আজাদ, সংবাদ, মর্নিং নিউজসহ ঢাকার সব প্রধান পত্রিকা ছিল মুসলিম লীগের সমর্থক। ব্যতিক্রম ছিল ইত্তেফাক। যুক্তফ্রন্টের সমর্থক অপর পত্রিকা অবজারভেশনের প্রকাশণা তখন বন্ধ। ১৯৫২ সালের

Dhaka University Institutional Repository

রাজরোষে পড়ে পত্রিকাটির প্রকাশণা বন্ধ হয়েছিল। তখন থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত পত্রিকাটির আর প্রকাশনা হয়নি।

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট পাকিস্তান প্রেসক্লাব যার নাম ১৯৭২ সালে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অসাম্প্রদায়িক শান্তি আন্দোলন, রবীন্দ্র আন্দোলন, বাঙ্গালীর সাহিত্য সংস্কৃতির ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রেসক্লাবের সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও প্রেসক্লাব সদস্যদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯৫৫---- সেতারা, ইত্তেহাদ, শাহীন, খেলাঘর, অনন্যা, বুনিয়াদ, জনমত, নতুন দিন, আমার বাংলা, আমোদ, দেশের দাবী। ১৯৫৬----শিক্ষক সুহৃদ, হামদর্দ, খাদেম, পারমিতা, শতদল, চাষী, সচিত্র সন্ধানী, জনতা, কিশোর সাহিত্য, পাকসারজমীন, দেশের দাবী, মুজাহিদ, নিশানা, দিগন্ত, জনমত, রমনা, নতুন খবর, প্রবাহ, পল্লীবার্তা, পূর্বদেশ। ১৯৫৭----বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বিজ্ঞান বিচিত্রা, সাহিত্য পত্রিকা, যোগাযোগ, রাঙ্গা প্রভাত, আজ, সমকাল, আরাফাত, দেশের ডাক, ব্রিটিশ দর্পণ।

১৯৫৭ সালে সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেস কমিশন গঠনের জন্য চাপ দিতে থাকে। ১৯৫৮ সালে বিচারপতি বদরুদ্দীন তাইবেজীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় একটি প্রেস কমিশন। এই কমিশন সব কিছু বিচার বিবেচনা করে সাংবাদিকদের উপযোগী বেতন স্কেল ও চাকরীর অন্যান্য নিয়ম নীতি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৬০ সালে আইয়ুব খান সাংবাদিকদের চাকরীর শর্ত সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারি করেন। গঠন করা হয় ওয়েজ বোর্ড।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। সংবিধান বাতিলের সাথে সাথে সামরিক সরকারের সব ধরণের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়। ৮ অক্টোবর পূর্বাঞ্চলে সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খান সামরিক আইন বিধির ৩৫ ধারা ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় কোন ব্যক্তি লিখিত বা মৌখিকভাবে জনগণের মধ্যে হতাশা, আতঙ্ক বা সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড দেয়া হবে। ২৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে দিয়ে আইয়ুব খান দেশ পরিচালনার পুরো কর্তৃত্ব গ্রহন করেন। এ সময় ব্যাপক ধরপাকড় ছাড়াও সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। অদ্ভুত এক নিয়ম চালু হলো, সংবাদপত্র ও পত্রিকায় যে সব খবর ছাপা হতো তা আগের দিন সমস্ত কপি পাঠিয়ে দিতে হতো গভর্নর হাউসে। সেখানে কেন্দ্রীয় তথ্য দফতরের একটি অস্থায়ী অফিস কাজ শুরু করে। সমস্ত সংবাদ পুখানুপুংখু রুপে পর্যবেক্ষণের পর তা ছাপানোর নির্দেশ দিয়ে প্রেসে পাঠানো হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯ সালের ২৯, ৩০, ৩১ জানুয়ারী করাচীতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের লেখক সাহিত্যিকদের একটি সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এটি ছিল বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করার একটি কৌশল। এই সম্মেলন থেকে গঠিত হয় রাইটার্স গিল্ড বা লেখক সংঘ। 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন' নামে গঠিত এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার পছন্দসই বই-পুস্তক রচনার বিনিময়ে সাহিত্যিকদেরও টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করেন।

১৯৬০ সালের ২৬ এপ্রিল আইয়ুব খান 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। ১৮৭৬ সালে জারিকৃত 'প্রেস এন্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক অ্যাক্ট' এবং ১৯৩১ সালের 'সংবাদপত্র জরুরী আইন' একত্রিত করে সৃষ্টি হয় এই অর্ডিন্যান্স। এতে পূর্বোক্ত আইন দুটিকে শুধু সুসংহতই করা হয়নি, সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আইনের বিধিনিষেধগুলোকেও ৬১ ধারা জারির মাধ্যমে কার্যকর রাখা হয়।

সরকারের দৃষ্টিতে সন্দেহযোগ্য প্রেস মালিক এবং প্রকাশকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জামানত দাবি করার জন্য তল্লাশিকারকদের দেয়া হয় আইনগত অধিকার। ১৯৬০ সালের ২৯ মে সংবাদপত্র পরিষদ এক বিবৃতিতে 'এ আইন মত প্রকাশের এবং সংবাদ পরিবেশনে স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করবে ' বলে অভিমত প্রকাশ করে।

১৯৬৩ সালে ২ সেপ্টেম্বর সরকার সংবাদপত্র দমনের জন্য কুখ্যাত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অধ্যাদেশে সরকার প্রেসনোট ও তথ্য বিবরণী অনুপুংখ মুদ্রণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এর অন্যথা হলে প্রেস এবং সংবাদপত্রের কপি বাজেয়াপ্ত করা এবং সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ শাস্তির বিধান দেয়া হয়। প্রেস মালিকের জামানতের পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে পত্রিকা বা প্রেসের অর্থ প্রাপ্তির সূত্র এবং মালিক সাংবাদিক কর্মচারি বিরোধের মত অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য সরকারকে কমিশন নিয়োগের অধিকার দেয়া হয়। এই কমিশন ইচ্ছা করলে পত্রিকার প্রকাশনা অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য বন্ধ করতে পারত। সরকার সংবাদপত্রের ওপর যখন তখন হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যই এই অর্ডিন্যান্স জারি করে।

পূর্ব বাংলার সাংবাদিকরা এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী পালিত হয় ঐতিহাসিক সাংবাদিক ধর্মঘট। ওই দিন প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রবীন সাংবাদিক মওলানা আকরম খাঁ। আন্দোলনের মুখে ১১ সেপ্টেম্বর সরকার এক মাসের জন্য এই অধ্যাদেশের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩ সালের ১০ অক্টোবর ঘোষিত হয় নতুন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স। এতে পূর্বতন অর্ডিন্যান্সের অধিকাংশ ধারাই রহিত বা পরিবর্তন করা হয়।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে কাশ্মীরে হযরত বাল মসজিদে শেষ নবীর স্মৃতি সংরক্ষনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ। এর প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তানেও শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সরকার অবাঙ্গালীদের ভারা করে নিয়ে এসে এ দাঙ্গা বাধায়। কিন্তু বাঙ্গালীর অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা তখন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। গঠন করা হয় সর্বদলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি। সক্রিয়ভাবে এই কমিটি দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য মাঠে নামে। এসময় এ দলে অগ্রনী ভূমিকায় যারা ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী, বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন ওয়াহিদুল হক, আহমেদুর রহমান, আনোয়ার জাহিদ, সিরাজুল হোসেন খান।

এসময় অসাম্প্রদায়িকতার একটি যুগান্তকারি ভূমিকা রেখেছিলো পূর্ব বাংলার পত্র পত্রিকার সম্পাদকেরা। সব সম্পাদকেরা এক হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেণ অসাম্প্রদায়িকতার জন্য একদিন প্রতিটি সংবাদপত্রের একটি হেডিং-এ প্রকাশিত হবে। সেই মোতাবেক ১৯৬৪ সালের ১৭ জানুয়ারী পূর্ব-বাংলার দৈনিকগুলোর ব্যানার হেডিং ছিল ‘ পূর্ব-বাংলা রুখিয়া দাড়াও।’ তবে যেসব পত্রিকা তখন পাকিস্তনি শাষক সমর্থক ছিল তারা বাধ্য হয়েছিল ছাপতে কিন্তু তারা লিখেছি ‘পূর্ব-পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও’।

অসাম্প্রদায়িকতার এই ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালিন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্ত ানি শাষকদের ক্ষোভ আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। তাদের দৃষ্টিতে এটি দুর্বলের মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠার মত স্পর্ধা প্রতীয়মান হয়েছিল।

১৯৬৭ সালের জুনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। সংসদে তথ্য মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে ‘পাকিস্তানের আদর্শের সাথে না মিললে রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হবে। এ সংবাদে ঢাকার বুদ্ধিজীবি মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। তবে অল্প কয়েকজন এতে সমর্থন দিলেও বেশিরভাগই ছিলেন এ প্রচারণা বন্ধ করে দেয়ার বিরুদ্ধে। আগষ্টে সরকার রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের জোয়ারে ওই নিষেধাজ্ঞা ভেসে যায় খড়কুটোর মত ।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই এক দশক ছিল আইয়ুব খানের শাসনামল, এ সময়ে পূর্ব-বাংলা থেকে যথেষ্ট পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৮----- যুগবাণী, আল ইসলাম, দরবার, জুনিয়র রেডক্রস, অবরুদ্ধা, সবার পত্রিকা, ধূমকেতু, যুগরবি, সিভিল ডিফেন্স, আলো, নাজাত, আমাদের দেশ, নকীব, উত্তরণ, পাকিস্তানের কৃষি, নবজাত, চাবুক, শ্যামলী, মিনার এবং জাহানে নও। ১৯৫৯----- পরিচিতি, শেফা, হোমিওপ্যাথ, মৃদঙ্গ, কিশলয়, নওরোজ, সাহিত্যিকী, জাগরণ, রূপকথা। ১৯৬০---- ফুলকি, পাঁচ মিশালী, যুগবানী, যাত্রী, রংধনু, সাহিত্য, পূর্বমেঘ, বই বিচিত্রা, পত্রিকা, বিবর্তন, আজাদী, মধুমেলা, পূবালী ইত্যাদি। ১৯৬১----- উন্নয়ন, কারখানা, ঝংকার, মদিনা, রাহবার, প্রবাহ, কোহিনুর, সংলাপ ইত্যাদি। ১৯৬২----- নবারুণ, পাপড়ি, শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র, অঙ্গনা, চৈতালী, মধুমতি, বলাকা, শপথ, নতুন পত্র, সবুজপাতা, সাজঘর, আল হেরা হিতকরী, জনকল্যান, মৃত্তিকা ইত্যাদি। ১৯৬৩------ পৃথিবী, কর্ণফুলী মোহনা, গৃহশ্রী, তবরী, সৈকত, সমযুগ, যমুনা, গ্রামের কথা, প্রতিভা, বলাকা , মহাস্থান ইত্যাদি। ১৯৬৪---- আল হাকিম, জালালাবাদ, সংযোগ, মৌসুম, উত্তরবার্তা, ইসলামাবাদ, দর্পণ। ১৯৬৫----- কলরোল, ফসল, বই, স্বদেশের ডাক, দিনাজপুর, পরিক্রমা, দেশের ডাক, ময়নামতি, চিন্তা, কেতন, মশাল, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। ১৯৬৬----- বিজ্ঞান সমাচার, সংসার, সাতরং, দীপিত, প্রান্তিক, ললনা, অভিযান, সুখী জীবন, বরিশাল দর্পণ, চন্দনা, ঝিনুক, অগ্রণী। ১৯৬৭------ উদয়ন, জনমত, জীবন ও যৌবন, পলিমাটি, নতুন দেশ, ঋতু রঙ মন, তমুদ্দুন। ১৯৬৮------ লিপিকা, ইতিহাস পত্রিকা, পার্বত্য বাণী, সমীক্ষা, সুরভি ও বিশ্ব ডাক।

ষাটের দশকে দৈনিক আজাদ পরিণত হয় পূর্ব বাংলার মুখপত্রে। মওলানা আকরম খাঁর জীবদ্দশাতেই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম লীগ গোষ্ঠীর মুখপত্রের ভূমিকা থেকে প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের বাণী বাহকের ভূমিকায় আজাদের রূপান্তর ঘটে। এর প্রধান কৃতিত্ব আকরম খাঁর ছোট ছেলে কামরুল আনাম খাঁ মুকুলের। পরে আইয়ূব শাষনের রোষানলে পড়ে এই মুকুল খাঁকেও মিথ্যে মামলায় কারাবন্দী হতে হয়েছে। অক্টোবরে পূর্ব-বাংলায় আইয়ুব সরকার বিরোধী যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, ১৯৬৯ এর জানুয়ারীতে তা আরো তীব্র আকার ধারণ করে, মধ্য জানুয়ারীতে তা গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ২০ জানুয়ারী পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হয় ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান। চারদিকে আন্দোলন, রক্তপাত, ঘেরাও আন্দোলন, জনতা পুলিশ লড়াই বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্টনমেন্ট শহরগুলিতে মাঝে মাঝে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে চলে জনতার লড়াই। ঢাকার জনতা তখন একাধিকবার কারফিউ ভঙ্গ করে। এ সংবাদ ফলাও করে তুলে ধরা হয় সে সময়ের আজাদ, সংবাদ, অবজারভার এমনকি ট্রাস্ট ব্যবস্থাধীন দৈনিক পাকিস্তানেও। মর্নিং নিউজে গণআন্দোলনের খবর ছাপা হতো নিয়মিত। তবে ট্রিটমেন্ট থাকতো ভিন্ন।

১৯৬৯----পূর্বাঞ্চল, মা, সমবিধান, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, আলো, যুগের ডাক, বন্যা, মধুমিতা, অধিকার, উত্তরা, গণদাবী, নয়া জামানা, গণবানী, চিত্রলেখা, মজদুর, তাহজীব।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ ------ বাংলার বাণী, দৈনিক সংগ্রাম (বাংলার বাণী মানুষের কাছে স্বাধীনতার ডাক পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল, সেক্ষেত্রে দৈনিক সংগ্রাম ছিল এ দেশে জামায়াতের মুখপত্র।
১৯৭১------ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার মাত্র কয়েক মাস পূর্বে পূর্ব বাংলা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক স্বরাজ ও সাপ্তাহিক গণবাংলা।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানীদের আক্রমনে প্রথম স্বীকার হয় সংবাদপত্র। ২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল দৈনিক 'দ্য পিপল' পত্রিকার ৬ সাংবাদিক-কর্মচারী। ২৬ মার্চ পুড়িয়ে দেয়া হয় ইত্তেফাক ও ২৮ মার্চ সংবাদ অফিস। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া জারি করেন ৭৭ নং সামরিক বিধি। এতে অনেকগুলো বিধির সাথে বলা হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম ধর্ম অবমাননার চেষ্টা এবং কায়েদে আযমের প্রতি অবমাননার চেষ্টা নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। একই বিধিতে সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন বা ছাড়পত্র ব্যতীত সব ধরণের রাজনৈতিক সংবাদ মুদ্রন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

নিয়ম করা হয় এ আদেশ লংঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়ার। একাত্তরে সংবাদপত্রের কণ্ঠ এভাবেই রুদ্ধ করা হয়েছিল। সামরিক জান্তা তাদের হত্যাযজ্ঞ গোপন করতে ২৬ মার্চ সকালে ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিকদের ৩০ মিনিটের মধ্যে ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। সাংবাদিকদের সব আলোকচিত্র ও প্রতিবেদন আটক করে তাদের তুলে দেয়া হয় বিমানে । তবে এরপরও নারকীয় হত্যাকান্ডের বর্ণনা বিভিন্ন সূত্রে বহির্বিশ্বের মানুষ জানতে পারে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তারা বুঝতে পারে সংবাদপত্রবিহীন দেশ চালালে বাইরের পৃথিবীর কাছে গোপন খবর ফাঁস হয়ে যাবে। তাই স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে প্রমান করার জন্য সামরিক সরকার সংবাদপত্রের মালিকদের সংবাদ প্রকাশের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুসারে ২৯ মার্চ থেকে ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার এবং পূর্বদেশ প্রকাশিত হয় পরে ইত্তেফাক। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অন্য কোন দৈনিক প্রকাশিত হয়নি সংগ্রাম ছাড়া। এটি ছিল স্বাধীনতা বিরোধি জামায়াতের একটি পত্রিকা। সংগ্রামে পূর্বের দিনের নারকীয় হত্যাকান্ডের বদলে পত্রিকাটিতে প্রকাশ করা হয় সরকারের বিভিন্ন নির্দেশ ও প্রেস নোট। ২৬ মার্চ থেকে পত্রিকাটি প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে ছাপা হতো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পত্রিকাটি পুরোটাই স্বাধীনতার বিপক্ষে খবর প্রকাশ করতো। এ সময় ইত্তেফাক ছাড়া সব পত্রিকাই কোন না কোন ভাবে সরকারের পক্ষে ছিল। তবে পত্রিকাগুলোতে কাজ করতেন স্বাধীনতার স্বপক্ষের অনেক সাংবাদিক। অনেক সুকৌশলে তখন তাদের একই সাথে পত্রিকার কাজ এবং স্বাধীনতায় সমর্থন করতে হত। তবে এসময় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে জয় বাংলা, দৈনিক বাংলাদেশ, স্বদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, বিপ্লবী বাংলাদেশ এর মতো বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১১ জানুয়ারী তিনি ঘোষণা করেন জাতীয়তাবাদ হবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মুলনীতি। গণতন্ত্র হবে রাজনৈতিক ভিত্তি, সরকার ব্যবস্থা হবে সংসদীয় পদ্ধতিতে, সংসদের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা থাকবে। আইনের শাষন প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষনের নিশ্চয়তা নিয়ে গঠিত হয় সংবিধান।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হয় স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান। কিন্তু এ বছরের জুলাইতে ছাত্রলীগের মধ্যে প্রথম শুরু হয় সংকট। ৭২ এ গঠিত হয় বাসস বা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর সাংবাদিকতা পেশায় সৃষ্টি হয় একদিকে প্রচন্ড আশা অন্যদিকে অসম্ভব শূণ্যতার। মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার কারণে অবজারভার ও দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী চলে যান পাকিস্তানে। মর্ণিং নিউজ ও দৈনিক বাংলাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। ২ জানুয়ারী সরকার সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা আদেশ জারি করেন। কোন বিদেশি সংস্থার সাথে সংবাদ সরবরাহের কোন চুক্তি তখনও হয়নি। কেবলমাত্র নিজস্ব সংবাদ দিয়ে দৈনিক পত্রিকা ও টিভি- রেডিওর সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করা হতো।

১৯৭২-----আমার বাংলা, জনমত, সোনার বাংলা, বাংলার ডাক, যুবশক্তি, দেশ বাংলা, জন্মভূমি, টেলিগ্রাম, নবীন, প্লাবন, সর্বহারা, চরমপত্র, নবযুগ, রুপসী বাংলা, দেশবার্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৯৭৩---- উত্তরাধিকার, খেলাধুলা, জনপদ, তাহজীব, ধলেশ্বরী, দর্শন, পূর্বভাস, কচিকণ্ঠ, ক্রীড়াঙ্গন, সিনেমা, গণবাংলা, ভীমরুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৯৭৪--------প্রসঙ্গ, গণমুখ, চিত্রকল্প, বিবর্তন, স্বরলিপি, কিষাণ, জায়া। ১৯৭৫----প্রবাসীর ডাক, চাঁদপুর বার্তা, কাঁকন, মেহনতি কণ্ঠ, শুভেচ্ছা, মৌমাছি, যুবরাজ।

উপমহাদেশে গণমাধ্যমের বিকাশের বিভিন্ন স্তর তুলে ধরার কারণ এর বিকাশমান কাল থেকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে টিকে থাকার প্রচেষ্টা দেখানো। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকার স্বরুপ প্রকাশ করা। একই সাথে সংবাদপত্রগুলোর নাম ও প্রকাশনার সাথে জড়িয়ে আছে সমসাময়িক সমাজে বিভিন্ন ক্ষমতাধর ব্যক্তি, রাজনৈতিক, সামাজিক দলের ইতিহাস।

সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর প্রকাশ করেছে নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে তা নয়। কেমন করে শুধু ইউরোপীয়দের জীবন চরিত্র, ব্যবসা বাণিজ্যের খবর থেকে ক্রমে স্থানীয়দের কথা, এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তারপর বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমে প্রকাশ করা হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র সেটি বোঝানোর জন্য সংবাদপত্রের ইতিহাস ও তার পরিবর্তিত পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যম যেমন জনগণকে উসকে দিতে পারে বিরোধে আবার গণমাধ্যমই পারে ভয়াবহ দাঙ্গা নিরোধ করতে। গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কয়েকটি মন্তব্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে এটি আরো স্পষ্ট করা হলো। "উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা এখন আর কেউ খাটো করে দেখেনা। অনেকে তো মনে করে, বিদেশী শাষণ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার ব্যাপারে সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।"(১৪)

ইন্ডয়ান পলিটিক্যাল এসোসিয়েশন এন্ড রিফর্ম লেজিসলেচার-এ বর্ণিত গণমাধ্যমের ভূমিকা থেকে বলাই যায় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাষন থেকে মুক্তির জন্য সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সে সময়ে হাতে লেখা কাগজে যে স্বদেশির ডাক অথবা লিফলেটে প্রচারণার মধ্যে দিয়ে যে দেশপ্রেমের আহ্বান জানানো হতো সেই আহ্বানইত মুক্তির জন্য এক করেছিল হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধকে। অপর দিকে সংবাদপত্র বা ত্বরিত যোগাযোগ ব্যবস্থার কুফলও রয়েছে। "আগেকার দিনে দাঙ্গা ব্যাপক আকারে হতোনা, যান-বাহনের, তার-বেতারের অভাবে খবর স্থানান্তরে ছড়াত না বলেই স্থানিকভাবে দাঙ্গা বাঁধত, আবার দিনান্তে শেষও হত।"(১৫)

অর্থাৎ দ্রুত সংবাদ পৌছানোর যেমন অনেক সুফল তেমনি কিছু কুফলকেও অস্বীকার করা যায়না। ১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদ দাঙ্গায় সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, "পরদিন দুপুরের মধ্যে এবং তারপরও দাঙ্গা চলাকালীন ছাপা ও সাইক্লোস্টাইল করা নাম ঠিকানাবিহীন ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণযুক্ত ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী শত শত ইস্তাহার ছড়ান হয়, দাঙ্গাকারীরা যেভাবে অবাধে কেরোসিন ও পেট্রোলের ব্যবহার করে এবং এমন কি মধ্যবিত্ত এলাকার দেওয়ালগুলিকেও ব্ল্যাকবোর্ডে পরিণত করে দাঙ্গা চলাকালীন মুসলমান বিরোধী স্লোগান ও দাঙ্গার মিথ্যা অতিরঞ্জিত খবর কিছু দিন নিয়মিতভাবে লেখা হতে থাকে।"(১৬)

"এ সময় গুজরাতের পত্রিকাগুলোর ভূমিকাও ছিল সমালোচিত। যেমন আহমেদাবাদ দাঙ্গার পূর্বে ১৯৬৮ সালে আহমেদাবাদের জমিয়ত-উল-উলেমা-এর আহ্বানে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের এক সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাবের সাথে মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের শুক্রবারের নামাজে যোগ দেবার বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়। কংগ্রেসের কিছু হিন্দু নেতা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও, গুজরাতের জনপ্রিয় সংবাদপত্র সমূহ ও একাধিক বুদ্ধিজীবি দাবিগুলিকে সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম অনগ্রসরতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন। তার পরিণামে হিন্দু-মুসলমান মানসিক ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। "(১৭)

Dhaka University Institutional Repository

"পরের বছর ১৯৬৯ সাল আরবের আল-আকসা মসজিদে আক্রমনের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদ ও গুজরাতসহ সব শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের হলো (যদিও আল আকসা মসজিদে হামলা ছিল স্বয়ং মুসলমানদের অন্তর্গত দ্বন্দের ফল)। এর পরই একাধিক গুজরাতী পত্র-পত্রিকয় ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মুসলমানদের এই ধর্মান্ধ ভূমিকার সমালোচনা করে জনমত তাদের প্রতিকূল করে তুলল। এই সময় 'গুজরাত সমাচার ' পত্রিকা লিখল যে তাদের পবিত্র মসজিদের উপর এই আক্রমনে মুসলমানদের দুঃখিত হওয়া হিন্দুরা বোঝে এবং এর জন্য তাদের প্রতি সহানূভূতিশীলও। তবে ' ঐতিহাসিক অবিচার দূর করার জন্য মুসলমানদের উচিত কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের যে অংশ ঔরঙ্গজেবের মসজিদ নামে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সিধপুরের শিব মন্দির রুদ্রমল যাকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে তা প্রত্যর্পন করা। একাধিক গুজরাতী সংবাদপত্রের এ ধরনের সহমর্মিতার দৃষ্টি দেখিয়ে সাথে সাথে আরো উস্কে দেয়ার পরিণামেই এ বছরে আহমেদাবাদে দাঙ্গা আরো ত্বরান্বিত হয়েছিল। "(১৮)

"আমরা জানি মনুষ্য সমাজে বুনো-বর্বর ও সভ্য-ভব্য মানুষ আদি ও আদিমকাল থেকেই গৌষ্ঠিক, গোত্রিক, জাতিক কোন্দল করে করেই, নরহত্যার মাধ্যমে রাজ্যজয় করে করেই, শাষনের শায়েস্ত ার দমনের-দলনের প্রয়োজনে প্রজা বা শাসনপাত্র হত্যা করে করেই মানবজাতি হিসেবে আজকের স্তরে উন্নীত হয়েছে কোথাও কোথাও। আফ্রিকায়-এশিয়ায় কিংবা আরণ্য মানবে মনুষ্যত্বের ও রাজনীতিক নৈতিক সামাজিক সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি বলে সেখানে নির্বিচার হত্যা চলে আজো, এখনকার রুয়েন্ডায় বা লাইবেরিয়ায় বা দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিংবা কালো আফ্রিকার সব রাষ্ট্রে আজো হাজারে হাজারে লাখে লাখে নরহত্যা পার্বণিক উৎসবের আকার ধারণ করে অতএব পরিবারে, পাড়ায়, মহল্লায় স্বজনের ও জাতির মধ্যে মারামারি ঘটে। পাকিস্তানে জির্গা অঞ্চলে এখনো প্রাচীন আরবের মতোই হত্যায় হত্যার বদলা নেয়ার রেওয়াজ চালু আছে। কেবল বিধর্মীয় বিভাষীয় বিদেশীর বিজাতির মধ্যে মারামারি হানাহানিকেই আমরা আজকাল বিশেষ অর্থে 'দাঙ্গা' নামে অভিহিত করি। আর রাষ্ট্রিক জাতীয়তার আবশ্যিকতায় ও অপরিহার্যতায় আস্থা রাখি বলেই আমরা ভিন্ন ধর্ম বা শাস্ত্রমতবাদীর দ্বন্দ-সংঘর্ষ-সংঘাতকে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' নামে আখ্যায়িত করি। আসলে ব্যক্তিগত যেমন, তেমনি অর্থ -বিত্ত-বেসাত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বীতাজাত দলগত লাভে, লোতে, অসুয়ায়, স্বার্থে এবং ক্ষতিতে বাধে এবং বাধায় দাঙ্গা সর্দার-মাতব্বর-রাজনীতিক প্রভৃতি বিদ্যান- বিত্তবান ধূর্ত লোকেরাই। আর আস্তিক মানুষের উদারতার একটা সীমা আছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাথলিক ও নিগ্রো ভোট পায়না। উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্টে হানাহনি চলে, শিয়া-সুন্নী -আহমদিয়ার দাঙ্গা আজো চলে, বর্ণ হিন্দুরা অচ্ছুত হত্যা করে, বাঙ্গালী- অসমি দাঙ্গা চলে, বড়ো, নাগা, কুকি, মিজো, শিখ, কাশ্মীরি প্রভৃতি দ্রোহী হয়,

Dhaka University Institutional Repository

তামিল-সিংহলী লড়াই করে, কারেনারা ইয়াঙ্গুনীর শাষন মানে না। কুর্দীরা তাই চির বিদ্রোহী। কুইবেকীরা কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এমনি পৃথিবীব্যাপী আজো জাতি-সম্প্রদায়-উপজাতি-আদিবাসী-জনজাতির স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবার সংগ্রাম চলছেই। তবু শান্তিপ্রিয় মানবতাবাদি মানবতাকামী মানুষ স্থায়ী মীমাংসায় স্থায়ী শান্তি কামনা করে।"(১৯)

তথ্যসূত্র

১. আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, কমিউনালিজম এন্ড কমিউনাল ভায়োলেন্স ইন ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১৮৯-৯০।

২. আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, কমিউনালিজম এন্ড কমিউনাল ভায়োলেন্স ইন ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১৯২-৯৩

৩. পূর্ববঙ্গের সমাজজীবনের কয়েকটি দিক, পৃষ্ঠা ২৩৭/ মুনতাসীর মামুন

৪. Prafulla Kumar Chakraborty, in a reference to this incident in his book 'The Marginal Men'

৫. Ashtosh Varshney, *Ethnic Violence and Civic Life*, (New Haven : Yale University Press,
2002), p.309

৬. **16 August 2010** Last updated at 01:30 GMT / The angry housewives setting Kashmir ablaze / **By Soutik Biswas**BBC News, Srinagar

৭.1 I 7.2 http://sundaytimes.lk/970105/plus2.html

৮. ইত্তেফাক ৩০ এপ্রিল ২০১১ পৃ ১ ও ১৯

৯. প্রথম আলো পৃ.২১ / ২০.২.১১

Dhaka University Institutional Repository

১০. প্রথম আলো / ২৬.১২.১০

১১. Posted on January 5, 2010 by Sassy| Leave a comment/b.b.c

১২. প্রথম আলো পৃ. ১২। (সরকারি খবরদারি নয়, চাই গণমাধ্যমের দায়বোধ)/ আনিসুল হক। ”

১৩. বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা / জুলফিকার হায়দার পৃ. ৯৮।

১৪. Biman behari majumdar, indian political association and reform legislature (1818-1917), calcutta, 1965, p1.

১৫. আহমদ শরীফ/ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা/ পৃষ্ঠা ১৮৬।

১৬. শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় দাঙ্গার ইতিহাস।

১৭. শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় দাঙ্গার ইতিহাস।

১৮. শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় দাঙ্গার ইতিহাস

১৯. আহমদ শরীফ/ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায় ঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচিতি

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাতের কারণ অসংখ্য। শ্রেণীগত বৈষম্যের কারণে দাঙ্গা, ভাষার অধিকার, শাষকের সাথে শোষিতের দাঙ্গা, ভূখন্ডের জন্য, বহিশত্রুর সাথে স্বজাতীদের, অর্থনৈতিক অবরোধের প্রেক্ষিতে, উপজাতিদের সাথে, চড়মপন্থী মৌলবাদিদের বিপক্ষে অবস্থান থেকে এমন অসংখ্য কারণে দাঙ্গা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে এ আলোচনায় মুল বিষয় সংল্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর দাঙ্গা। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষিত্রে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ন, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি না থাকলে এ ধরণের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতোনা।

একপক্ষ মনে করেন, দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলে নানা ধর্মের-জাতের মানুষ শান্তিপূর্নভাবে যে সহাবস্থানে তাতে তৃতীয় পক্ষের ইন্ধন ছাড়া দাঙ্গার মত পরিস্থিতি তৈরি হতোনা। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ডিভাইড এন্ডস রুলস অর্থাত ভাগ করো এবং শাষণ করো নীতিই একমাত্র কারণ। তার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও অবশ্য রয়েছে। যে যুগে সমাজবাদি আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে অর্ধশতাব্দি বিচ্ছিন্ন রাখা একই জাতির দুটি অংশ বার্লিনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে প্রায় এক হয়ে গেল সেই যুগে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে একই জাতির দুটি সম্প্রদায়ের মনে বিভেদের অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হলো। এটি সেই নীতিকেই সুস্পষ্ট ভাবে দায়ি করে।

'কমিউনালিজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া' বইতে বিপানচন্দ্র উল্লেখ করেছেন " communal tension and riots began to occur only in the last quarter of the 19th century, but they did not occur in India on any significant scale till 1946-47. Before that, the maximum communal rioting took place during 1923-26. A clear relationship between communal riots and politics was established for the first time in 1946 "(১)

১৯ শতকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটলেও উল্লেখযোগ্যভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় ১৯৪৬-৪৭ সালে। এর আগের অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ১৯২৩ থেকে ২৬ সময়কালের মধ্যে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্পষ্ট রুপ ও এর সাথে রাজনীতির সম্পর্ক প্রথম বলা যায় ১৯৪৬ সালেই। অর্থাত ডাইরেক্ট একশন ডের ঘটনাকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রথম উল্লখযোগ্য নজির বলেছেন বিপানচন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

" সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে বৃটিশ বিরোধী ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ও নির্ধারক দিকে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা ইংরেজরা ১৮৭০ এর দশক থেকে বেশ পরিকল্পিতভাবে শুরু করে তাকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও সুসংহত করার উদ্দেশ্যে তারা ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদেরকে সরাসরি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠন করতে উৎসাহি করে। শুধু উৎসাহিতই করেনা, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নানা ধরনের উদ্যোগও তারা একের পর এক গ্রহন করে।"(২)

এ ভূখন্ডে হিন্দু-মুসলমানের যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক তাতে চির ধরিয়েছে বিদেশি শাষকেরাই। আর এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি উন্মত্ত আচরণে উসকে দিয়ে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে উৎসাহি করেছে। যেমন ইংরেজরা আসার পর তাদের সৌহার্দ্য প্রকাশ পেয়েছে হিন্দুদের সাথেই বেশি। হিন্দুরা এগিয়ে গেছে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহনে। ব্রিটিশদের একপ্রকার সহযোগিতার মনোভাবও দেখিয়েছে। কিন্তু শিক্ষা গ্রহনের পর যখন তারা চাকরির দাবি করেছে তখনই ইংরেজদের টনক নড়েছে তখন আবার সুযোগ বুঝে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে তারা। ততদিনে শিক্ষা-জ্ঞান, ইংরেজি বিদ্যা থেকে দুরে থেকে স্বজাত্য বোধের অহংকারে পশ্চাদপদ মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের একটা বড় ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এ সময়ে ইংরেজরা মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করতে। যার প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে তৈরি হলো মুসলীম লীগ। এভাবে দু'সম্প্রদায়কে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের দিকে সুচতুরভাবে ঠেলে দিয়েছে ব্রিটিশ শাষকেরাই। ফলাফলে পারস্পরিক সহনশীল এবং বন্ধুত্বের মনোভাব নষ্ট হয়ে সহিংসতা শুরু হয়েছে। একপর্যায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে তা দাঙ্গায় রুপ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি দু সম্প্রদায়।

আর একপক্ষের মতে ইংরেজদের এই ডিভাইড এন্ড রুলস নীতি ইন্ধন দিলেও মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার কারণেই সহিংসতা দেখা দিত। দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি থাকলেও মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বায় রয়েছে ধর্মীয় চেতনাবোধ। অন্য সম্প্রদায়ত বহু পরের কথা ভেতরে ভেতরে মানুষ তার নিজ ধর্মেই শ্রেণী বিভাগে পড়লে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ধর্মান্তরিত হওয়ার ইতিহাসও এ উপমহাদেশে কম নয়। আর ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি শুধু মাত্র শ্রেণী বিভাগের ফলে আত্মমর্যাদা হেয় হওয়ার কারণে নয়। এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক সুরক্ষা, মৌলিক দাবি পূরনের বৈষম্য। তাই সহিংসতা বা অপরের প্রতি আক্রমনের মনোভাব প্রকাশ পেতই সেক্ষেত্রে উস্কে দিয়েছে ব্রিটিশ শাষণ। আর শুধু ডিভাইড এন্ড রুলস নয় আগাগোড়াই একপক্ষকে বেশি কদর তুলনামুলক অন্যকে কম সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্র থেকেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরী। এক সম্প্রদায়ের এগিয়ে যাওয়াই বিপরীতে অন্য সম্প্রদায়ের স্বজাত্যবোধের গোড়ামী পৃথক করে অবস্থানগত বৈষম্য তৈরি করেছে নয়তো এই বৈষম্যকে সাম্প্রদায়িকতার জন্য কাজে লাগাতে পারতোনা অন্যেরা।

'ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার ১৯৯০ সালে একটি সেমিনারে উল্লেখ করেছেন, " ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে আধুনিক কার্যকলাপের ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করার প্রথার মূল উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে। ইংরেজরাই কেবল ভারতের সমাজকে ধর্মআধারিত সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ব্যখ্যা করতেন না, ভারততত্ত্ব পন্ডিতদের রচনাবলীতেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়।"(৩)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরির বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর একটি মন্তব্য উল্লেখ করছি। এটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরী হওয়ার ক্ষেত্রে তার মন্তব্য আর এ মন্তব্যটি তুলে ধরেছেন ইন্ডিয়ান এ্যানুয়্যাল রেজিস্ট্রারের সম্পাদক মিত্র। তিনি দ্বিতীয় খন্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন "যে কোন সম্প্রদায়ের চোখের সামনে বিশেষ সুবিধা সমূহ নাচাতে থাকুন-সম্ভবত ঃ শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে সেই সম্প্রদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই টোপ গলাধঃকরণ করবে। আর একবার কোন সম্প্রদায় সেই মধু চাখার সুযোগ পেলে আবার শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে তার সেই সব বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছাড়তে প্রস্তুত না হবারই সম্ভাবনা। সেসব ছাড়তে তাকে প্রবুদ্ধ করার জন্য যত সুবিবেচিত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত প্রয়াসই নেওয়া হোক না কেন, তাতে সে রাজী হবেনা। এমনটা যদি সে সম্প্রদায় না করে তবে তাকে বরং অলৌকিক ব্যাপারই বলতে হবে।"(৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন "এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত রুপেই জানা আবশ্যক ছিল, আজও আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই না কেন, এই বাস্ত বটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবেনা। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোন পাপ ছিলনা, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।"(৫.১) এসব লক্ষ করেই হিন্দু-মুসলমানের হাতে রাখী-পরাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্প দিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিসান-ব্যাপারে (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এখানে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন) আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি বস্ত্র হরণ না করিয়া জলগ্রহন করিবনা। পরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা যেমন করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ মর্মান্তিকরুপে বীভৎস হইয়া উঠিল।.....

' কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি নাহলে মানুষের প্রাণ বাঁচেনা। যিশু বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবন ধারণ করেনা; তাহার কারণ মানুষের কেবল শরীর জীবন নহে।

'এই যে বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাস এ যদি কেবল বাহির হইতেই, ইংরেজদের শাসন হইতেই ঘটিত, তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এ উপবাসের ব্যপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু-মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক যায়গায় বাস করিতেছি বটে, কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে, আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি।" (৫.২)

Dhaka University Institutional Repository

তবে ইতিহাসে বিংশ শতকের আগে ছোট-খাট সহিংসতার ঘটনা থাকলেও পাশাপাশি দীর্ঘদিন সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের যে নজির এ জাতির রয়েছে তাতে এমন সহিংসতা হয়তো সম্ভব ছিলনা যদি এই ইন্ধনটি না থাকতো। এক হয়ে থাকা অর্থই শক্তি আর এই শক্তিকে ভাংতেই ব্রিটিশ শাষকেরা খুব সুচতুরভাবে ভাগ করে দুর্বল করার নীতিটি গ্রহন করে সক্ষম হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরিতে।

এই উপমহাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ তৈরী হলেও তা দাঙ্গার মত ভয়ানক হয়ে উঠার মুল কারন ছিল এই ভেদ নীতি আর এ নীতি যে শুধু বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে তারা প্রয়োগ করেছেন তা নয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালেই যখন ইংরেজরা এ জাতির এক থাকার মর্মার্থ টের পেয়েছিলেন তখন থেকেই বুঝেছেন হিন্দু-মুসলমান এক থাকলে ব্রিটিশদের পক্ষে শাষণ করা অসম্ভব। সিপাহী বিপ্লবের ২ বছর পর ১৮৫৯ সালে সরকার এক রয়াল কমিশণ নিযুক্ত করেছিলেন যাতে সিপাহী বিপ্লবের মত ঘটনা আবার না ঘটে তার উপায় বের করতে। ঐ রয়্যাল কমিটির সামনে লর্ড এলফেনস্টোন যে সাক্ষ্য দিয়েছিল " হিন্দু- মুসলমানের মিলিত সৈন্যবাহিনীর জন্য সিপাহীদের বিদ্রোহ করা সহজ হয়েছিল।"(৬)

কমিশন তাই ভারতবাসীর মধ্যে ভেদ-ভাবের বীজ বপন করার সুপরিকল্পিত কার্য সূচী সুপারিশ করে। এর ফলাফলেই তৈরি হয়েছিল রাজপুত, মাহার, জাঠ, আহির, শিখ রেজিমেন্টগুলো। এর উদ্দেশ্য হলো সৈনিকদের ধর্ম ও জাত ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলে ভেতরের একতা নষ্ট করা।

তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরুর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এর উদ্দেশ্য বদলেছে। আপাত দৃষ্টিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ মনে হলেও এর পেছনের ঘটনার পট পরিবর্তন হয়েছে। আলোচনার প্রথম দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি মনে হলেও কখনো ধর্মকে জোড় করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ অঞ্চলে দাঙ্গা হয়নি। প্রতিটি দাঙ্গার পেছনে রয়েছে আর্থ-সামাজিক কারণ। আর সবকিছুর মূলে রয়েছে ক্ষমতা গ্রহন। ক্ষমতা-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ধর্মকে বেছে নেয়া হয়েছে হাতিয়ার হিসেবে। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা শুরুর সময় থেকে প্রথম কয়েক দশকের দাঙ্গা ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক চালে লাগানো স্বার্থ হাসিলের জন্য। এরপর আসে আর্থিক সমৃদ্ধির জের হিসেবে দাঙ্গা। অভ্যন্তরিন প্রশাষনিক রাজনীতি। এ বিষয়ে ভারতের জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার রাজেশ্বরী তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

" There is a significant change in the pattern of communal riots since the 1990s, which could be noticed in the later part of this chronology. This brings forth the shifts that have occurred in the nature of communal riots in India. Moreover, the aim is to underline that religion in most of the cases is not the reason why communal riots occur. The reason for the occurrence of communal violence has been different in the two different phases. During the time of partition, it was the clash of political interests of the elite of two different communities which resulted in communal riots.4 But, from the 1960s till the late 1980s, the local political and economic factors played a very important role in instigating riots. The emergence of Hindutva politics in the last two decades has been a cause of communal riots in this phase where the local factors have also helped in instigating riots. Communal riots that took place from the 1960s to the 1980s follow a particular pattern. They have mostly occurred in urban towns which are either industrial belts or trading centers with the economy largely based on a particular occupation. Most of these places had a considerable percentage of Muslim population whose political or economic interests clashed with those of the ." (৭)

অর্থাত দাঙ্গার শ্রেণী বিন্যাস করে রাজেশ্বরী বলছেন স্বাধীনতা সমসাময়িক দাঙ্গাগুলো ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। স্বাধীনতার পরে সংঘটিত দাঙ্গাগুলোও এর জের ধরেই হয়। কিন্তু ১৯৬০ থেকে ৯০ দশকের সময় অনুষ্ঠিত অধিকাংশ দাঙ্গারই মুল কারন ছিল অর্থনীতি এবং স্থানীয় রাজনীতি।

বিংশ শতকে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি দাঙ্গা সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

উল্লেখযোগ্য দাঙ্গাগুলো হয়েছে ঃ

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দাঙ্গা ঃ ১৯২৪ ও ১৯৩৬ সালে ভারতে ভাগোলপুর বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালে ভারতে ডাইরেক্ট একশন ডে, ১৯৪৬ - ভারতে ভাগোলপুর বিদ্রোহ।
ব্রিটিশ শাষন অবসানের পরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঃ ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৬৩ সালে ভারত শাষিত কাশ্মির দাঙ্গা, ১৯৬৪ সালে কাশ্মিরের বিষয়টির পরপরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৭ সালে ভাগোলপুর বিদ্রোহ, ১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদ দাঙ্গা, ১৯৭৮ এ ভারতের হায়দ্রাবাদে রোমেজা বে রায়ট, ১৯৮৩ সালে ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৮৪ সালে ভারতের কানপুরে এন্টি শিখ দাঙ্গা,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪-ভারতের অমৃতসরে অপারেশন ব্লু স্টার, ১৯৮৬-আগষ্ট পাকিস্তান পলিটিক্যাল দাঙ্গা, ১৯৮৯- ভাগোলপুর রায়ট। ১৯৯২-বম্বে রায়ট (বাবরি মসজিদ, অযোধ্যা), ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা।
তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন সবসময়যে শুধু দাঙ্গাই ঘটেছে তা নয়, হয়েছে নিরব সন্ত্রাস, একদেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির ভয়ে পালিয়ে গেছে আরেক দেশে। এদেশের অনেক হিন্দু যেমন আশ্রয় নিয়েছে ভারতে তেমনি ভারতের অনেক মুসলমান জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে। এই সন্ত্রাস বা নিরবে পলায়নের কোন সন তারিখ নেই। ইতিহাসে বা আদমশুমারীতে তার রেকর্ডও নেই যথাযথ। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কতজন শরনার্থী হয়ে ভারতে গিয়েছে। কতজন নিহত হয়েছে বা সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আর্থিক ক্ষতিয়ান এর কোন রেকর্ড নেই।

১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এক দশকেরও বেশি সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়টি অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু ১৯64 সাল থেকে আবার শুরু হয় অসাম্প্রদায়িকতা।
ভারতে ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের দ্বারা সঙ্কলিত তথ্য উদ্ধৃত করে উড়িষার ভূতপূর্ব ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এস.কে.ঘোষ ১৯৬৮ থেকে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত দাঙ্গা সমূহ সম্বন্ধে যে তালিকাটা রচনা করেছেন তার থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

৮

সাল	ঘটনার সংখ্যা	মোট মৃত	মোট আহত
১৯৬৮	৩৪৬	১৩৩	১৫৪৯
১৯৬৯	৫১৯	৬৭৪	২৮৭৭
১৯৭০	৫২১	২৯৮	১৭২৩
১৯৭১	৩২১	১০৩	১৩৩০
১৯৭২	২৪০	৭০	১২০৭
১৯৭৩	২৪২	৭২	১৫০০
১৯৭৪	২৪৮	৮৭	১২৬৬
১৯৭৫	২০৫	৩৩	৯৬২
১৯৭৬	১৬৯	৩৯	৭৯৪
১৯৭৭	১৮৮	৩৬	১১২২
১৯৭৮	২১৯	১০৮	১৮০১
১৯৭৯	৩০৪	২৬১	অপ্রাপ্ত
১৯৮০	৪২৭	৩৭৫	অপ্রাপ্ত
১৯৮১	৩১৯	১৯৬	অপ্রাপ্ত
১৯৮২	৪৭৪	২৩৬	অপ্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে প্রধান প্রধান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে রাজ্যভিত্তিক মৃত্যুর সংখ্যা।

৯

স্থান	সাল ১৯৮৭	সাল ১৯৮৮	সাল ১৯৮৯
বিহার	-	-	৪৯১ (৫)
গুজরাত	৩১	-	৪
জম্মু ও কাশ্মীর	-	-	১৩
কর্ণাটক	-	৬	-
মধ্যপ্রদেশ	-	-	২৮
মহারাষ্ট্র	-	২৩	১
রাজস্থান	-	-	৩৩
উত্তরপ্রদেশ	২৮৯	৩৭	৩৭
পশ্চিমবঙ্গ	-	১৪	-
দিল্লী	১১	-	-
মোট	৩৩১	৮০	৬০৭

নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দাঙ্গার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

১৯৪৬ ডাইরেক্ট একশন ডে

৪৬ এর দাঙ্গার পেছনে যে রাজনৈতিক জটিলতা সেটি দীর্ঘদিনের বলতে গেলে বঙ্গভঙ্গ থেকেই এর সূচনা। তখন থেকেই প্রমান হয় যে এ অঞ্চলের মানুষ দেশ স্বাধীনের জন্য ব্রিটিশ বিরোধীতায় এক হতে পারে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের মত। এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সরকার অসংখ্যভাবে দেশভাগ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে সব আশাই যখন ব্যর্থ হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের পাঠানো ক্যাবিনেট মিশন নতুন করে আশা দেখলো ব্যবধান তৈরির। অনেক দর কষাকষির পর ১৯৪৬ সালে ১৬ই মে ঘোষিত ক,খ ও গ এই তিন প্রদেশ সম্বলিত এক অখন্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা যখন পাকিস্তান দাবি ত্যাগ করে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস মেনে নিয়েছিল তখন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর এক বিবৃতি ব্রিটিশদের কূটনৈতিক চালকে সফল করার পথে নিয়ে চললো। এখানে উল্লেখ করা দরকার ঘোষিত তিনটি প্রদেশের সীমানা। ক- মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা। খ- উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু। গ- বঙ্গদেশ ও আসাম। এই যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বটি দুই দলই দ্বিজাতীতত্ত্বের আংশিক ভিত্তিতে মেনে নিয়েছিল কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা দেন

Dhaka University Institutional Repository

" কংগ্রেস 'বোঝাপড়ার কোনোরকম বাঁধন না মেনে এবং সব সময় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহনের স্বাধীন মনোভাব নিয়ে' গণপরিষদে প্রবেশ করবে।' এরপর সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিল এর অর্থকি এই নয় যে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার হেরফের করা যাবে? জওহরলাল নেহেরু জবাব দিয়েছিলেন 'কংগ্রেস কেবল গণপরিষদে যোগ দিতে রাজি হয়েছে এবং নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পরিবর্তন বা রদবদল করার স্বাধীনতা তার রয়েছে।" (১০) এই বক্তব্যকে শুধু মুসলীম লীগের সদস্য ও জিন্নাহই নন এমনকি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আজাদও ভ্রান্ত ও আকস্মিক বলে মনে করেছিলেন। আক্ষেপ করে তিনি উল্লেখ করেছিলেন "আমাকে একথা লিপিবদ্ধ করতেই হবে যে জওহরলালের বক্তব্য ভ্রান্ত ছিল। একথা সত্য নয় যে কংগ্রেসের নিজ ইচ্ছানুসারে পরিকল্পনার পরিবর্তন করার স্বাধীনতা ছিল। আমরা প্রত্যুত ঃ এ কথা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেল ধরনের হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বাধ্যতামুলকভাবে তিনটি বিষয় থাকবে এবং অন্যান্য বিষয় প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবে"(১১) খুব স্বাভাবিকভাবেই জিন্নাহর কাছে নেহেরুর ভাষণ একপ্রকার হঠকারি ও বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল। সাথে সাথে তিনি পাল্টা ভাষণ দিয়ে বলেন "কংগ্রেস সভাপতি নেহেরুর ওই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন। কারণ দলকে এ আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, কংগ্রেসও ঐ পরিকল্পনা মেনে নিয়েছে এবং এটাই ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি হবে। এখন কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে ঐ পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনবে। এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের কৃপার পাত্রে পরিণত হবে" (১২)। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন গোটা ভারতে বিশেষ কিছু অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সমগ্রভাবে মুসলমানরা ভারতে সংখ্যালঘু। নেহেরুর এই দুর্ভাগ্যজনক উক্তির পর ২৭ জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল বোম্বেতে বৈঠকে মিলিত হয়ে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঐ একই বৈঠকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর পথ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়।

"In July 1946, Jinnah held a press conference at his home in Bombay where he declared his intent to create Pakistan. Jinnah proclaimed that the Muslim league was "preparing to launch a struggle" and that they "have chalked a plan".[5] He had decided to boycott the Constituent Assembly. He rejected the British plan for transfer of power to an interim government which would combine both the Muslim League and the Indian National Congress. He said that if the Muslims were not granted Pakistan then he would launch "Direct Action".[5] When asked to specify Jinnah retorted: "Go to the Congress and ask them their plans. When they take you into their confidence I will take you into mine. Why do you expect me alone to sit with folded hands? I also am going to make trouble."[5] On the next day, Jinnah announced August 16, 1946 would be "Direct Action Day" for the purpose of winning the

Dhaka University Institutional Repository

separate Muslim state. [5] Muslim League Council Meeting held during the period 27–29 July 1946 passed a resolution declaring, the Direct Action Day was intended to unfold "direct action for the achievement of Pakistan." (১৩)

তবে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। জিন্নাহ সংগ্রামের ডাক না দিয়ে আলোচনায় যেতে পারতেন। ওদিকে জওহরলাল নেহেরুকে তার দলের পক্ষ থেকেই তার এই আকস্মিক বক্তব্যকে প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তিনি রাজী না হলে অনুরোধ করা হয় যে, যেন বলা হয় এটি তার ব্যক্তিগত অভিপ্রায়-এর কথা বলেছেন। সেদিন জওহরলাল নেহেরু জবাব দিয়েছিলেন এতে করে তার ব্যক্তিত্ব থাকবেনা। কি আশ্চর্য সব মহান নেতা। ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য দেশভাগ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ব্যক্তিত্ব খোয়ানো যাবেনা ! যাই হোক ১৬ ই আগষ্ট থেকে দাঙ্গা মুলত শুরু হয়। চলে সপ্তাহব্যাপী তবে শুরুর দিন থেকে একে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমেই দাঙ্গায় ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া যাক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসেব মতে, দাঙ্গায় নিহত হয়েছে ৪ হাজার মানুষ আর আহত ১ লাখ তবে বেসরকারী হিসেবে মৃতের সংখ্যা ৭ থেকে ১০ হাজার। তবে এর বেশিরভাগ হিন্দু না মুসলমান তা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয় এবং মুসলমানদের মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যক স্থানান্তরিত করা হয়। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। ঘটেছে হাজার হাজার মহিলা শিশুর সম্ভ্রম হানি। তবে প্রাণহারানোর সাথে সাথে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন সেটি হলো বলা বাহুল্য চার দিনের এই প্রাথমিক মরণযজ্ঞে হিন্দু আর মুসলমান যে একসাথে থাকতে পারেনা এবং দেশ বিভাগ অপরিহার্য তা যেন অমোঘ করে তোলে।

এর শুরুটা হয়েছিল মুসলীম লীগের ডাকে আর কংগ্রেস সমর্থকদের তখন একে দেখে নেয়ার একটি মনোভাব ছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে ওই দিন হাসপাতাল,ওষুধের দোকান ছাড়া আর সব কিছু বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছিল মুসলিম লীগ। সে সময়ে বাংলার চীফ সেক্রেটারী ছিলেন R.L. Walker. মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন পাবলিক হলিডে ঘোষণা করার জন্য। সরকারও হরতালে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির আশংকায় এ ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটি সম্পূর্ন তাদের মতামতের বিপক্ষে বলে ঘোষণা দেয়। সরকার ওই দিন পাবলিক হলিডে ঘোষণা করলে তা মুসলীম লীগকে সমর্থন করা হবে বলে জানায় কংগ্রেস। এ অবস্থায় কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ১৪ই আগষ্ট এক জনসভা করে হিন্দু নেতা-কর্মি এবং ব্যবসায়িদের নির্দেশ দেন যে কোনভাবেই হোক ওই দিন তাদের স্বাভাবিক কাজ কর্ম চালিয়ে যাবার জন্য দোকান পাট খোলা রাখতে হবে। কংগ্রেস সেদিন গোয়ার্তুমি করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে একপ্রকার সাম্প্রদায়িক বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল।

দাঙ্গার দিনে লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার-এ প্রথম অরাজকতার খবরটি আসে সকাল ১০ টার আগেই। শহরের বিভিন্নস্থানে জোড়পূর্বক দোকান পাট বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, ইটপাটকেল ছোড়া এমনকি কয়েকজনকে ছুড়িকাহতও করা হয়েছে। রাজাবাজার, কলেজ স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড,

Dhaka University Institutional Repository

কলুটোলা এসব যায়গা থেকে সংঘর্ষের খবর আসতে থাকে। ১২ টার সময় মুসলীম লীগ তাদের দলের সবচেয়ে বড় মিছিলটি বের করে। সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স অফিসারের তথ্য অনুযায়ী ৩০ হাজার, কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চ ইন্সপেক্টরের তথ্য অনুযায়ী ৫ লাখ এবং স্থানীয় পত্রিকা স্টার অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী সেদিন ১ লাখ লোক জমায়েত হয়েছিল মিছিলে। দুপুর ২ টার মধ্যে কলকাতার বিভিন্নস্থান থেকে দলের নেতা কর্মীরা এসে জমায়েত হতে শুরু করে, জুম্মার নামাযের পরই জনসভার প্রস্তুতি চলতে থাকে। তবে এ মিছিলে অধিকাংশ নেতা-কর্মিরা সেদিন অস্ত্রসহ অংশ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সভায় মুল বক্তব্য রাখেন প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। খাজা নাজিমুদ্দিন তার বক্তব্যে এই সংগ্রাম শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে পালন করার নির্দেশ দেন তবে সকালে এক মুসলিম যুবকের নিহত হওয়ার খবর উল্লেখ করে বলেছিলেন মুসলমানদের তাদের নিজেদের জীবন-মালের নিরাপত্তা নিজেদের নিশ্চিত করতে হবে। এইযে প্রত্যক্ষভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল এ থেকেই স্পষ্ট যে আসলে এটি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধীতা কিছু নয় এটা ছিল কংগ্রেস বিরোধীতার জন্য মুসলীম লীগের তাদের নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়া। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে জিন্নাহ সরকারী খেতাব বর্জন ছাড়া তেমন কোন ঘোষণাও দেননি যা থেকে মনে হতে পারে যে এটি সরকার বিরোধীতার জন্য আহ্বান করা সংগ্রাম।
বিকেলে ময়দানে দেয়া মুসলীম লীগ নেতাকর্মীদের প্ররোচনামুলক ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয় জিন্নাহর লড়কে লেঙ্গে মার্কা মনোভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই এ ঘটনা ঘটার ফলে তখন অস্ত্রও অনেকটা সহজলভ্য ছিল। ভারত উপমহাদেশের দাঙ্গায় সেই প্রথম আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

" The main speakers were Khawaja Nazimuddin and Chief Minister Suhrawardy. Nazimuddin in his speech preached peacefulness and restraint but rather spoilt the effect by asserting that till 11 o'clock that morning all the injured persons were Muslims, and the Muslim community had only retaliated in self-defence.[1] "(১৪)

এরপরই কংগ্রেসের কিছু কট্টরপন্থী নেতা মুসলমানদের উপর এদিকে লীগের কট্টোর মনোভাবের নেতারা আবার হিন্দুদের বাড়িতে- দোকান পাটে আক্রমন শুরু করে। চারদিনের এ দাঙ্গার বর্ণনা দিতে হলে আসলে স্থানসংকুলান হবেনা। তবে এটুকু অবশ্যই উল্লেখ করা জরুরী যে কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে এর আগে পরে বিভিন্নস্থানে দাঙ্গা ছড়িয়েছে। ১২ই মার্চ কাণপুরে এবং পহেলা জুলাই থেকে শুরু করে আহমেদাবাদে গুরুতর দাঙ্গায় ৫৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে ২ জনের প্রাণ হানি হয়। লখনউ, কানপুর ও বেরিলিতে দাঙ্গাসম অবস্থার সৃষ্টি ছাড়াও ২৩ আগষ্ট এলাহাবাদেও দাঙ্গায় ৪ জন মৃত ও ৪৩ জন আহত হয়। লীগ দ্বারা কালো দিবস রুপে উদযাপিত দোসরা সেপ্টেম্বরের একদিন আগে থেকে শুরু করে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বোম্বেতে যে দাঙ্গা হয় তাতে মোট মৃতের সংখ্যা ২৪২। ৯ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা মানে বর্তমান কুমিল্লায় হিন্দুদের উপর ব্যাপক আক্রমন চালানো হয়। ১০ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৫

Dhaka University Institutional Repository

দিন ধরে চলে নোয়াখালীতে সংখ্যালগুদের উপর আক্রমন। হত্যা, লুঠ,অগ্নিসংযোগ। প্রায় ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এ আক্রমন। সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও ওই সময়ের দাঙ্গায় অন্তত ৫০ হাজার সংখ্যালঘু নোয়াখালীতে এ দাঙ্গার বিরুপ প্রভাবে পড়েছে বলে জানা যায়। "১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা কেবল কলকাতার জন্যই নয় বরং সমগ্র ভারতের জন্যেই ছিল এক কালো দিবস- মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।"(১৫)

"১৯৪৬ সালের মধ্য-আগষ্টে কলকাতর যে দাঙ্গার সূত্রপাত, রক্তঝরা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ও হানাহানির চক্র যেন চালু করে দিয়েছিল। ১০ অক্টোবর দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো দূর নোয়াখালীর গ্রামে, আগুনে ঝলসে যায় কয়েক হাজার গৃহ, লুণ্ঠিত হয় সম্পদ, অত্যাচারিত হয় নারীরা, বলপূর্বক ধর্মান্তরণের ঘটনার অবতারণা হয় এবং নিহত হয়, সরকারি হিসেবে, ২৮৫ জন।"(১৬)

৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারতের আসাম, পাঞ্জাব, কাশ্মিরে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার জন্য আমরা ওই বিদেশি শক্তির কোন নীতিকেই দায়ি করতে পারিনা। যে ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন ধর্ম মোহ। যে ধর্ম বৃহত্তর মিলনের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে নিয়ে যায় সেই ধর্মই শ্রদ্ধেয়। "ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো।" এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আহ্বান। দাঙ্গার ইতিহাস থেকে যারা শুধু দাঙ্গা বাধাবার মন্ত্র গ্রহন করেন ইতিহাসে তারা ঘৃনিত। ক্ষোভ - ক্রোধ ও লোভই সব বিরোধ বিবাদের উৎস। দাঙ্গার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে দাঙ্গার উত্তেজনা প্ররোচনা দাতা সর্বদাই হচ্ছে ধন-মান ক্ষমতালিপ্সু স্থানীয় গন্যমান্য উচ্চাকাংখি বিবেকহীন জনপ্রতিনিধিরা। এরা নিজেদের মতলব হাসিলের জন্যই নিস্ব দুস্থ দরিদ্র অসহায় মানুষদের হত্যায় লুণ্ঠনে দহনে প্ররোচনা দেয়।

১৯৫০ পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মূল ঘটনাটা খুলনা বিভাগের বাগেরহাটের কালশিরা নামক গ্রামে। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের ২০। কমিউনিস্ট পার্টির কয়েক নেতা-কর্মিকে আটক করতে ঐ গ্রামে তল্লাশী চালিয়েছিল পাকিস্তান পুলিশ। কালশিরা গ্রামটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। সেদিন তল্লাশী চালানোর সময় একটি হিন্দু বাড়িতে ভাংচুর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং ওই বাড়ির হিন্দু নারীকে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেছে তাদের পরিবার। শুরুতে বিষয়টি হিন্দু-মুসলমান নয় ছিল কমিউনিস্ট নেতাদের খোঁজে পুলিশের হিন্দু বাড়িতে অনৈতিক আচরণ। তবে পুলিশের এই লুটতরাজের সময় আনসার ও কয়েকজন মুসলমান উচ্ছৃংখল যুবক সেখানে উপস্থিত ছিল। এর দুদিন পরই পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা হয় এবং এ ঘটনায় এক পুলিশ নিহত ও অপর দুজন পুলিশ গুরুতর আহত হয়। ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয় ৯ জনকে। ঘটনার সূত্রপাত এখান থেকে।

এরপরই শুরু হয় সংঘর্ষ এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন যার অধিকাংশই ছিল হত্যার ঘটনা। কালশিরার কাছাকাছি অন্যান্য গ্রামে সাথে সাথে ছড়িয়ে পরে দাঙ্গা। কয়েকদিনের মধ্যেই পুরো খুলনা অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে মুসলমান উচ্ছৃংখল নেতারা। শুরু হয় সঙখ্যালঘু নিধন

Dhaka University Institutional Repository

যজ্ঞ যার অধিকাংশই হিন্দু। এরপর শুরু হয় ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর অত্যাচার।

শুরু হয় হিন্দু বাড়িতে আক্রমন চালিয়ে লুটতরাজ, হত্যা অগ্নি সংযোগ, নারীদের সম্ভ্রমহানি ও জোড় করে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া। অনেকেই মনে করেন দ্বিজাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলেই বাংলাদেশ অর্থাত তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ১৯৫০ এ ভয়াবহ হামলা হয়েছিল।

“ The State policy of Pakistan (of which East Pakistan now Bangladesh was originally a part of it) had all along been anti-Hindu because of the very nature of its birth in August 1947. In this connection, it bears recalling here that in the wake of a communal carnage in former East Pakistan in February/March, 1950, Pandit Nehru in his letter dated March 11, 1950 to Shri Liaquat Ali Khan (then Prime Minister of Pakistan) interalia said:

"...The root of this evil was the intense communal policy which led to Pakistan and which Pakistan has followed since. There is enough of communalism' in India also today. But, at any rate, it is not the policy we pursue and we combat it. In Pakistan it is the state Policy and this nurtures the feeling of hatred, violence and religious bigotry... This conversion of the State into a citadel of communalism inevitably leads to far-reaching evil consequences. It makes the lives of all those in that State who do not accept the predominant religion, unhappy and insecure." (১৭)

সোজা সরল দৃষ্টিতে বা এক কথায় বলতে গেলে কারণ এটি হলেও এর সাথে আরো অনেক বিষয় রয়েছে। অনেকগুলো কারণে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে এ দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ১৯৫০ এর দাঙ্গায় নিহত হয়েছে কয়েক হাজার হিন্দু। ৩৫ লাখেরও বেশি হিন্দু শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে।

“ Because Pakistan was Meant for Muslims,thus Minorities (mainly Hindus) had to leave this country.They decided to leave for India.”(১৮)

ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে খুলনায় দাঙ্গা শুরু হলে দ্বিতীয় সপ্তাহে তা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুযারী পর্যন্ত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাজধানীতে কারফিউ জারী করা হয়। এসময় লাখ লাখ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এরই মধ্যে ভারতে শুরু হয় মুসলমান নিধন নৃশংসতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ৬ ও ১৬ই মার্চ কলকাতায় শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যান। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের লিয়াকত আলীকে নৃশংসতা বন্ধের জন্য আবেদন জানান। প্রাথমিকভাবে লিয়াকত আলী এর কোন সদুত্তর দেননি। কিন্তু ২৬ তারিখ থেকে কলকাতায় শিল্প নগরী হিসেবে পরিচিত হওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভয়াবহ রুপ নিলে শুরু হয় সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের ওপর নৃশংসতা। ২৯ মার্চ লিয়াকত আলী প্রথম করাচী থেকে এ বিষয়ে মিমাংসার জন্য অফিশিয়ালী ভাষণ দেন।

১৯৫০ এর দাঙ্গার ঘটনাটি কালশিরা জেলার ওই বিষয়কে কেন্দ্র করে হলেও এর বীজ বপন হয়েছিল দেশভাগ হবার পর থেকেই। দ্বিজাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাকিস্তান ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভারত ভাগ হবার পর থেকে ভারতের হিন্দুরা ভাবতেন তাদের মাটিতে যেমন মুসলমানদের অধিকার নেই তেমনি এদেশের মুসলমানরা মনে করতেন এখানে হিন্দুদের অধিকার নেই। পূর্ব পাকিস্তান হবার সাথে সাথে একশ্রেণীর মুসলমানদের তাদের অধিকার বোধ আবার তীব্র হয়ে উঠে। ভারতে মুসলমানদের ওপর কোন ধরনের নির্যাতন হলেই তার জেড় এখানকার মুসলমানরা হিন্দুদের উপর মেটানোর চেষ্টা করতো ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে সদ্য ভাগ হয়ে নতুন পরিচয় পাওয়া একটি দেশে প্রকাশিত সংবাদপত্রের তালিকা দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হবে। এ তিন বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সবই ছিল বলতে গেলে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত। পত্রিকার নামের মধ্যেই তা প্রকাশ পায়। প্রথম অধ্যায়ে আমি সমসাময়িক পত্রিকাগুলোর নাম উল্লেখ করেছি। ১৯৫০ এর দাঙ্গার শুরুতে পাকিস্তান শাষকরা যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিশোধ স্পৃহা বাড়িয়ে দিত তারও যথেষ্ট প্রমান রয়েছে। কলকাতা আর পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় একই সময় দাঙ্গা শুরু হয় । কলকাতায় মুসলমানদের ওপর ভারতীয় হিন্দুদের হামলার খবর শুনে ৬ এবং ৭ ফেব্রুয়ারী রেডিও পাকিস্তানে প্রচার করা হয়। " Brethern! You Have heard about the inhuman atrocities that are now being perpetrated on hour brother Muslims in India and West Bengal!! Will You not gather strength?" (১৯)

এর পরপরই ভারতে নিহত মুসলমানের সংখ্যা বলা হয় ১০ হাজার। আঞ্চলিক একটি পত্রিকা তখন এ সংখ্যা বাড়িয়ে বলে ১ লাখ। তবে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির সময় পাকিস্তান রেডিও এই সংখ্যা সংশোধন করে জানায় ২২০।

এবার দাঙ্গার আগের ঘটনায় আসি। দেশভাগের পর এ দেশের জনসংখ্যা ছিল ৪২ মিলিয়ন অর্থাত ৪ কোটি ২ লাখের মত। এর মধ্যে ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ সংখ্যালঘু। এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে ৯৮ শতাংশই ছিল হিন্দু বাকি ২ শতাংশ বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের। সে সময় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কয়লা ও পাট আমদানি রপ্তানী হতো। পাকিস্তান থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ভারতে রপ্তানী ও ভারত থেকে কয়লা আমদানী করতো পাকিস্তান। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ অর্থবছরে দুদেশই সমানভাবে লাভবান হয়েছে এখাত থেকে। তবে ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিং এর মান যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় হ্রাস পেলে সংকট শুরু হয়। এর প্রভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতের রুপির মানও কমে যায়। সেই সময়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে রপ্তানীর জন্য কয়েক ট্রাক পাটজাত পণ্য বন্দরে অপেক্ষায়। ভারত তার রুপীর মান কমে যাওয়ায় পাকিস্তান থেকে পাঠানো পাট জাত দ্রব্যের পরিশোধিত দাম নিয়ে কথা তুললে পাকিস্তান বন্দরে অপেক্ষারত ৫০ হাজার গাট পাট ফেরত নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এখান থেকে শুরু হয় দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কোন্দল যার প্রভাব পড়ে এদেশে বসবাসরত হিন্দুদের ওপর। ১৯৪৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর দু'দেশের এই আমদানি-রপ্তানী চুক্তি পুরো বাতিল ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এর পরপরই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের পাশ দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত পানির প্রবাহ সুবিধা ভোগের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যায় এবং শুরু হয় কূটনৈতিক সংকট। এসব কিছুর জের হিসেবে সংঘটিত হয় ১৯৫০ এর দাঙ্গা।

১৯৬৪ পূর্ব পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

পাকিস্তানি স্বৈরশাষকদের একটি মনোবৃত্তির পরিচয় আগেই পাওয়া গিয়েছিল। জনগন যদি কোন দাবি-দাওয়ার দিকে আগাতে থাকে যা সরকারের স্বার্থ পরিপন্থী তাহলে পরিস্থিতিকে অন্য দিকে প্রবাহিত করার জন্য তারা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে আর সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেয়ে আর ভালো কিছু হয়না। পূর্ব পাকিস্তানিদের বিভিন্ন দাবি ও তা আদায়ের জন্য আন্দোলনত চলেই আসছিল মুক্তিযুদ্ধের কয়েকবছর আগে থেকে যা পশ্চিম পাকিস্তানি শাষকদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। এর মধ্যে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পাকিস্তানিদের শোক বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানিদের গভীর শোক তাদের আরো দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। একই সাথে সোহরাওয়ার্দীর পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে মুক্তির জন্য যে মনোভাব ছিল তার মৃত্যুতে সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে। এসব কিছু মিলিয়ে শাষকরা সুযোগ খুঁজছিলেন একটি অরাজকতা তৈরীর জন্য। পেয়েও গেলেন এবং পুরোপুরি তাকে কাজে লাগালো আইয়ুব সরকার। ভারত শাষিত কাশ্মীরে হযরত বাল মসজিদ থেকে চুরি হলো মহানবী (সাঃ) এর সংরক্ষিত পবিত্র চুল। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারির ৩ তারিখে পাকিস্তান মুসলিম লীগ আহ্বান করলো 'কাশ্মির দিবস' আর এখান থেকে শুরু হলো সংঘর্ষ।

" The clashes erupted in January 1964 after the disappearance of a precious relic from a mosque in Srinagar, which was the capital of the Indian-held area of the disputed state of Jammu and Kashmir at the time. As a result anti-Hindu riots broke out in east Pakistan and 29 people were killed. This sparked retaliation against Muslims in rural areas of West Bengal and from there the riots spread. The rioting was eventually quelled later that month but it erupted again in March when around 100 Muslim mill workers were attacked and 21 killed. "(২০)

তবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সেদিন ইতিহাসে অসাম্প্রদায়িকতার মাইল ফলক তৈরী করেছিল। ৬৪র দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হয়নি। হয়েছে বিহারী শ্রমিকদের দিয়ে এদেশের সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমন। এখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে নিসন্দেহে হিন্দুরা তবে যেসব মুসলমান তাদের রক্ষা করতে নিজের প্রানের ঝুকি নিয়ে গেছে তারাও রেহাই পায়নি। অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে। মোনায়েম খান সরকার তখন আদমজী জুট মিলের বহিরাগত বিহারী শ্রমিকদের টাকা দিয়ে এই হামলা চালানোর মদদ দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সাংবাদিক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রপাত হয়েছে খুলনা থেকে। খুলনা মিলেরই বিহারী শ্রমিকরা স্থানীয় হিন্দুদের উপর আক্রমন শুরু করে এসময় খুলনার স্থানীয় মুসলমান নেতারা অবশ্য তাতে মদদই দিয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে যশোর, ময়মনসিংহ, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ততকালীন সময়ে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাষক ছিলেন মিস্টার কিউ জি আহাদ। তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ র ৩০ মে পর্যন্ত এখানে দায়িত্ব পালন করেন। কিউ জি আহাদ সেদিন বিহারীদের বলেছিলেন, তোমাদের একদিন সময় দিলাম। এই একদিনে যত পার হিন্দু নিধন করো, এরপরই আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনবো। সে সময়ে হিন্দুদের রক্ষার জন্য বিহারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া সাইদুল ইসলাম জানিয়েছেন জেলা প্রশাসকের এই উদ্ধত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কথা।

একসপ্তাহের দাঙ্গায় ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও সাভারে নিহত হয় অন্তত ১০ হাজার হিন্দু। এসময় পাকিস্তান রেডিওতে বারবার ঘোষণা আসে হযরতবাল মসজিদ থেকে চুরি হওয়া কেশ সত্যিকার পবিত্র কেশ নয়। তবুও দাঙ্গা থামেনি কারন আক্রমনকারিরা আসলে মুসলমান ছিলনা ছিল সরকারের লেলিয়ে দেয়া বিহারী।

"An official-backed news item on the issue of the theft of the Prophet's holy hair from the Hazratbal shrine in Kashmir was in the media. I still recall the voice of Radio Pakistan's newscaster Sarkar Kabiruddin stating "This hair is not that holy hair, this is a false, artificial hair." About ten thousand Hindu died in Narayangonj and Dhaka."(২১)

দাঙ্গার ফলে প্রথম যে অরাজকতা তৈরী হয় সেটি মানুষের বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা। একই সাথে ভারত থেকে হাজার হাজার মানুষ শরনার্থী হয়ে যশোরসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করছে আবার দীর্ঘদিন ধরে এদেশে বসবাসকারি স্থায়ী হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাবে পালিয়ে যাওয়া শুরু করে ভারতে। সরকার যেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দাবি দাওয়া থেকে দৃষ্টি আকর্ষন করানোর জন্য এমন একটি অরাজক পরিস্থিতিই খুজঁছিল। সে সময়ে গুটি কয়েক সংবাদপত্র ছাড়া সবই ছিল সরকারের অনুগত। তারা স্বাভাবিকভাবেই সরকারের গুনগান ছাপে। এদেশে হিন্দুদের উপর যে আক্রমন, হামলা হয়েছে তার সংখ্যা কমিয়ে বলে ভারতে মুসলমানদের উপর হিন্দুরা যে হামলা চালিয়েছে তার সংখ্যাধিক্য করে প্রচার করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা রেখেছিল দৈনিক ইত্তেফাক। যার মাশুলও ইত্তেফাককে ভালোভাবেই গুনতে হয়েছে। স্বৈরশাষকের বিভিন্ন অর্ডিন্যান্সের কবলে ফেলে ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করেছে অসংখ্যবার।

" Two small news items and a comment in the Dacca papers were revealing. The Ittefaq reported that at least 95% homes of the minority community in Dacca and Narayangonj had been affected in 3 days-14 to 16 January, 1964."(২২)

Dhaka University Institutional Repository

The Pakistan Observer reported that attacks were made on a girls' school, hostels, and passengers on trains and buses, and that evacuees from Narayangonj alone who took shelter in two mills totaled 240,00.

তবে পাকিস্তান অবজার্ভার এই খবর প্রকাশ করলেও বেসরকারি সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা ১৫০,০০০। দৈনিক আজাদ পত্রিকার ভূমিকাও এসময় ছিল সমালোচনামূলক। প্রথম দিকে পুরোপুরি সরকারের পক্ষ হয়েই কথা বলেছে এমনকি খুলনায় নিহত ও ধ্বংসযজ্ঞের একটি সংবাদ ভারতের পত্রিকায় প্রকাশ করা হলে তা মিথ্যে ও ভিত্তিহীন বলেও সংবাদ প্রকাশ করেছে দৈনিক আজাদ।

" Unofficial estimates of the evacuees in Dacca put the number at about 150,000. Mr. Ataur Rahman Khan , ex-chief minister of East Pakistan and former prime minister of Bangladesh, in his book " Swoiracharer Dosh Bachhar,-Ten Years of Despotic Rule" gave a pen-picture of the riots."(২৩)

১৯৬৪র দাঙ্গা অনেক কারণেই ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। যে সময় গোটা জাতি স্বৈরশাষণ থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন দেশের জন্য লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে সময়ে এক সম্প্রদায়ের আরেক সম্প্রদায়ের জন্য এমন সমানুভূতির উদাহরণ পৃথিবীর অন্য জাতির ইতিহাসে চোখে পড়েনি। একই সাথে আরেকটি বিষয় দেখতে হবে ভারতে যখন মুসলমানদের উপর হিন্দুরা চরাও হয়েছে এ দেশে তখন মুসলমানরা বরং বিহারী সন্ত্রাসীদের আক্রমন থেকে হিন্দুদের বাচাঁতে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। সেদিনের বিপদে হিন্দু-মুসলমান এক হয়েছিল। ছিলনা কোন সম্প্রদায়গত বিভেদ। আর এর ৭ বছর পর স্বাধীনতার জন্য হিন্দু-মুসলমানের এক কাতারে দাড়িয়ে পাকিস্তানী শাষকদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার যে সাহস, ঐক্যবদ্ধতা তা হয়তো তৈরী হয়েছিল ৬৪ র দাঙ্গাতেই।

" Kamruddin Ahmed writes: "When it was affecting even Dacca, a committee was formed to resist the communal riot in the name of "Danga Pratirodh Committee" and a leaflet was issued under the title "Purba Pakistan Rukhia Darao" (p. -157) . It was learnt later that in Dacca, the Bengali Muslims under the political leadership of Sheikh Mujibur Rahman, Ataur Rahman and others from National Awami Party, students, journalists of East Pakistan Journalists Union and intellectuals brought out a procession. Tofazzal Hossain Manik Mia, the Ittefaq editor, Zahur Hossain Chowdhury, the Sangbad editor and Abdus Salam, The Pakistan observer editor, were at the head of the journalists' procession. The Ittefaq came out with a call urging the Bengalis to rise up and put up resistance. In bold headlines

Dhaka University Institutional Repository

on the front page, the paper said: " Sangrami Bangali Rukhiya Daraon".(২৪)

এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যাওয়া মানুষের একটি তালিকা দেয়া হলো। এ থেকে ধারনা করা যায় ১৯৪৬ থেকে মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত কতজন দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছে।

"১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বাঙালিত্ব বোধ, সচেতন নাগরিক সমাজের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের বিরোধ জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সম্ভাবনা নিয়ে জেগে ওঠে। একই সঙ্গে সোচ্চার হতে থাকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট ক্ষোভ। সর্বোপরি ছিল রাজনৈতিক অধিকারহীনতা মোচনের তাগিদ। শাসকচক্র এর বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রদায়িক অস্ত্র ব্যবহারে কোন কসুর করেনি। ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা এর নির্মম প্রকাশ।"(২৫)

২৬.

Refugee Influx from East Pakistan, 1946-70

Year	Reason for Influx	Total
1946	Noakhali riots	19,000 19,000
1947	Partition	334,000
1948	Police action in Hyderabad	786,000
1949	Khulna, Barisal riots	213,000
1950	idem	1,575,000
1951	Agitation over Kashmir	187,000
1952	Economic conditions, passport scare	227,000

Dhaka University Institutional Repository

1953		76,000
1954		118,000
1955	Unrest over Urdu in E. Pakistan	240,000
1956	Pakistan's Islamic constitution	320,000
1957		11,000
1958		1,000
1959		10,000
1960		10,000
1961		11,000
1962		14,000
1963		16,000
1964	Hazrat Bal incident in Kashmir	693,000
1965		108,000
1966		8,000
1967		24,000
1968		12,000
1969		10,000
1970	Elections in Pakistan	250,000
Total		5,283,000

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ আহমেদাবাদ দাঙ্গা

ভারতে প্রথম যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার লিখিত বিবিরণ পাওয়া যায় তার সূচনা আহমেদাবাদ শহরে। এই শহরটি একটি দাঙ্গা প্রবন শহর। তবে আগে অসংখ্যবার দাঙ্গা হলেও ১৯৬৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে এখানে কয়েকদিন যে দাঙ্গা ঘটেছিল তা ইতিহাসে এক শোচনীয়তার স্বাক্ষর রাখে। ১৯৬০ সালের পর ভারতের অন্যান্য এলাকার মত গুজরাতের নানা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে থাকে আর তারই প্রভাব পরে আহমেদাবাদে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে ঐ রাজ্যে এবং বিশেষ করে পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলিতে বিমান ভেঙ্গে পড়ায় মুখ্যমন্ত্রী বলবন্ত রায় মেহতার অকাল মৃত্যুতে গুজরাতের হিন্দু জনমত আরো বেশি পাকিস্তান বিরোধী হয়ে পড়ে। হিন্দু জনতার একাংশ এখনও পাকিস্তান ও তাদের স্বদেশী মুসলমানদের অভিন্ন রুপে দেখতে অভ্যস্ত। যুদ্ধের সময় পরিকল্পিতভাবে প্রচারিত পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাব তাই শেষ অবধি হাতের কাছে উপলব্ধ মুসলমান বিরোধী রুপ নেয়। ওই অঞ্চলের মুসলমানদের এক শ্রেণীর হিন্দু আজ অবধি পাকিস্তানের গুপ্তচর বলে মনে করে। যুদ্ধের সময় একটি গুজব খুব প্রকট হয়ে উঠে আর তা হলো হিন্দুদের আক্রমন করার জন্য মসজিদে মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র জমা করেছে। আবার মুসলমানদের কাছে বেআইনি বেতারে সংবাদ- প্রেরক যন্ত্রে পাকিস্তানে ভারতের গোপন সামরিক তথ্য পাচারের ব্যবস্থা ধরা পড়েছে এমন তথ্যও বাতাসে উড়তে থাকে। এতে মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের যেমন সন্দেহ বাড়তে থাকে তেমনি অহেতুক নির্যাতন ও অসম্মানের ফলে মুসলমানরাও তিক্ত হয়ে উঠে। ঐ সময় গো হত্যাবিরোধী যে আন্দোলন চলছিল তাও হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। অনেক হিন্দু নেতা সম্প্রদায়ের মনোভাব আরো কঠিন করার জন্য বিভিন্ন সভায় প্রচার করতে থাকে সরকার বিরোধী মনোভাব। মুসলমানদের ভোট পাবার জন্য সরকার গোহত্যা সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ধ করছেনা বলেও প্রচারণা চালান এইসব নেতারা।

কিন্তু এ কথা সত্য যে গুজরাতে গো হত্যা বন্ধ করার আইন আগে থেকেই এখানে ছিল এবং মুসলমানরা এর বিরোধীতা করেনি। তবে ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় গুজরাতে মুসলমানরা ছিল কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কের মত কিন্তু কংগ্রেস মুসলমানদের পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি, এর উপর পাক-ভারত যুদ্ধের সময় নেতৃস্থানীয়দের নির্যাতন সহ্য করার ফলে এ অঞ্চলের মুসলমানরা ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে আর কংগ্রেসকে সে ভাবে সমর্থন যানায়নি। এতে কংগ্রেস সমর্থিত ৮ মুসলমানের মধ্যে বিজয়ী হয় মাত্র ৩ জন। অন্যান্য নির্বাচন কেন্দ্রেও মুসলমান ভোটের বড় অংশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাওয়ায় কংগ্রেসকে ক্ষমতা ঠিক রাখতে নানা দল ও উপদলের সাথে ধর্ম-জাতি-আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে সমঝোতা করতে হয়।

কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবে গুজরাতে হিন্দু-মুসলমান দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে নির্বাচনের পর হিন্দু- মুসলমান বিরোধ বেড়ে যায়। ১৯৬৮ সালের ২ জুন আহমেদাবাদে জমিয়ত-উল-উলেমা-এর আহ্বানে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের এক সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাবের সাথে মুসলমান সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারীদের শুক্রবারের নামাজে যোগ দেবার বিশেষ সুবিধা এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় কোন রকম পরিবর্তন না করার দাবি জানানো হয়। কংগ্রেসের কিছু হিন্দু নেতা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও, গুজরাতের জনপ্রিয় সংবাদপত্র সমূহ ও একাধিক বুদ্ধিজীবি দাবিগুলো সাম্প্রদায়িক ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার পরিণামে হিন্দু-মুসলমান মানষিকতায় তৈরি হয় বিস্তর ব্যবধান। এই দূরত্ব বাড়াতে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত রাজ্যের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের সমাবেশেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গুরু গোলওয়ালকর সেই সমাবেশে তার বক্তব্য প্রদান করলেন 'ভারতে একমাত্র হিন্দুরাই ধর্মনিরপেক্ষ কেননা তারাই অন্য ধর্মের কাছ থেকে নানাবিধ নিগ্রহ সহ্য করেছে। ঈশ্বর পেটলিকর নামে এক লেখক আর.এস.এস এর এই মতবাদের বিরুদ্ধে লিখলে তার বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে গুজরাতের পত্র-পত্রিকায় যে জোরালো আলোচনা হয় তাতে দেখা যায় রাজ্যের হিন্দুদের বিশাল একটি অংশ আর.এস.এস-এর বক্তব্যের সমর্থক। মুসলমানদের মজলিশ-ই-মুশওরত-এর সাম্প্রদায়িক মনোভাবত অপর পক্ষকে অসন্তুষ্ট করেছিলই তার ওপর গুজরাতের মুসলমানরা প্ররোচনামুলক আর একটি কাজ করলো। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে গুজরাতের সব শহরে মুসলমানদের বিশাল শোভাযাত্রা বের হয় আরবের আল-অকসা মসজিদ আক্রমনের বিরুদ্ধে। যদিও আরবের আল-অকসা মসজিদের আক্রমন ছিল খোদ মুসলমানদের ভেতরেরই অন্তর্গত দ্বন্দের ফলে এখানে অমুসলমানদের কোন হাত নেই। এ সময় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনকারিরা শ্লোগান দিয়েছিল ' যো ইসলামসে টকরায়েগা, দুনিয়াসে মিটযায়েগা', ' মুসলিম একতা জিন্দাবাদ'।

এই ধরনের শ্লোগান শুধু সাম্প্রদায়িক মনোভাব নয় হিন্দুদের আক্রমনের বিষয়েও আতংকিত করে তুলেছিল। একাধিক গুজরাতী পত্র-পত্রিকায় ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মুসলমানদের এই ধর্মান্ধতা নিয়ে সমালোচনা করে জনমত তাদের প্রতিকূল করে তুলল। এসময়ের পত্র-পত্রিকার সমালোচিত ভূমিকা আগের অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

যাই হোক আগুনে ঘি ঢালার মত জনসংঘ নেতা বলরাজ মাধ্যেক এসময় গুজরাতে একাধিক সভা আহ্বান করে মুসলমানদের হাজার হাজার দুরে এক মসজিদের ঘটনা নিয়ে আন্দোলন করাকে তীব্র নিন্দা জানালেন। তিনি আরও বললেন এদের মধ্যে কেউই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় হিন্দুদের দ্বারা মসজিদে আক্রমনের স্বীকার হননি। সাথে প্রশ্ন যোগ করে দিয়ে জানালেন 'মুসলমানরা কি মনে করে যে হিন্দুরা তাদের নিজেদের ধর্মস্থলের প্রতি অনুরাগী নয়? ' পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমনের পরবর্তি সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি জনগনকে সচেতন করে ক্রোধ আরো উসকে দিয়েছিলেন। হিন্দু জনমত এর ফলে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে মাধোকের এই সভার সাথে দ্বিমত পোষণ করায় গান্ধীপন্থী, বিখ্যাত সাহিত্যিক গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উমাশঙ্কর যোশীকে শ্রোতারা একরকম অপমান করে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

এ বছরের মার্চে এক হিন্দু পুলিশ অফিসারের হাতে ধাক্কা লেগে কোরআন শরীফ পড়ে গেলে একদল মুসলমান থানা আক্রমন করে এবং জনসমক্ষে সেই পুলিশ অফিসারকে কয়েকবার ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু এর আগে এক হিন্দু অফিসার রাত ১২ টার পর মাইক বাজিয়ে রামলীলা গান বন্ধ করে দেয়ায় তার কোন বিচার হয়নি। মুসলমানদের এই দাবির পরই হিন্দুরা সোচ্চার হয়ে উঠে কর্তৃপক্ষের 'মুসলমান তোষণ' নীতির অভিযোগে। আশ্চর্যের বিষয় মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

তোষণ নীতি যদি হবে তবে তার হাত থেকে দুর্ঘটনাবশত হলেও কোরআন শরীফ পড়ে যাবার বিষয়টি হিন্দুরা তখন ভেবে দেখলেন না? এইরকম ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত পরিস্থিতি তৈরি হলো দাঙ্গার।

১৯৬৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আহমেদাবাদে শুরু হলো হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা। এই দাঙ্গাকে অনেকেই একতরফা গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন। ঘটনার শুরু ঐদিন সকালে। মন্দিরে যাবার সংকীর্ণ রাস্তায় প্রতি বছরের মত বুখারী সাহেবের দরগায় উরস উপলক্ষ্যে প্রায় এক হাজার মুসলমান নর-নারী সমবেত হয়েছিল। দুজন সাধু তখন মন্দিরের গোয়ালে রাখার জন্য দুটি গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেক মানুষের ভীড় দেখে গরু দুটি ভড়কে ছোটাছুটি শুরু করে। এসময় অনাকাংখিত ভাবে দু একজন মহিলা ও শিশু খানিকটা আহত হয়। এ নিয়ে ঝগড়া বাঁধে সাধু দুজনের সাথে। ঝগড়ার সময় আবার সাধুর হাতে থাকা দন্ডের আঘাত লাগে পেছনে দাড়িয়ে থাকা এক মহিলার। তাতে ষোলকলা যেন পূর্ণ হয়। এবার ঝগড়ায় অংশ ষেন আরো কয়েকজন সাধু। এগিয়ে আসে মুসলমান যুবকরা। হাতাহাতি শুরু হলে আহত হন বেশ কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান। পাথর ছোড়ার ফলে মন্দিরের কাচঁও ভাঙ্গে। পুলিশ এসে তখন এ ঘটনার মিমাংসা করে দেন। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। রাতে মন্দিরের ট্রাস্টিরা এক সভায় মিলিত হন। তারা একমত হয়ে দাবি করেন সরকারি তদন্তের এবং অপরাধীদের শাস্তির। প্রশাষণ জনসাধারনকে মন্দিরের উপর আক্রমনের কারণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেন। এসময় মন্দিরের সাধূরা তাদের গায়ে হাত তুলবার প্রতিবাদে শুরু করেন অনশন। হিন্দুধর্ম রক্ষা সমিতি পরের দিন সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন স্থানে সভা আহ্বান করেন। শহরে মোটামুটি শান্তি থাকলেও শুরু হয় গুজব ছড়ানো। বিভিন্ন এলাকার তিনটি দোকানে ওই রাতে আগুন দেয়া হয়। পরের দিন সকালে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে ছাপা হতে থাকে ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা। এতে মানুষের মনে বিভ্রান্তি আরো বেড়ে যায়। মুসলমান বিরোধী ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণযুক্ত নাম-ঠিকানা-বিহীন ছাপা প্রচারপত্র বিলি শুরু হয়। হিন্দুরা দুপুরের পর থেকে দলবদ্ধভাবে ঘুরে সবাইকে বাধ্য করে দোকান-পাট-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে। এসব খবর পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তবে ওই দিন দুপুর থেকেই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ।

পুলিশ ১৪৪ দারা জারি করলেও তা অমান্য করে শুরু হয় হিন্দু ধর্ম রক্ষা সমিতির নেতাদের শোভাযাত্রা ও সভা। রাতে জারি করা হলো কারফিউ। কিন্তু ততক্ষনে শুরু হয়ে গেছে মারপিট, হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ। উন্মত্ত হিন্দু জনতা রাস্তা খুড়ে ব্যারিকেড খাড়া করে আক্রান্ত মুসলমানদের রক্ষা করতে আসা দমকল ও পুলিশকে ফেরত পাঠায়। এসময় আরো একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে হিন্দুর ভাড়াবাড়িতে মুসলমানের দোকান থাকলে তাতে আগুন না দিয়ে শুধু লুঠ করা হয় আর যৌথ মালিকানায় থাকলে তা রক্ষা পেয়ে যায়। ভোটার তালিকা নিয়ে হিন্দুরা মুসলমানদের বাড়ি খুঁজে বের করেছিল সেদিন। এ পর্যায় আত্মরক্ষার তাগিদে মুসলমানরাও দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও এই মুসলমান নিধনের যজ্ঞ দেখতে থাকা দর্শকদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ঘটনাও ঘটেছে। মুসলমান পাড়ায় কোথাও কোথাও জয় জগন্নাথ বলতে মুসলমানদের বাধ্য করা হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর দুপুরে এক যুবক হিন্দুদের সামনে আত্মসমর্পন না

Dhaka University Institutional Repository

করায় তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করে হিন্দুরা। এর আগের দিনে হত্যার ঘটনা ঘটলেও ২০ তারিখ থেকে শুরু হয় গণহত্যা। আক্রমনকারীরা এসময় গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমেও হামলা চালিয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রনিবাস কামাল হোস্টেলে ৩০ জন হিন্দু ছাত্র থাকত। তারা সহপাঠি মুসলমান ছাত্রদের সাথে মিলিত না হয়ে হিন্দুদের সমর্থনে এমনভাবে আক্রমন চালায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলটি পরিণত হয় একটি ধ্বংসস্তুপে। মুসলমান শ্রমিকদের জীবন্ত দগ্ধ এবং মুসলমান নারীদের ধর্ষণ করে নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় ঘোরানো হয়। মুসলিম নিধনের এই তেজ তখন ছড়িয়ে পড়ে আহমেদাবাদের বাইরেও ।
২০ তারিখ রাতে যখন মুসলমানরা প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তখন ৪টি ট্রেনকে মাঝপথে থামিয়ে হত্যা করা হয় ১৭ জনকে। ২৩ তারিখ ৩ ঘন্টার জন্য কার্ফিউ শিথিল হলে নিহত হয় ৪০ জন। এ দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা এক হাজারের বেশি যাদের অধিকাংশই মুসলমান। উদ্বাস্তু হয়েছে ১৫ হাজার মানুষ। ৬ হাজারেরও বেশি দোকান-পাট ও ঘর বাড়ি ধুলিস্মাত হয়েছে আহমেদাবাদ দাঙ্গায়।

১৯৮০ মোরদাবাদ দাঙ্গা

ভারতের উত্তর প্রদেশের মোরদাবাদ শহরটি মুসলমান অধ্যুষিত। পিতল-কাঁসার কাজের জন্য সুখ্যাতি রয়েছে এ শহরের। তবে এর শিল্পীরা অধিকাংশ মুসলমান। কিন্তু এর বাণিজ্যিকীকরণের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা প্রায় সবাই হিন্দু। ৭০ এর দশকে মুসলমান শিল্পীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কিছুটা আর্থিক সমৃদ্ধি হওয়ায় তাঁরাও শুরু করে এর ব্যবসা। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও উৎপাদক, শিল্পী কারিগর অপেক্ষা ক্রেতা বিক্রেতাদের আয় হয় বেশি। তবে প্রথমদিকে সকলেরই আয়ের একমাত্র পথ ছিল স্থানীয় শহরের বারাসেওয়ারে ইন্ড্রাস্টি।
স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি যখন মুসলমান ব্যবসায়ীরা উঠে আসা শুরু করে তা হিন্দুরা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি। সেই সময় আরব দেশগুলোতে পেট্রোলের কারণে অভাবনীয় সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ফলে আরব বনিকেরা তখন ভোগ-বিলাস-ব্যসনের প্রতি আরো বেশি মনোযোগি হয়। এর ফলে মোরদাবাদেও বিখ্যাত পেতল কাঁসা শিল্পের বিক্রি যায় বেড়ে। আরব বনিকরা একজন হিন্দু বিক্রেতা অপেক্ষা একজন মুসলমান বিক্রেতার কাছ থেকে দ্রব্য কিনে স্বচছন্দ বোধ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান ব্যবসায়ীরা আরো বেশি লাভবান হতে শুরু করে। আর এই লাভের অর্থ দিয়ে মুসলমান ব্যবসায়ীরা এলাকায় মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব তৈরি করে। শুরু করে জমি-জমা, ঘর-বাড়ি কেনা। আর হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন আর.এস.এস এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রভাবত ছিলই। মুসলমানদের হটাৎ ধনী হয়ে উঠা ও ধর্মীয় সংস্কার বৃদ্ধির ফলে হিন্দু কট্টোরপন্থী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে স্বজাতীয়তাবাদ। কেউ কেউ আবার এরমধ্যে আরব রাষ্ট্রগুলোর বদৌলতে মুসলমানদের ধনী হয়ে উঠায় তাদের সম্পর্ক আছে বলেও শুরু করে সন্দেহ। এ অবস্থায় আর্থিক প্রতিদ্বন্দীতা রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। সমৃদ্ধ মুসলমানরাও আর সব ক্ষেত্রের মত তখন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রত্যাশী হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

তদানীন্তন শাসক দল কংগ্রেস এবং সমচরিত্রসম্পন্ন বিরোধী দল জনতা পার্টিতে। অতএব তৈরি হয়ে গেল দাঙ্গার ক্ষেত্র।

১৯৮০ সালের ১৪ ই আগষ্ট ঈদ-উল-ফেতর এর দিনেই দাঙ্গাটি হয়। ঈদের নামাজ চলাকালীন সময়ে একটি শূকর ঢুকে পড়ে নামাযের স্থানে। নামাযের কাছাকাছি হরিজন বস্তি থেকে আকস্মিক ভাবেও হতে পারে আবার প্ররোচনায় গোপনে কাজটি করে থাকতে পারে কেউ। তবে এখানে বিদ্রুপের ভূমিকা রাখে সে সময় কর্তব্যরত পুলিশ।

এক মুসলিম যুবক পুলিশকে অনুরোধ করেছিল শুকরটিকে বের করে দেয়ার জন্য। কিন্তু পুলিশ জানায় এটি তার দায়িত্বের মধ্যে পড়েনা। যদিও ততক্ষণে ঈমাম সাহেবের নামায শেষ হয়নি তাই তিনি মাইকে ঘোষণা দেন সবাই যেন পরিস্থিতি উত্তপ্ত না করে নামায শেষ করে। কিন্তু ততক্ষনে ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ঈদগাহর মধ্যে বাইরে থেকে কয়েকটি ঢিল এসে পড়লো। এরপরই শোনা যায় বন্দুকের গুলির শব্দ। প্রাথমিকভাবে শুকর ঢুকে পড়ার ঘটনা থেকে বাক-বিতন্ডা শুরু হলেও পরিস্থিতি খারাপ হয় পুলিশ ও মুসলমানদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে। আর গুলির শব্দে ঈদের নামায পড়তে আসা মুসল্লীরা ভয়ে আতংকিত হয়ে শুরু করে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে দৌড়। কিন্তু মূল প্রবেশের পথটি ছোট হওয়ায় পদপিষ্ট হয়েই নিহত হয় কয়েকশ মানুষ। এর মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধই বেশি। মুহূর্তেই আনন্দের ঈদের নামায পরিণত হয় রক্ত-শোক আর ক্রোধে। হরিজনদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ দাঙ্গায় কতজন নিহত হয়েছিল তা নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন রয়েছে। আমার পাওয়া দুটি স্থানে এর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন, "সরকারী পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নিহতর সংখ্যা ৪০০" (২৭)। "আর বেসরকারী হিসেবে মৃতের সংখ্যা ১৫০০ থেকে ২০০০।"(২৮)

এ দাঙ্গার প্রভাব শুধু মোরদাবাদ নয় আশেপাশের বিহারশরীফ, বারোদা, ভিওয়ানডি,পুনেতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে নিহত হয় ১৫ জন মুসলমান। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি, মোরদাবাদের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে হিন্দু অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন পুলিশের ভূমিকা ছিল বেশি। পুলিশ তাদের নিজেদের দোষ ঢাকতে প্রথমে মুসলমানদের সম্পর্কে মিথ্যে খবর প্রচার করে যার ফলাফল হলো হিন্দুরা উন্মত্ত হয়ে উঠে। যেমন প্রথমেই পুলিশ জানায় মুসলমানরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নামায পড়তে এসেছে। মুসলমানরা হিন্দু নারী অপহরণ করেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যুক্তির কথা হলো তারা অস্ত্র নিয়ে নামায পড়তে এলে নিজের শিশু সন্তানটিকে সাথে করে আনতেন না। আর অপহরনের বিষয়টিও মিথ্যে প্রমানিত হয়েছে। এসব গুজব ছড়িয়ে পরলে পুলিশ তার অবস্থানকে দোষমুক্ত করে একই সাথে হিন্দুদের উগ্র করে তোলে। আর ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীতার কারণে হিন্দুরাত আগে থেকে এখানে ক্ষেপে ছিলই। তারা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল। মোরদাবাদ দাঙ্গার আরেকটি বড় কারণ হলো রাজনীতি।

সে সময় এখানকার বিজেপি এক নেতাকে হারিয়ে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস সমর্থক এক মুসলমান নেতা। আশ্চর্যের বিষয় হলো মোরদাবাদে দাঙ্গায় তিনদফা কার্ফিউ জারি করা হয়েছিল তার মধ্যে দুবারই শুধু মাত্র মুসলমানদের উপর। ফলে মুসলমান নিধনে বিরোধীদের বেগ পেতে হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু পূর্বের মত যদি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকতো তবে তুচ্ছ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সূত্রপাত হতোনা। কিন্তু তুচ্ছ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এমন এক দাঙ্গার সূত্রপাত হলো যা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের দাঙ্গার ইতিহাসে যোগ করলো একটি নতুন অধ্যায়। হিন্দুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হলো কিন্তু এর চাইতে হাজার হাজার গুন বেশি নষ্ট হলো মুসলমানদের সম্পত্তি, প্রাণ হারালো দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ। তবে মোরদাবাদের ইতিহাসে আগে থেকেই দাঙ্গার অধ্যায় রচিত হয়েছে। আলীগড়, আহমেদাবাদ শহরের মত এখানেও ঘন ঘন দাঙ্গা বেধেছে। ১৮৪৮ সালে মোহররমের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে। ১৮৭২ সালে ওই একই দাঙ্গার জের ধরে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। পরে বেশ কয়েকটি দাঙ্গা ঘটে স্থানীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রভাব বেড়ে গেলে হিন্দুদের ক্ষোভ থেকে। মোট কথা আর দশটি এলাকার মত হিন্দুরা এখানেও মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষমতাশীল হওয়া মানতে পারছিলনা। বর্তমানে মোরদাবাদের অধিকাংশ মুসলমান শুধু মসজিদ-মক্তবের দোড় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

১৯৮৯ ভাগোলপুর বিদ্রোহ

গঙ্গার দক্ষিণে বিহার রাজ্যের অন্তভুর্ক্ত ভাগোলপুর শহর। শতবছরের পুরনো সিল্ক সিটি হিসেবে বিখ্যাত ভারতের এই শহরে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জের ধরে বেশ কয়েকবার দাঙ্গা হয়েছে। মহাভারত-রামায়ণে উল্লেখিত এই প্রাচীন নগরে ১৯২৪, ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ এবং ১৯৬৭ এ সাম্প্রদায়িকতার কারণে কয়েকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তবে ১৯৮৯ সালে দুর্গা পূঁজাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে দেড়হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ হানি ঘটে যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান। ১৯৮০ সালে বিচারাধীন ৩১ আসামীকে পুলিশ এসিড দগ্ধ করার পরই ভাগোলপুরের নাম বেশি উঠে আসে সংবাদে। এর ৯ বছর পরই এখানে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ভাগোলপুরে ২২ অক্টোবর থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত সহিংসতায় ১০৭০ জন নিহত, শয়ে শয়ে মানুষ গুরুতর আহত হয়। বিধ্বংস হয় ১১ হাজার ৫শ ঘরবাড়ি। ৬৮ টি মসজিদ, ২০ টি মাজার ধ্বংস করা হয়। এবং সরকারি হিসেবে এই স্বল্প সময়ে শরনার্থী হয়ে যায় ৪৮ হাজার মানুষ যার অধিকাংশই মুসলমান। আশ্চর্যের বিষয় হলো ভাগোলপুর দাঙ্গা নিয়ে দায়ের করা কয়েকশটি মামলার মধ্যে ২০০৭ সালে এসে মাত্র ১৪ জন হিন্দুকে এর জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। বেশিরভাগ মামলাই নিম্ন আদালতে দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে আছে। উপযুক্ত সাক্ষী প্রমানের অভাবে ডিসমিস হয়ে গেছে ১৭১ টি মামলা।

" It's official now. It takes approximately 20 years to make some sort of legal headway against perpetrators of riots in India. The victims of anti-Sikh riots of Delhi waited for 20 years before the Nanavati Commission submitted its report in February 2004 and claimed evidence against congressmen Jagdish Tytler, Sajjan Kumar and H.K.L. Bhagat for "(২৯)

১৯৮৯ এ প্রথম নয় ভাগোলপুরে অতীতেও দাঙ্গা ঘটেছে। ১৯৪৬ সালে বিহারের দাঙ্গায় প্রতিবেশী মুঙ্গেরের তারাপুরের দাঙ্গার প্রভাব এ জেলাতেও পড়েছে। ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৮৪ ও ১৯৮৯ এর

Dhaka University Institutional Repository

আগেও এখানে ছোট বড় মাঝারী বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে গ্রামাঞ্চলসহ এমন ব্যাপকভাবে বড় দাঙ্গা ১৯৮৯ সালেই প্রথম। এবারের দাঙ্গাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।
এই এলাকায় হাত ও বিদ্যুত চালিত তাঁতে রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারি ৭৫ ভাগ মালিক ছিল মুসলমান। সুতার আড়তদার-মহাজন ও বিক্রেতা, রপ্তানীকারক ছিল মাড়োয়ারি গুজরাতি হিন্দু। বিগত কয়েক বছর ধরে মালিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমান স্বাধীন তাঁত চালকদের কেন্দ্র করে অস্থিতীশিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে শ্রমিকদের অবস্থান ছিল খুব সংকটে। কাজের পরিবেশ থেকে শুরু করে মজুরী-পাওনা, আলো বাতাসের অভাবে এ অঞ্চলের শ্রমিকদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। ১৯৮৭ সালে তারা অবস্থার উন্নতি ও বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে গড়ে তুলে আন্দোলন। তখন পর্যন্ত বিষয়টি ছিল শেণীভেদে শ্রমিক শ্রেণীর এবং অসাম্প্রদায়িক।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারীতে শ্রমিকরা আন্দোলন করলে পুলিশ গুলি চালায় এবং পুলিশের একটি বুলেটে একই সাথে হিন্দু মুসলমান শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা এখানে ঘটেছে। তবে এর দুবছর পর শিলাপূজা নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেখা দেয়। এর আগে থেকেই শহরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিভিন্নস্থানে জনসভা ও মুসলমান বিরোধী বক্তব্য পরিস্থিতিকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। ১৯৮৯ সালের ২৪ অক্টোবর জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে রামশিলার শোভাযাত্রা ঐদিন শহরে উপস্থিত হয় কিন্তু প্রবেশের মুখে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তেত্তাপুর মহল্লায় শোভাযাত্রা বাধাগ্রস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম জঙ্গি মানসিকতা অনেকটা উসকে দিয়েছে। তবে তারও আগে আগষ্ট মাসে মহররম ও বিষহরি পূজাঁকে কেন্দ্র করে শহরে কয়েক দফা সংঘর্ষ হওয়ায় সেদিনের শোভাযাত্রায় মুসলমানদের বাঁধা দেবার কারণ ছিল বলে দাবি করেছে মুসলমানরা। শোভাযাত্রায় বাধা দেয়ার পেছনে আরেকটি কারণ ছিল।
সেদিনের যাত্রার আগের দিন মুসলমান বিরোধী শ্লোগান সম্বলিত লিফলেট-প্রচারপত্র পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও শহরে বিতরণ করা হয়। আর যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন মুসলমান বিরোধী হিন্দু কর্মীসহ সদ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়া সন্ত্রাসীরা। এর আগের দিন ২৩ অক্টোবর শহরের গোশলা এলাকায় মুসলমানদের দোকান পোড়ানো, ভাংচুর ও লুঠপাটের ঘটনা ঘটে। মুসলমানরা পুলিশের কাছে আগে থেকেই ২৪ অক্টোবরের শোভাযাত্রা কে প্রতিহত করার আবেদন জানালেও সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। ২৪ অক্টোবর তেত্তাপুরে শোভাযাত্রা প্রবেশের মুখে শখানেক মুসলমান যুবক বাধা দেয়। এ সময় দুপক্ষের মধ্যে বাক-বিতন্ডা শুরু হলে পুলিশ মধ্যস্থতায় আসে। দুপক্ষের নেতাদের সাথে যখন পুলিশ কথা চালিয়ে যাচ্ছে একটি মিমাংসায় পৌছানোর জন্য ততক্ষণে উগ্রবাদিরা কয়েকটি বোমা ফাটায়। এতেই যা হবার তা হয়ে যায়। তবে ঠিক সেই মুহূর্তে বোমা কারা ফাটিয়েছিল তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কেউ বলেছে এটা যাত্রাকে বিঘ্ন করতে মুসলমানদের কাজ। অন্যপক্ষ বলছে পুলিশের উপর প্রতিশোধ নিতে হিন্দু জঙ্গিদের কাজ। কেউ বলছে পুলিশ প্ররোচনা দেয়ার জন্য নিজেই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। অর্থাত বিষয়টি বিতর্কিত।
বোমা বিস্ফোরনের পরপরই পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে যায়। পরিস্থিতি আর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রইলোনা। মুহুর্তে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। তবে এই শোভাযাত্রায় বাধাগ্রস্থ হওয়া থেকেই শুরু হয়েছিল আসলে দাঙ্গার বাতাস।

Dhaka University Institutional Repository

শোভাযাত্রীরা তেত্তাপুর থেকে ফিরে যায় কিন্তু ফিরে যাবার পথে এক দল হিন্দু পাশের মুসলমান মহল্লায় ঢুকে একই পরিবারের ১২ জন সহ ১৭ জন মুসলমানকে হত্যা করে। ওই দিন রাতে কাছের হরিজন বস্তির লোকেরা পার্বঈ বাজারের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দোকান লুঠ করে। এর মধ্যে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে যা ঘটেনি তারও গুজব। হিন্দুরা মুসলমানদের মারছে অন্যখানে মুসলমানরা আগুন দিচ্ছে হিন্দুদের বাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হিন্দু ছাত্রদের তাদের মুসলমান বাড়িওয়ালারা হত্যা করার খবর পাওয়া যায়। পরে যানা যায় সেটি ভুলত ছিলই বরং অনেক যায়গায় মুসলমান বাড়িওয়ালা তাদের হিন্দু ছাত্রদের মুসলমান সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে বাঁচিয়েছে বলে পরে প্রমান পাওয়া যায়। কিন্তু এটি যে গুজব সেটি প্রমানিত হওয়ার আগেই অসংখ্য মুসলমান নর-নারী ও শিশুকে এর দাম দিতে হয়েছে। ২৪ তারিখ সন্ধ্যা থেকে যে তান্ডব ও ধ্বংসলীলা শহরে শুরু হয় তা চলতে থাকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত। ২৭ তারিখ সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী নামানোর পর কার্ফু জারি করা হয়। কিন্তু কার্ফুর আদেশ অমান্য করেও বোমা ও গুলির শব্দ শোনা যায়। রামশিলা শোভাযাত্রায় মুসলমান বিরোধী যেসব শ্লোগান সোনা গেছে সেই সব শ্লোগান আবার ধ্বনিত হতে থাকে। আর এই সব শ্লোগানের সাথে সাথে একের পর এক আক্রমন হতে থাকে মুসলমানদের ঘর-বাড়ি। অভিযোগ রয়েছে প্রথমে পুলিশ নিরব ভূমিকায় থাকে পরে মুসলমান নিধনে তারা উৎসাহ প্রদান করেছে। এসময় হাসপাতালের রুগি, শরনার্থী শিবিরের উপরও হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয় অসংখ্য মুসলমান। এর মধ্যে আবার গুজব ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু ছাত্রী হোস্টেল থেকে ছাত্রী অপহৃত, জলের ট্যাংকীতে মুসলমানরা বিষ মিশিয়েছে। হত্যার এ তান্ডবলীলা চলে ডিসেম্বর পর্যন্ত। দাঙ্গার সময় মুসলমানদের মসজিদ, মাজারগুলো ধ্বংস করে রাতারাতি হিন্দু মন্দির নির্মানের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। মুসলমানদের শুধু হত্যাই নয় তাদের জীবিকার তাতঁগুলোকে পুরোপুরি নষ্ট করে একেবারে আর্থিকভাবে মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে উগ্রবাদী হিন্দুরা।

গ্রামাঞ্চলে দ্বিতীয় দফা দাঙ্গা ঘটে ৯ই নভেম্বর। অমরপুর থানার একটি ঘটনায় এক হিন্দু টেম্পো চালকসহ ১৮ জন মুসলমান যাত্রীকে টেনে নামিয়ে সবাইকে হত্যা করা হয়। তাদের হত্যা করে সাথে সাথে তার উপর বুনে দেয়া হয় রসুন।

তৃতীয় দফায় ৮ ই ডিসেম্বর হয় আরো একটি মুসলমান নিধন হত্যাযজ্ঞ। নিন্দিত তদানীন্তন কর্ণধার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও ডি.আই.জি শেষ পর্যন্ত বদলি হয়েছিলেন। নতুন প্রশাসকে প্রথমেই ব্যর্থ প্রমানের চেষ্টা করতে নাকি অত্যন্ত পরিকল্পনা করে ওই যজ্ঞ চালানো হয়েছিল।

ভাগলপুর দাঙ্গায় পুলিশের ভূমিকা ঃ এ দাঙ্গার প্রথম দিকে পুলিশের কর্মশৈথিল্য নিয়ে অভিযোগ করে আসছিল মুসলমানরা। পরেত সরাসরি প্রমান মিলে পুলিশের মুসলমান নিধন যজ্ঞে হন্তারকের ভূমিকার। দাঙ্গাগ্রস্থ গ্রামাঞ্চলে মোট ৭০০ জনের প্রাণ-হানি হয় যার অধিকাংশই নারী শিশু ও বৃদ্ধ যাদের পক্ষে পালানো কঠিন। ২৬ তারিখ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি হেলিকপ্টারে করে দাঙ্গাগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শনে আসেন। এসময় ভাগলপুরে ২৪ অক্টোবর দাঙ্গায় যে পুলিশ সুপার কে.এস.দ্বিবেদীর ছিল নিরব ভূমিকা সেই পুলিশ সুপারের বদলির দাবি ছিল মুসলমানদের পক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

থেকে। কিন্তু হিন্দু নেতাদের দাবি মেনে নিয়ে রাজীব গান্ধী সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন তার বদলি রদ করানোর। এর ফলে নিরীহ জনগন ও উগ্র হিন্দুদের যা বোঝার তা সাথে সাথেই বুঝে নিয়েছে।

এসময় 'লোগিয়ান গ্রামে পুলিশের এক এ.এস.আইর নেতৃত্বে যে মুসলিম গণহত্যা হয় তার মধ্যে ১০৮ জনের মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়ে রাতারাতি কপি খেতে পরিণত করে দেয়া হয়েছিল। জেলার উচ্চ পদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মচারীদের বদলী হবার পর জনৈক হিন্দু গ্রামবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হয়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জনৈক মেজরের নেতৃত্বে এক দল মুসলমানকে দাঙ্গাগ্রস্থ এলাকা থেকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা নাগাদ চান্দেরী গ্রামের মিন্নত মিঞার বাড়ীতে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়। আরও নিরাপত্তার জন্য পরের দিন তাদের ত্রাণ-শিবিরে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বি.এস.এফের জওয়ানরা এসে দেখে তাদের কেউ নেই। গুরুতর আহত অবস্থায় পাশের একটি পানা পুকুরে মুখ পর্যন্ত ডুবে থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষাকারী দুই জনের কাছে জওয়ানরা জানতে পারে যে পুলিশের উপস্থিতিতেই বিনা প্রতিরোধে সকালে গ্রামের মুখিয়া সরপণ্য এবং কিছু সমাজবিরোধীর নেতৃত্বে দাঙ্গাকারীরা বি.এস.এফ-এর দ্বারা উদ্ধার করা ৬১ জনকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এ পর্যায়ে রেলগাড়ি থেকে মুসলমান যাত্রীদের টেনে নামিয়ে এবং নিরীহ পথচারীদেরকেও কেবল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে হত্যা করা হয়।'

ভিওয়ানদি দাঙ্গা

ভারতের ভিওয়ানদি অবস্থিত বোম্বে অর্থাত বর্তমান মুম্বাই থেকে ৫৩ কিলোমিটার দুরে। উত্তর প্রদেশ থেকে আসা মুসলমান, মধ্যপ্রদেশ ও মালাবার থেকে আসা হিন্দু জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকা। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ভিওয়ানদিতে পুলিশ স্টেশন ছিল একটি। আর সে সময় এখানকার জনসংখ্যার মোট ৬৫ শতাংশ ছিল মুসলমান ৩০ শতাংশ হিন্দু ও ৫ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।
১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এখানে শিবাজীর জন্ম উৎসব খুব সাদামাটা ভাবেই পালন করতো হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। কিন্তু এ বছর থেকেই শিবাজীর জন্মদিন খুব আড়ম্বরপূর্ণ করে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। তরুন একদল কর্মী মিলে শিবাজী জন্মউৎসব পরিচালনা কমিটিও গঠন করে। এই দলটির মুল লক্ষ্য ছিল মূলত মুসলমানদের দমন করে হিন্দু জাতীয়তাবাদীর উন্মেষ তৈরী করা, হিন্দু কট্টোর পন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি করা। এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মসজিদের পথে জন্মউৎসব মিছিল নিয়ে যাওয়া আসার ইতিহাস না থাকলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯৬৪ সালের এ উৎসবে তারা ওই পথটিই ব্যবহার করবে। পরে অবশ্য তা পরিবর্তন করা হয়।
এরপর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধের ফলে এখানকার হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি বিরুপ ব্যবহার আরো তীব্র হয়। এবং শিবাজী জন্মউৎসব এর আয়োজনের মাত্রা প্রকাশ্যে আরো বেড়ে যায়। এসময় শিবাজী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজন চলাকালে নিজামপুর জুম্মা মসজিদ এর পথ দিয়ে মিছিল যাওয়ার কথা থাকলে মুসলমানরা আবার তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে অন্য উপায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে ইট ছুড়ে আহত করে। সেই দোষ দেয়া হয় হিন্দু নেতাকর্মীদের উপর। একই সাথে জানিয়ে দেয়া হয় এই পথ ব্যবহার করা হলে মুসলমানরাও ছেড়ে কথা বলবেনা।

১৯৬৬ সালেও একই পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এবছর মুসলমান অধ্যুষিত 'হামাল ওয়াদা নাকা ও মাদারচালা 'য় গুলাল খেলে ও শিবজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ট্রাক ভাড়া করে তাতে উচ্চস্বরে মাইক ফিট করে গান বাজনা চলে। এসময় মুসলমান বিরোধী এমন কিছু শ্লোগান তারা মাইকে প্রচার করতে থাকে যা সহজেই সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি প্রকট করে তোলে।

১৯৬৭ সালে প্রথম নিজামপুর জুম্মা মসজিদের পাশ দিয়ে নামাজের সময় তারা উচ্চস্বরে গান বাজনা করে শিবাজীর জন্মদিনের মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় থেকে শুরু হয় দুই সম্প্রদায়ের মুখোমুখি বিরোধ। এবছরের শিবাজী উৎসবে সমিতি থেকে শুধু মুসলমানদেরই বর্জন করেনি, সমিতির তরুন নেতাদের লাগাম ছাড়া কাজ কর্মে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করতে পারে বলে হিন্দু অনেক বয়স্ক ও সমাজের শ্রদ্ধেয়দেরও বর্জন করেছিল। ১০০০ রুপির আবির কিনে উৎসবের জন্য রাঙিয়ে দেয়। মুসলিম নেতা আফজাল খানকে নিয়ে চলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। মুসলমানদের বকরী ঈদে গরু কোরবানী দেয়া নিয়ে শুরু হয় বিরোধীতা। সমস্ত কিছু মিলে ভয়ানক হয়ে উঠে সাম্প্রদায়িক বিরোধ।

"The intention of these persons becomes clear when we find that they decided to spend a sum of Rs.1,000 on *gulal* to be thrown at the time of the procession; that they wanted floats depicting the killing of Afzalkhan by Shivaji, the cutting off of the fingers of Shahistekhan by Shivaji and the cutting off by Shivaji of the fingers of a butcher about to slaughter a cow — each of these incidents capable of inciting communal feelings; and that they deliberately did not decide upon the route of the procession till the last moment. This naturally led to rumours in the town that the procession would not pass off peacefully."(৩১)

এ অঞ্চল প্রথম থেকেই মুসলমান অধ্যুষিত ছিল। ১৯৭০ সালের জড়িপ অনুযায়ী ভিওয়ানদীর রাজস্ব সংগ্রহের গ্রাম নাগাও এ মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ হাজার এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ মুসলমান এবং ৪৭ শতাংশ হিন্দু। খোনি গ্রামের ২ হাজার মানুষের মধ্যে ৭০ শতাংশ ছিল মুসলমান। মহারাষ্ট্রের বিদ্যুত চালিত তাঁতের কেন্দ্র ভিওয়ানদিতে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কয়েকবার ছোট বড় দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দাঙ্গাটি সংঘটিত হয়েছে ১৯৭০ সালে। আগেই আলোচনা করেছি এই দাঙ্গা একদিনের ক্রোধে হয়নি। ১৯৬৪ সাল থেকেই মুলত এর বীজ বপন হয়েছিল।

১৯৭০ সালের মার্চ মাস থেকেই শহরে উত্তেজনা শুরু হয়। ৭ ই মে ছিল শিব জয়ন্তী। মুসলমানদের মসজিদের সামনে দিয়ে গান বাজনা বাদ্য বাজিয়ে শিব সেনারা যাবে এবং তারা রঙ ছড়াবে এ বিষয়ে আগে থেকেই মুসলমানদের আপত্তি ছিল। এসময় রাষ্ট্রীয় উৎসব মন্ডলের ছত্র ছায়ায় মুসলিম বিদ্বেষ কঠিন আকার ধারণ করেছে। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন সব সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে থেকে মিলিয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় হিন্দু-মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে আনন্দের সাথে মিলে শিব জয়ন্তী পালন করবে। মসজিদের সামনে দিয়ে শোভা যাত্রা যাবে সেটাও নির্ধারণ হয় তবে হিন্দুরা একমত হন যে তারা মুসলমানদের মনে আঘাত দেয়ার মত কিছু করবেনা। শোভাযাত্রায় একমাত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শ্লোগান দেয়া হবে। এ শর্তে হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই রাজী হয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা ঠিকই চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় উৎসব মন্ডলের কর্মীরা গোপনে চালিয়ে যেতে থাকে মুসলমান বিরোধীতা। বিভিন্ন মন্দিরে সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভায় মুসলমান-বিরোধী প্রচারণাও চলতে থাকে।

যাই হোক অবশেষে বের হয় শোভাযাত্রা। হটাৎ দুজন শোভাযাত্রী শান্তি কমিটি অনুমোদিত তালিকার বহির্ভূত শ্লোগান দেয়া শুরু করে যা সম্পূর্ণ মুসলমান বিরোধী। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলেও হিন্দু সমর্থকদের দাবিতে তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। শোভাযাত্রা আবার এগিয়ে গেলেও মুসলমানরা তা থেকে বেরিয়ে আসেন। এসময় উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের পুনরায় যোগ দেয়ানোর জন্য মুসলমান নেতাদের দ্বারস্থ হলেও সেটা আর সম্ভব হয়নি। ওদিকে এগিয়ে যাওয়া শোভাযাত্রা ততক্ষণে মুসলমান মহল্লার মুখে। শোভাযাত্রীদের সাথে যোগ দিতে পুলিশ পথ ধরার আগেই শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। এ দাঙ্গার পর তদন্ত করতে ভার দেয়া হয়েছিল রাজ্য কর্তৃক নিযুক্ত বিচারপতি মদনের বিচারবিভাগীয় কমিশনকে। সেই কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী। কে কাকে প্রথম আক্রমন করেছিল তার কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়নি। দুই পক্ষই একে অপরকে অভিযোগ করছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ১২ই মে পর্যন্ত দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে ৭৮ জন। এর মধ্যে ১৭ জন হিন্দু, ৫৯ জন মুসলমান, ৩ জন অজ্ঞাত। প্রায় দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। ভিওয়ানদির খবর অন্যান্য জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়লে সেসব স্থানে দাঙ্গার সূত্রপাত হয় এতে ৮৩ জন মুসলমান ও ৩ জন হিন্দু নিহত হয়। গোলযোগের সময় ৬ জন মুসলমান মহিলা হিন্দুদের দ্বারা ধর্ষিত হয়। হিন্দুরা তাদের মহিলারা ধর্ষিত হয়েছে বলে অভিযোগ করলেও এর কোন প্রমান পাওয়া যায়না।

সবচেয়ে ভয়াবহ যে তথ্যটি প্রকাশ পায় সেটি হলো দাঙ্গা চলার সময় পুলিশ হিন্দুদের উপর পক্ষপাত করেছিল। যার ফলাফলে মুসলমান আটক করে ২১৮৩ জন কিন্তু হিন্দু আটক হয় ৩৪৪ জন মাত্র।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় সরকারী হিসেব অনুযায়ী প্রাণ হারিয়েছে ১৬৪ জন। এর মধ্যে ১৪২ জন মুসলমান ও ২০ জন হিন্দু।

শিবসেনা নেতা বাল ঠাকরের রাজনৈতিক প্ররোচনা ছাড়াও এখানকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে ছিল অর্থনৈতিক কারণ । প্রথমত ঃ উত্তর প্রদেশ থেকে আগত মুসলমান বয়নশিল্পী আন্সারীদের মধ্যে কেউ কেউ কালক্রমে কিঞ্চিত সমৃদ্ধি লাভ করে দুই চারটি তাঁতের মালিক হয়ে এবং কাপড়ের ব্যবসায়ে নেমে এযাবৎ ঐ ব্যবসায়ে রত সিন্ধী ও মারোয়াড়ীদেরও প্রতিদ্বন্দী হয় এবং ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি লাভের আশায় আন্সারীরা ধর্মকে কাজে লাগালো। ঐ সময়ে ভিওয়ানদীতে বিদ্যুত চালিত তাঁতকলের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার যার মধ্যে ২৬ হাজারের মালিক ছিল মুসলমানরা। তবে মালিক তারা হলেও তাদের জন্য সুতা আমদানি ও পুঁজি সরবরাহের কাজ করতো হিন্দুরা। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

শিব সেনা আর জনসজ্ঞর মত দল থাকতে সেখানে একের পর এক মুসলমানরা তাঁতকলের মালিক হচ্ছে তার উপর আবার বহিরাগত এর চেয়ে ভালো পরিবেশ দাঙ্গা তৈরির জন্য কি হতে পারে? প্রতিদ্বন্দী সিন্ধী ও মারোয়াড়ীরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেন নি। ভিওয়ানদির দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির রাজনীতি। আর সে সময়ে উসকে দিয়েছিল লিফলেট, মাইকের প্রচারণা। এর প্রমান হলো ভিওয়ানদির দাঙ্গার খবরে পরের দিন পাশের জলগাঁওয়ে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। ৩৩ জন প্রাণ হারায়। এর মধ্যে ১ জন হিন্দু বাকি সবাই মুসলমান।
"একইভাবে কেলাবা জেলার মহদ শহরেও ৮ই মে দাঙ্গার সুত্রপাত হয়। সূত্রপাত ঘটে বেতার ও সংবাদপত্রে ভিওয়ানদির দাঙ্গার খবর পেয়ে।" (৩২)
মদন কমিটির দেয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ভিওয়াদিতে ঐ সময়ে দুসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মিটিং ও জনসংযোগ এর তালিকা। যেখান থেকে প্রতিটিতে কোন না কোনভাবে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়া প্রচারণা চালানো হয়েছে।

"**103.52** Communal speeches were made at the following public meetings held either by the Bhiwandi or the Kalyan Branch of the M.T.M.— (1) the inaugural meeting held on November 3, 1968 at Bhiwandi for the establishment of the Bhiwandi Branch of the M.T.M., (2) a public meeting held on January 13, 1969 at Bhiwandi, (3) a public meeting held on May 24, 1968 at Kalyan, (4) a public meeting held on May 26, 1969 at Bhiwandi, (5) a public meeting held on June 27, 1969 at Bhiwandi, and (6) a public meeting held on November 1, 1969 at Bhiwandi. The M.T M. leaders and workers who made communal speeches at these meetings were one or more of the following— (1) Saad Ahmed Kazi, (2) Suleman Sikandar, (3) Shabbir Hussain, (4) Syed Khalilullah Hussaini, (5) Mahomed Kasim, (6) Sardar Zafarullah Khan, (7) Abdul Khaliq Momin, (8) Hakim A. Raheman Quadri, and (9) Mahomed Kazi.
103.53 One meeting held by the Bhiwandi branch of the, M.T.M. particularly requires to be mentioned as it shows the hostility which the M.T.M. had evoked. The Bhiwandi branch of the M.T.M. had called a meeting on March 27, 1970 to felicitate the P.W.P. M.L.As., K. N. Dhulap and Bhai Patil. The Bhiwandi branch of the Shiv Sena had announced at a public meeting held on March 17, 1970 that it would not allow the said meeting to be held. In order to carry out its threat, the Bhiwandi branch of the Shiv Sena also called a meeting of its own on March 27, 1970 to be held either near the Town Police Station or Kasar Alli, both these places being near the Teen Batti Naka where the M.T.M. meeting was to be held. Both the Shiv Sena and the M.T.M.

Dhaka University Institutional Repository

applied to the Town Police Station for permission to use loud speakers at their respective meetings. The Shiv Sena's application was prior in point of time and, accordingly, permission was refused to the M.T.M. The M.T.M. therefore postponed its meeting to March 28, 1970."(৩৩)

১৯৯২ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ দাঙ্গার ফলে দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক খুশবন্ত সিং এর ডায়রিতে রাখা হিসেব অনুযায়ি শুধুমাত্র ১৯৯০ সালে ভারতে ৩৬ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ পাঞ্জাব কাশ্মির আসামের হিংসাত্মক ঘটনাবলির কারণে। এর অর্থ হলো প্রত্যেক দিন গড়ে ১০০ জনের মৃত্যু।
২১ শতকে এসেও ভারতের দাঙ্গা সম্পর্কে ডক্টর আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার এর একটি মন্তব্যই যথেষ্ট ২০১১ সালের জানুয়ারীতে Dawn.com G Communal strife in India শিরোণামের আর্টিকেলে তিনি লিখেছেন

"NO year in India has been riot-free. Some years like 1992-93 post Babri Masjid demolition, 2002 when Gujarat witnessed major communal catastrophe, 2008 when there occurred Kandhamal riots are more prominent. The year 2010 of course did not witness major riots like those in Mumbai in 1992-93."(৩৪)
অযোধ্যায় বাবরী মসজিদে হামলার ফলাফল ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বহন করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। দুদেশের এ সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার আগে বাবরী মসজিদ সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৫২৮ সালে মুঘল সম্রাট বাবর অযোধ্যায় মসজিদটি নির্মান করেন। যদিও আরেক যায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে বাবরের বাবর নামায় এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। হিন্দু সম্প্রদায় দাবি করে আসছে দেবতা রামের মন্দির ধ্বংস করে এখানে মসজিদ নির্মান করা হয়। এটি বাবরের তৈরী না পূর্বে রাম মন্দির ছিল আমার আলোচনার বিষয় সেটি নয়। তাই এদিকে আর না আগানোই ভালো। যাই হোক ১৮৫৭ সাল থেকেই মসজিদটি নিয়ে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে বিভেদে শুরু হয়। দুপক্ষই দাবি করতে থাকে এই স্থানের উপর অধিকার তাদের। ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ শাষকেরা এখানে বেড়া তৈরী করে হিন্দু ও মুসলমান দু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক স্থান নির্ধারণ করে দেন তাদের প্রার্থনার জন্য। ১৮৮৫ সালে রাঘুবীর নামে এক ব্যক্তি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মানের দাবি জানিয়ে আবেদন করলে ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

১৯৩৪ সালে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মসজিদের একপাশের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯৪৯ সালে পুনরায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় আবারো এ স্থানের নাম-এর উপর অধিকার নিয়ে দাবি জানানো শুরু করে। ১৯৪৯ এর ডিসেম্বরের ২২ তারিখ মাঝরাতে পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষীদের ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে কতিপয় হিন্দু মসজিদে প্রবেশ করে এবং মসজিদের ভেতরে রাম ও

Dhaka University Institutional Repository

সীতার মূর্তি স্থাপন করে। এক কনস্টেবল যেয়ে পরদিন ভোরে অযোধ্যা পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করলে পুলিশ পরস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। ২৩ তারিখ সকালে পুলিশ মন্দিরে পৌছানোর পরও ৫০ থেকে ৬০ জন জোড়পূর্বক মন্দিরের ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পরই বাইরে ৫ থেকে ৬ হাজার মানুষ জড়ো হয়ে ভজন, কীর্ত্তণ শুরু করে। এ অবস্থায় পুলিশ মসজিদের গেটে তাদের প্রতিহত করে তালা ঝুলিয়ে দেয়। একই সাথে মুসলমানরা তাদের স্থান বলে দাবি জানাতে থাকলে পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিকে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে সরকার বিরোধপূর্ণ স্থানটি সরকারের ওয়াক্ফ বোর্ডের মালিকানায় নিয়ে নেয়। ১৯৫০ সালে হাশিম আনসারি নামে এক ব্যক্তি বাবরী মসজিদের গেটের তালা খুলে মুসলমানদের নামায আদায়ের দাবি জানিয়ে কোর্টের কাছে আবেদন করেন। ১৮৮৫ সালে রঘুবীরের আবেদনের পর ১৯৫০ এর এটি ছিল দ্বিতীয় মামলা। এর ৯ বছর পর ১৯৫৯ সালে নির্মোহী আখড়া তৈরীর জন্য তৃতীয় মামলাটি দায়ের হয় ফৈজাবাদ কোর্টে। ১৯৬১ সালে চতুর্থ মামলা হয় ইউপি সুন্নী সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড মুসলমানদের নামায আদায়ের জন্য আবারও এটির তালা খুলে দেয়ার আবেদন জানান। ১৯৬৪ সালে এই মামলা গুলোর ভিত্তিতে কোর্ট রামের মূর্তি নির্মানের আদেশ ও নামাযের জন্য মসজিদের গেট খুলে দেয়ার অনুমতি প্রদান করে। ১৯৮৯ সালে পুনরায় ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি দেওকি নন্দন আগারওয়াল মসজিদটি অন্যস্থানে নির্মানের একটি মামলা লিপিবদ্ধ করেন। এর ৩ বছর পরই ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আরএসএস, বিজেপি সহ উগ্রবাদি হিন্দুনেতাদের নেতৃত্বে গুড়িয়ে দেয়া হয় সাড়ে ৪শ বছরের পুরণো বাবরী মসজিদ। শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কয়েকদিনে ভারতের বিভিন্ন শহরে এ দাঙ্গা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একই সাথে ছড়িয়ে পরে বাংলাদেশেও। মৃতের সংখ্যা এরই মধ্যে ভারতে ২ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ লিবারহান কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এর তদন্ত রিপোর্ট জমা দানের জন্য। দীর্ঘ ১৭ বছর তদন্তের পর ২০০৯ সালে লিবারহান তার তদন্ত রিপোর্ট জমা দেন কোর্টে। এর মধ্যে ২০০২ সালে ঘটে গোধরা হত্যাকান্ড। এর মামলাটি দায়ের করা হয় এলাহাবাদ হাইকোর্টে। অযোধ্যা থেকে আসা ৫৮ জন হিন্দু তীর্থযাত্রী আগুনে পুড়ে নিহত হন ট্রেনে। শুরু হয় গুজরাট দাঙ্গা। এতেও মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

লিবারহান সরকার তার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দানের পর দ্য হিন্দু পত্রিকায় Babri Masjid demolition was planned: Liberhan শিরোনামের আর্টিকেলে উল্লেখ করা হয়

“The demolition of the Babri Masjid was planned, systematic, and was the intended outcome of a climate of communal intolerance deliberately created by the Sangh Parivar and its sister affiliates, including the Bharatiya Janata Party.

This is the key finding of the nearly 1000-page-long report of the one-man Liberhan Commission on the catastrophic events of December 6, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

The report places individual culpability for the demolition on a total of 68 persons, the bulk of them drawn from the extended Parivar clan comprising the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, the Vishwa Hindu Parishad, the Bajrang Dal and the BJP. The BJP contingent includes not just Hindutva ideologues Lal Krishna Advani and Murli Manhohar Joshi, but, surprisingly, also the party's celebrated moderate face, Atal Bihari Vajpayee.

Justice Liberhan goes on to say, "It cannot be assumed even for a moment that L.K. Advani, A.B. Vajpayee or M.M. Joshi did not know the designs of the Sangh Parivar. Even though these leaders were deemed and used by the Parivar … to reassure the cautious masses, they were [in fact] party to the decisions which had been taken." (৩৫)

ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর এর বিরূপ প্রভাব কিভাবে পড়েছিল সে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান জানানোর জন্য পত্রিকা থেকেই উদ্ধৃতি করছি।

BABRI MASJID DEMOLITION IN INDIA – WHAT HAPPENED IN BANGLADESH IN RETALIATION শিরোণামে ২০০৮ সালের ২৯ জুলাই প্রকাশিত আর্টিকেলটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

"almost every public temple in entire Bangladesh and many thousands of private shrines inside the Hindu houses were damaaged and many completely destroyed. Even the shrine of the holy mother of Shri Chaitanya Mahaprabhu and His consort in His ancestral home of Dhaka Dakshin near the Sylhet town were destroyed. The library of the Indian information office and the Indian airlines office in Mattijheel in Dhaka were attacked by muslim mobs and set on fire.

About 25000 houses, 3600 places of worship and 2500 commercial establihments were destroyed in Bangladesh due to severe mob attack in different districts of Bangladesh on December 6, 1992 and onwards. During this holocaust many people were killed, 1925 injured and 2600 women were raped and abducted. MANY OF THE ABDUCTED YOUNG GIRLS ARE BELIEVED TO HAVE BEEN SHIPPED AND SOLD IN MUSLIMS COUNTRIES IN MIDDLE EAST FOR PROSTITUTION AND SLAVERY. Property worth nearly 200 crore takkas was either destroyed or looted.

Bhola district had majority of hinduj population. Till 1992, practically no hindu family had migrataed to India. The hindus mastered the art of growing good crops on marshy lands. Nearly 50000 hindu families

Dhaka University Institutional Repository

were victims of genocide in this district. The muslim mobs, mostly composed of Jammat e Islam goondas and members of the Awami League Party violently looted, damaged and set fire to the houses and commercial centres and temples in the entire district towns and villages. Practically, everything was either looted or destroyed. The condition of women and children was pitiable as there was no food, no shelter and no clothes.Three hundred young girls, mostly minors, were raped, even gang-raped, in front of their parents and families. In one village alone, more than 200 women were abducted and have never been heard of again.
By janamejayan (৩৬)
5th September 2001, 12:12 AM প্রকাশিত
MINORITIES IN BANGLA-DESH : A CHRONOLOGY আর্টিকেলের ভিত্তিতে ১৯৯০ থেকে ১৯৯ এ ৯ বছরের সাম্প্রদায়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হলো।

1990

October: The government imposed an indefinite curfew on older sections of Dhaka, the capital of Bangladesh, amid mounting tension over the storming of the Babri Masjid (mosque) by Hindus in Ayodhya, India. The curfew was ordered after an attempt by protesters to set fire to Hindu temples in old sections of Dhaka. Police foiled the attempts, but the demonstrators seized cameras of newsmen outside the temple.

Maulana F. H. Amini, the head of the fundamentalist party, Khelafat Andolan, protested a recent attack by Hindus on the Babri Mosque in India, but warned that any harm to Hindus in Bangladesh or damage to their property is not permissible under Islam (UPI, 10/31/90).

1991

February: The US Dept. of State Dispatch, 1990 Human Rights Report states that: Thousands of Hindu shops, temples, and homes in Chittagong, Dhaka, and other cities were attacked in October following an assault by Hindus on the Babri Mosque in Ayodhya. There were confirmed deaths of 172 Hindus (including 21 children) and 7 Christians as the result of the rioting. As in 1989, there were reports of harassment, beatings, robbery, vandalism, and encroachment on property directed against non-Muslims.

Dhaka University Institutional Repository

1992

December: Muslims attacked and burnt down Hindu temples and shops across Bangladesh and disrupted an India-Bangladesh cricket match following the destruction of the Babri Masjid in India by Hindu fundamentalists. About 50000 young men with rods and bamboo sticks tried to storm Dhaka National Stadium. At least 10 people died, many Hindu women have been raped, and hundreds of Hindu homes and temples have been destroyed.

1993

October: Hindus in Bangladesh have decided to curtail this year's Durga Puja (Hindu religious festival) celebrations beginning on the 21st in view of the "atrocities" committed against them following the demolition of the Babri Mosque in Ayodhya, All-India Radio reported (0245 gmt, 16 Oct. 1993). The Hindus have demanded that damaged and destroyed temples be repaired and that an inquiry be held into the attack on a Hindu religious procession in Dhaka in August.

November: Several thousand Muslim radicals marched through the streets of Dhaka to demand the arrest and execution of Taslima Nasrin, a female Muslim author critical of male chauvinism and Islamic fundamentalism. Nasrin, 31, has received death threats for her novel "Lajja" (Shame), which condemns Muslim mobs that attacked Hindus in Bangladesh to avenge the destruction of the Babri Masjid in India. The government banned Lajja last July, six months after it was published.

The campaign against Nasrin gained momentum last month after a little known group called the Council of the Soldiers of Islam placed a 50,000 taka price ($1,250) on her head at a public meeting in the conservative north-eastern district of Sylhet. The group claimed that Nasrin's books decried the Koran and the Prophet Mohammad, causing offence to the country's majority Muslim population.

Dhaka University Institutional Repository

1994

February: A 15th century temple housing a priceless record of Hindu history attracts thousands of devotees every year to remote Dinajpur, a town in the northernmost corner of Bangladesh. According to government archeology department records, it was built in 1452 by a Hindu Raja (King), who hired architects and artisans from the Mughal court in Delhi to build the temple.
Every autumn, after the rainy season is over, nearly 100,000 Hindus and people from other faiths camp near the temple for a 3-week annual fair. Many also come from India, Nepal, Sri Lanka and other countries. Update 01/30/96

June: The federal government has ordered the arrest of Taslima Nasrin, a feminist writer whose novel, Lajja (Shame), led to a fatwa (death threat) being issued against her by Islamicists. 3000 orthodox Muslims marched in the streets of Dhaka on June 3 to protest against her allegedly "anti-Islamic" remarks (Reuters, 06/04/94).

August: Taslima Nasrin, the feminist Bangladeshi writer, has arrived in Sweden. She is in Sweden for a writers conference and has gone into hiding following death threats by orthodox Muslims. Nasrin's book, Lajja, describes how Hindu homes and temples were destroyed and Hindu women were raped following the 1992 destruction of the Ayodhya mosque in India (Reuters, 08/10/94).

1995

March: The US State Department's 1994 Report on Bangladesh's Human Rights Practices indicates that there were no major intercommunal incidents in 1994. However, the report states that the Hindu, Christian, and Buddhist minorities are still severely disadvantaged in terms of access to government jobs and political office. Further, Islamic extremists were reported to have violently attacked women, religious minorities, journalists, writers, and development workers (03/95).

June: The leader of Bangladesh's opposition, Sheikh Hasina of the Awami League, says the religious rights of minorities in Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

have been affected by constitutional changes. These changes led to the removal of secularism as a state principle in 1977 and the institution of Islam as the state religion in 1988. Prem Ranjan Dev, the leader of the Hindu community, called for the repeal of these amendments and for the government to rebuild Hindu temples that were destroyed in 1971 and 1993 (in the aftermath of the Ayodhya incident) (Deutsche Presse-Agentur, 06/09/95). Update 06/01/99

July: The World Hindu Conference calls on the United Nations to investigate threats against the fundamental rights of Hindus residing in Pakistan, Bangladesh, and Kashmir (Reuters, 07/11/95).

September: Prime Minister Khaleda Zia donates US $75,000 from the government=s welfare fund to a local trust for expanding Hindu temples and other facilities (Xinhua News Agency, 09/21/95).

November: A recent study by a Roman Catholic relief organization, Misereor, says that while there is major discrimination against religious minorities in Bangladesh, some discrimination is present in certain regions and there appears to be an increase in support for Islamic extremists (Deutsche Presse-Agentur, 11/09/95).

1996

January: The police storm dormitories reserved for Hindu and non-Muslim students at Dhaka University. Some 3000 people are wounded and 905 arrested (United Press International, 02/04/96).

March: The ruling Bangladesh Nationalist Party (BNP) steps down amid protracted shutdowns and violent protests that have left 130 Hindus dead and thousands injured. A caretaker government will preside until federal elections are held in June (Deutsche Presse-Agentur, 04/25/96).

The US State Department's 1995 Report on Bangladesh's Human Rights Practices indicates that property ownership by Hindus remains a contentious issue. In the early years following Bangladesh=s

Dhaka University Institutional Repository

independence, many Hindus lost their land due to discriminatory legislation, which is still in place (03/96).

June: Hindu leaders call for the reservation of parliamentary seats for religious minorities (Reuters, 06/14/96).

The Awami League wins this month=s federal elections. Sheikh Hasina becomes Prime Minister. She is the daughter of Mujibur Rahman, the country=s first leader. Hindus have generally supported the Awami League. The opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP) charges that the Awami League has a pro-India stance (Reuters, 06/14/96).

The US-based National Democratic Initiative reports that Hindus in most areas of Bangladesh, including the Chittagong Hills, were intimidated and stopped from voting in the elections (Ibid.).

1997

August: Supporters of the opposition BNP, engaging in a nationwide strike, attack a Hindu religious procession in the Chittagong Hill Tracts region. No injuries are reported (Agence France Presse, 08/25/97).

1998

February: The leader of India=s Hindu-nationalist Bharatiya Janata Party says that Pakistan and Bangladesh should reunite with India. Pakistan dismisses the suggestion as wishful thinking, contending that it reveals India=s hegemonistic ambitions (Agence France Presse, 02/09-11/98).

March: Following elections in February, the Bharatiya Janata Party forms a new government in India. Later this month, the major opposition party in Bangladesh, the BNP, calls for a boycott of Indian goods. The BNP accuses the ruling Awami League of being pro-India (Deutsche Presse-Agentur, 03/29/98).

1999

January: Police are deployed in the western town of Kushtia after Islamic militants attack Hindu temples in retaliation for an alleged

Dhaka University Institutional Repository

dishonor to the Koran. On their invitations to a local religious festival, the Hindu community had included a Koranic verse below a picture of a Hindu goddess. The youth front of the Islamic party, the Jamaat-i-Islami says this is blasphemy. Local Hindu leaders issue an apology (Deutsche Presse-Agentur, 01/15/99).

March: Hindu women in Bangladesh are reported to suffer greater gender discrimination than Muslim women due to existing legislation that governs the religious community. Hindu women do not have any legal rights to inherit property and as no formal registration of Hindu marriages is required, Hindu women do not have the legal right to divorce. Under the country's Muslim laws, Muslim women are allowed to divorce under compelling circumstances. While the government is in favor of amendments to the marriage and inheritance laws governing Hindus, it wants the impetus to come from the Hindu community as the government does not want to offend any religious sentiments (Inter Press Service, 03/01/99) (৩৭)

উৎস সমূহ

১ Bipan Chandra, *Communalism in Modern India*, Pp 4

২ বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদাযিক রাজনীতি, বদরুদ্দীন উমর পৃষ্ঠা ১১।

৩ The politics of Religious communities; Seminar January 1990. Page 28.

৪ The Indian Annual register edited by Mitra. Page-50.

৫.১ মীজানুর রহমান,কৃষ্ণ ষোলোই,পৃষ্ঠা-১০

৫.২ কৃষ্ণ ষোলোই পৃষ্ঠা-১২

৬ দাঙ্গার ইতিহাস/ শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ১২৫।

৭ By B Rajeshwari / **Communal Riots in India A Chronology (1947-2003)** / p.1

৮ শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়/দাঙ্গার ইতিহাস.পৃষ্ঠা ৭৬।

৯ শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়/দাঙ্গার ইতিহাস.পৃষ্ঠা ৭৬।

১০ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ/ ভারত যখন স্বাধীন হলো.পৃষ্ঠা ১১৬।

১১ মীজানুর রহমান,কৃষ্ণ ষোলোই,পৃষ্ঠা-১৪

১২ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ/ ভারত যখন স্বাধীন হলো.পৃষ্ঠা ১১৭।

১৩ **Direct Action Day/ From Wikipedia, the free encyclopedia**

১৪ **Direct Action Day/ From Wikipedia, the free encyclopedia**

Dhaka University Institutional Repository

১৫ মীজানুর রহমান,কৃষ্ণ ষোলোই,পৃষ্ঠা-১৪
১৬ দেশভাগ সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা/ মফিদুল হক.পৃষ্ঠা- ২৭
১৭ **http://www.hvk.org/articles/0902/5.html /**
Future of Hindus in Bangladesh /Author: Bhupendra Kr.Bhattacharyya
Publication:Organiser,IndependenceDaySpecial
Date: August 18, 2002
১৮ Prafulla Kumar Chakraborty / The Marginal Men
১৯ Push Comes To shove : The Killings of !950, And The Neheru-Liaquat Pact.
২০ http://news.bbc.co.uk
/onthisday/hi/dates/stories/january/13/newsid_4098000/4098363.stm
বিবিসি সূত্র।
২১ The Legacy of the plight of Hindus in Bangladesh - Part-VII
By Rabindranath Trivedi - for Asian Tribune from Dhaka (http://www.asiantribune.com/index.php?q=node/6656)

২২ The Legacy of the plight of Hindus in Bangladesh - Part-VII
By Rabindranath Trivedi - for Asian Tribune from Dhaka (http://www.asiantribune.com/index.php?q=node/6656)
২৩ The Legacy of the plight of Hindus in Bangladesh - Part-VII
By Rabindranath Trivedi - for Asian Tribune from Dhaka
(http://www.asiantribune.com/index.php?q=node/6656)
২৪ The Legacy of the plight of Hindus in Bangladesh - Part-VII
By Rabindranath Trivedi - for Asian Tribune from Dhaka
(http://www.asiantribune.com/index.php?q=node/6656)
Interrogating Victimhood: East Bengali Refugee Narratives of Communal Violence by Nilanjana Chatterjee
২৫
http//www.swadhinata.org.uk/document/chatterjeeEastBengal%20Refugee.pdf
২৬ দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা / মফিদুল হক. পৃষ্ঠা ৪৯।
২৭ শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়/দাঙ্গার ইতিহাস.পৃষ্ঠা ১০৪।
২৮ কমিউনাল রায়টস ইন ইন্ডিয়া অ্যা ক্রনোলজি/ বি রাজেশ্বরী। পৃষ্ঠা ৯।
২৯ **Bhagalpur-Riots / Bhagalpur Riots: 14 Accused Convicted After 18 Years / by Mohib Ahmad**

Dhaka University Institutional Repository

৩০ শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়/দাঙ্গার ইতিহাস.পৃষ্ঠা ১১৫ থেকে ১১৬
৩১ (**D.P.MADON**/November7,1974/ http://www.sabrang.com/srikrish/annexure.htm)
৩২ দাঙ্গার ইতিহাস/ শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮।
৩৩ (**D.P. MADON**/ November 7, 1974/ 103.52 ,103.52/ http://www.sabrang.com/srikrish/annexure.htm)
৩৪ By Asghar Ali Engineer / (http://www.dawn.com/2011/01/23/communal-strife-in-india.html)
৩৫ Babri Masjid demolition was planned: Liberhan / The Hindu New Delhi, November 24, 2009 http://www.thehindu.com/news/national/article53941.ece
৩৬ (http://janamejayan.wordpress.com/2008/07/29/624/)
৩৭ (http://hindustan.net/forums/archive/index.php/t-634.html)

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায় ঃ বঙ্গভঙ্গ পূর্ব উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান

ভারত উপমহাদেশে উর্বরা ভূমি আর সম্পদ যুগে যুগে আকৃষ্ট করেছে বিদেশি শক্তিকে। সর্বপ্রথম যে বহিরাগত শক্তি এ দেশের আদিবাসীদের পরাজিত করে রাজ্যস্থাপন করে তারা আর্য। আদিবাসী দ্রাবিড়দের এক বিরাট অংশ আর্যদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত মালা অতিক্রম করে দক্ষিণের একেবারে শেষে সমুদ্রতীর পর্যন্ত। নর্মদা আর কাবেরি নদীর দুই তীর ধরে বসতি স্থাপন শুরু করে দ্রাবিড়রা। এদের একটি ক্ষুদ্র অংশ পরবর্তীকালে সিংহলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে।

এদিকে গঙ্গা আর সিন্ধুর অববাহিকা জুড়ে বসতি স্থাপন করে আর্যরা। কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায় দ্রাবিড়দের মহেনজোদাড়ো হরপ্পা সভ্যতা। ইরান থেকে আগত আর্যরা গড়ে তুলে নতুন এক সভ্যতা। "ক্রমান্বয়ে বহু জাতি এবং বহু ধর্মের মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। শক, হূন, গ্রীক, প্রভৃতি জাতি আর্যদের পরাভূত করে এদেশে রাজ্য স্থাপন করে। সুদীর্ঘ সময়ে তাদের সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যায় আর্য সংস্কৃতিতে। ইতিমধ্যে আর্য সভ্যতার ঘটেছে বিস্ময়কর অগ্রগতি। ইতিহাসের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগবেদ-এর কিছু অংশ রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব হাজার বছর আগে। অবশিষ্ট বৈদিক সাহিত্য যেমন সামবেদ, যর্জুবেদ, অথর্ববেদ পরবর্তীকালের রচনা। আর্যজীবনধারা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরন রচিত হয়েছে এই বৈদিক সাহিত্যের উপর নির্ভর করে। দুই মহাকাব্য রামায়ন ও মহাভারত রচিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০- ৭০০ বছরের মধ্যে। রামায়ন ও মহাভারত এপিক গ্রন্থ দুটি আর্যঋষিদের বিস্ময়কর সৃষ্টি।"(১)

শুধু সাহিত্যে নয় জ্যোর্তিবিদ্যা আর অংক শাস্ত্রেও তাদের কৃতিত্ব অসাধারণ। বিশ্ববাসিকে এই দুই শাস্ত্রের জ্ঞান দান করেছে আর্য-হিন্দুরা। অতিপ্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আর্যদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আর্য সভ্যতা একদিন ভারত মহাসাগরের জাভা, বোর্নিও, সুমাত্রা এবং বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বিস্তার লাভ করেছিল। সুদীর্ঘকালে আর্য সংস্কৃতির সাথে মুসলিম সংস্কৃতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ায়।

মুসলমানরা এদেশে আসে অষ্টম শতকে। প্রথমে আরব মুসলমানরা রাজ্য স্থাপন করে সিন্ধু অঞ্চলে। এরপর আসে আফগান মুসলমান। এদেরকেই পাঠান বলে অভিহিতি করা হয়। তাদের সময়ে গোটা ভারতেই মুসলিম শাষণ বিস্তার লাভ করে। এরপর মধ্যএশিয়া থেকে মুঘল মুসলমানরা পাঠানদের পরাজিত করে এদেশে রাজ্য স্থাপন করে। মুঘলরাই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করে ঐক্যবদ্ধ ভারত সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। প্রায় আটশ বছর এই মুসলমান শক্তিগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্নস্থান থেকে ভারত শাষণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

."The historical phase of India began with the Muslim invasion. Muslims were India's first historians."(২)

এই দীর্ঘ সময়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সম্প্রীতি আর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেণীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের কারনে অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের রুচি ও সংস্কার-এ এসেছিল এক আধুনিক পরিবর্তন। এর প্রভাবও পড়েছিল মানুষের জীবনে। তবে শুধুই যে সৌহার্দ্যই ছিল কোন বিরোধ ছিলনা তাও নয়। দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার একটা ব্যবধানত আগে থেকেই ছিল। এর ফলে যা সন্তোষজনকভাবে সমাধান হবার কথা তার অনেক কিছুই দেখা গেছে নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসে দাড়িয়েছে। তারপরও দুপক্ষের মধ্যে সদ্ভাবের ওজনটাই বেশি ধরা হয় কারণ বড় কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা ছাড়া কয়েকশ বছর একসাথে বসবাস করার দৃষ্টান্ত অন্তত তাই বলে।

কিন্তু ইংরেজরা তাদের রাজত্বকালে অত্যন্ত সুক্ষভাবে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছিল বিভেদনীতির কৌশলে। আর এ কাজটি ইংরেজদের দিয়ে সহজ হয়েছিল এ কারণে যে তাদের আগেও অনেক জাতির সাথে ভারত উপমহাদেশের মানুষ বন্ধুত্ব করেছে। কারো কারো কাছে শোষিত হতে হয়েছে কিন্তু সেটি উপরতলার এক শ্রেণীর মানুষ পর্যন্তই প্রভাব ফেলেছে। ইংরেজরা এ ভুখন্ডে এসে সমাজের সবচেয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর উপরও যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এমনটা আর আগে কেউ করেনি। "বৃহত্তর ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে ইংরেজদের আগমন যে গতি এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল তার ফলে অনেক পুরাতন সমস্যা নিশ্চিহ্ন হল এবং উদ্ভব হল অনেক নতুন সমস্যার। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় জীবন যে খাতে প্রবাহিত হয়েছে ইংরেজদের পূর্বে অন্য কোন বিদেশীর আবির্ভাব তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনে নি।"(৩)

ভারত উপমহাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন খলিফা ওয়ালিদের সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সমগ্র সিন্ধু অঞ্চল দখল করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাবের ওপর তার বিজয়াভিযান চালিয়ে মূলতান পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ত্বরাইনের যুদ্ধে দিল্লী এবং আজমিরের রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহানকে পরাজিত ও হত্যা করেন ঘোর রাজ্যের অধিপতি শিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরী দিল্লী ও আজমির অধিকার করেন। এখানে উল্লেখ্য যে দিল্লী ও আজমিরে মুসলমান সম্রাটদের রাজ্য স্থাপনের আগে থেকেই এদেশে মুসলমান সুফি দরবেশদের আনাগোনা ছিল। শিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরী তার যোগ্য সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের উপর ভারতের শাষণভার অর্পণ করে ঘোর রাজ্যে ফিরে যান। পরবর্তিকালে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবেক তার সেনাপতি

Dhaka University Institutional Repository

ইখতিয়ারউদ্দিন বিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক প্রথম বাংলাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলার তৎকালিন রাজা লক্ষণ সেন বিনা যুদ্ধে নবদ্বীপের রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে চলে যান বিক্রমপুরে। এখানেও উল্লেখ্য যে বখতিয়ার খিলজী প্রথম বাংলাদেশে রাজ্য স্থাপন করলেও তিনিই কিন্তু এদেশে প্রথম মুসলমান ছিলেন না।

বাংলাদেশে প্রথম মুসলমানদের আগমন ঘটে অষ্টম শতকে। তখন সোনারগাঁ, সন্দীপ ও চট্টগ্রামের সঙ্গে আরব বনিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আরব সওদাগরদের সাথে অনেক আউলিয়া, দরবেশ এদেশে আসেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আর দেশে ফিরে যাননি। ঐসব সুফি দরবেশদের আদর্শ এবং আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছেন।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দলে দলে সুফি দরবেশদের প্রচারিত ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে আবার একটি গভীর সামাজিক কারণ রয়েছে। হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা ক্রমাগত নির্যাতিত হয়ে এসেছে নিম্ন বর্ণের মানুষরা। সুতরাং তাদের মুক্তিহীন একটি অসহায় অবস্থা যুগের পর যুগ ধরে চলছিল। এই অসহায় অবস্থা থেকেই খুব স্বাভাবিকভাবে মুক্তিলাভের একটি প্রচন্ড আকুতি তাদের মাঝে একটি গভীর শিকড় বিস্তার করে। ঠিক সেই মুহূর্তে সুফীদের প্রচারিত ইসলামের সাম্যনীতির মধ্যে তারা তাদের মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ভারতের বুকে মুসলিম রাজ্য স্থাপনের বহু আগেই পূর্ব বাংলায় অনেক হিন্দু এভাবেই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে।

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে ৫শ বছর এদেশে মুসলমান শাষণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে সমস্ত মুসলমান শাষক স্থায়ীভাবে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তারা এদেশের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

অল্প কিছু সৈন্য আর পরিষদ নিয়ে পুরো ভারতবর্ষ শাষণ করা কোন সম্রাটের পক্ষেই তখন সম্ভব ছিলনা। এদেশেরই মানুষের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতাই বিদেশি মুসলমান শাষকদের পক্ষে এদেশে শাষণ করা সম্ভব হয়েছে তাই সম্রাট বা নবাবদের সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের সবস্তরে ছিল হিন্দুদের ব্যাপক প্রাধান্য। এই সুদীর্ঘ সময়ে মুসলমান শাষণ আমলে সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও রাজস্ব বিভাগেও প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের এবং গোটা ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যের। কিন্তু ইংরেজদের সময় থেকে শুরু হয় ভেদ নীতি ও শোষণ যার প্রভাব যেয়ে পড়ে গ্রামগুলোতেও। সামাজিক এবং আর্থিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে থাকে মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। "ইংরেজ-পূর্ব যুগে ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমুহই ছিল তার সমাজ ও আর্থিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এ গ্রামগুলি ছিল দ্বীপসদৃশ এবং সারা ভারতবর্ষ ছিল বিশাল এক দ্বীপপুঞ্জ। অন্ন-বস্ত্র এবং জীবনের যাবতীয় আয়োজনের দিক থেকে গ্রাম বহির্ভূত কোন কিছুর প্রতি তাদের বিশেষ কোন নির্ভরতা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলনা। প্রয়োজন তাদের ছিল অতি পরিমিত এবং ব্যাপক বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ গ্রাম্য প্রচেষ্টায় তারা সে প্রয়োজন পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম ছিল। অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিতে তাদের যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন তারও মধ্যে ছিল সেই সনাতন স্বয়ং-সম্পূর্নতা।"(৪)

ইংরেজরা কায়েমিভাবে এদেশে রাজ্য স্থাপন করার পর ভাবলো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে নাহলে রাজত্ব টিকিয়ে রাখা যাবেনা। রাজ্য হারিয়ে মুসলমানরা তখন দিশেহারা। সুযোগ পেলেই তারা ইংজেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে হাতে। একারণে ইংজেরা মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। মুসলমানদেরকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে কাছে টেনে নিল হিন্দুদের।

মুসলিম আমলে পার্সি ছিল রাজভাষা, পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজিকে করা হলো রাজভাষা। হিন্দুরা সহজেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহনে এগিয়ে এলেও মুসলমারা তা বর্জন করলো। ইংরেজি শিক্ষার কারণে অল্প সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর। ওদিকে ইংরেজদের রাষ্ট্রনীতির ফলে মুসলমানরা তখন অবহেলিত। ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করার ফলে ইংরেজ সরকারের চাকরীর সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চলে গেল মুসলমানদের জায়গীরদারি। নব্য হিন্দু বণিক শ্রেণী কিনে নিল জমিদারী। ধীরে ধীরে মুসলমানরা দরিদ্র হতে শুরু করলো। মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে মুসলমানদের এক বিরাট অংশ ধনী থেকে পরিণত হলো দিনমজুরে। ক্রমেই দু সম্প্রদায়ের বিভেদ আর অবস্থান যেন আরো স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল এর মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থানের ব্যবধান বেড়েছিল আরো বেশি।

তবে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির এক যুগান্তকারি উদাহরন। ১৮৫৭ সালে হিন্দু মুসলমানের মিলিত এই বিদ্রোহ ভারতের বুকে ইংরেজ শাষণের ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। হিন্দুরা ইংরেজ আমলে অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে সত্যি কিন্তু ইংরেজদের ধর্মীয় নীতি তাদের মনে দারুন আঘাত এনেছিল। তাই সম্প্রদায়গত ভাবে সুবিধা ভোগ করলেও ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত লাগায় তারা মুসলমানদের সাথে এক হয়ে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মুসলমান মৌলভী বা মোল্লার নের্তৃত্বে যেমন হিন্দু পুরোহিতরা যুদ্ধ করেছেন তেমনি হিন্দু পুরোহিতদের নেতৃত্বে মুসলমান মৌলভী বা মোল্লারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। এই যুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য দেখে ইংরেজরা অবাক হয়েছিল। বহু চেষ্টা করেও তারা সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারেনি। তখন থেকেই ব্রিটিশ শাষকদের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিজাতী তত্ত্বের কথা মাথায় ঢুকেছিল। এসময়ই তারা বুঝেছিল হিন্দু-মুসলমান এক থাকলে তাদের পক্ষে শাষণ করা অসম্ভব।

একটি ছোট্ট ঘটনা এখানে উল্লেখ করার মত, ১৮৫৭ সালের ১লা আগষ্ট ছিল মুসলমানদের পবিত্র ঈদ উল আযহা। এই দিন গরু কোরবানিকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ইংরেজরা। কিন্তু তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন বাহাদুর শাহ (শেষ মুঘল সম্রাট), তিনি ঘোষণা করলেন ' দিল্লীতে কেউ গরু কোরবানী করতে পারবেনা, যদি কেউ গরু কোরবানি করে তাহলে তোপ দেগে তাকে উড়িয়ে দেয়া হবে।' তখন এমনভাবেই একে অন্যের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সন্মান জানানোর অনেক উদাহরন রয়েছে। আবার হিন্দুরাও মসজিদে আযান দেয়ার সময় উলু ধ্বনি থেকে বিরত থাকার অনেক উদাহারন রয়েছে। আসলে অন্যকে সন্মান জানাতে হলে যে বিকল্প পথ রয়েছে শুধু প্রয়োজন সহমর্মিতার মধ্যে দিয়ে সেই পথকে খুঁজে বের করা একথা সেসময়ে দু'সম্প্রদায়ের মানুষই জানতো।

কানপুরের নানাসাহেবের সেনাপতি তাতিঁয়া টোপি এবং ঝাঁসির রানী লক্ষীবাদ ব্যতিত সিপাহী বিদ্রোহে ভারতের অধিকাংশ স্থানে নেতৃত্বে ছিল মুসলমান সম্প্রদায়। সেই কারণে সিপাহী যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ইংরেজরা মুসলমানদের উপর চড়ম দমন নীতি চালাতে থাকে। এ কারণে মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সিপাহী যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা আরো চড়ম দারিদ্রের মুখে পড়ে। শুরু হয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য। একেত অর্থনৈতিক বৈষম্য সেই সাথে ইংরেজদের দেয়া শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকার দরুন রাজনৈতিকভাবেও মুসলমানদের ক্ষমতা লোপ পেতে শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই এ পরিস্থিতি প্রকট হয়ে উঠে।

ক্ষমতার পালাবদলে হিন্দুদের দীর্ঘদিনের ক্ষমতা নিয়েছিল মুসলমানরা আর মুসলমানদের প্রায় ৫ শত বছরের শাষণকে পরাস্ত করে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়েছে ইংরেজরা। ফলে ইংরেজ আর মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল সমসাময়িক হওয়ায় মুসলমানদের সে সময় ক্ষোভটা বেশিই ছিল। ইংরেজদের প্রতি আক্রোশটাও তাদেরই বেশি হওয়ায় তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহন থেকে পিছিয়ে থাকে। আর হিন্দুরা এ সময় এগিয়ে আসে অংক-ইংরেজি শিক্ষায়। একেত ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়েছে তার ওপর মুসলমানদের উপর বিরক্ত হয়ে ইংরেজদের তুলনামুলক হিন্দু প্রীতি সে সময় হিন্দুদের শিক্ষা গ্রহন থেকে শুরু করে ইংরেজদের অফিস আদালতে চাকুরী গ্রহনের পথ সুগম করে দেয় আর আরো বৈষম্যের দিকে ঠেলে দেয় মুসলমানদের।

Dhaka University Institutional Repository

" উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতীয় অর্থনীতি, প্রশাসন ও শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তিন ধরনরে দ্বন্দ আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এই দ্বন্দগুলি হলো যথাক্রমে ভারতবর্ষের উপকূলীয় অঞ্চল বাঙলাদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর নবগঠিত ধনীক ও বণিক শ্রেণীর সঙ্গে প্রাক ইংরেজ আমলের উত্তর ভারতীয় ভূস্বামী ও বণিক শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ। দ্বিতীয়ত, ইংরেজী শিক্ষায় অধিকতর শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনায় পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের চাকুরী, ব্যবসা, বাণিজ্য ক্ষেত্রে দ্বন্দ এবং তৃতীয়ত, ইংরেজ শাসনের এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের বিভিন্ন ধরনের মিত্রদের সঙ্গে কৃষক, কারিগর ও বিভিন্ন পেশাজীবি দরিদ্র জনগণের শ্রেণীগত দ্বন্দ। এই দ্বন্দগুলির মধ্যে তৃতীয় দ্বন্দটিই পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৭ সালের ব্রটিশ বিরোধী সিপাহী যুদ্ধ পর্যন্ত সব থেকে তীব্র থাকে। ১৮৬০ এর দশক থেকে আসামে চা শিল্প এবং বোম্বাই অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প মালিক শ্রেণীর জন্ম হয় এবং শ্রমিকদের সঙ্গে শিল্প মালিক শ্রেণীর ও ইংরেজ শাসনের দ্বন্দ এবং সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু এই একই সময় কালে অর্থাৎ ভারতবর্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাষনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে নবগঠিত হিন্দু ও মুসলমান মধ্যশ্রেণীর পারস্পরিক দ্বন্দ ও প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্র হতে থাকে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটে।"(৫)

বৃটিশ বিরোধী রাজনীতি না করে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঠেলে দিতে পরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা শুরু হয়। তারা ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদেরকে সরাসরি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠন করতে উৎসাহিত করে। শুধু দল গঠন করতে উৎসাহি নয় রীতিমত তারা নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহন করে। এর সবচেয়ে বড় উদ্যোগ হলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে বাইরেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার ঘটে এবং ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সারা ভারত মুসলীম লীগ' ও সারা ভারত হিন্দু মহাসভা নামে মুসলমান ও হিন্দু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন দুটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। এর আগে ১৯ শতকের শেষ দিকে গঠন করা হলো কংগ্রেস।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গর পরিকল্পনা বা তার আরও আগে থেকেই বাঙ্গালী হিন্দু মধ্য শ্রেণীর ক্ষমতাকে নষ্ট করে এবং তার রাজনীতিকে বৃটিশ বিরোধীতা থেকে সরিয়ে মুসলমান বিরোধীতার দিকে মনোযোগ দেয়ানোর জন্য ইংরেজরা যে পরিকল্পনা করেছিল একই সাথে এ বিষয়ে যে তারা পদক্ষেপ নিচ্ছিল সেটিও তারা গোপন করার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ঢাকা সফরের সময় যথেষ্ট স্পষ্ট করেই বলেছিলেন "বাঙ্গালীরা যারা নিজেদেরেকে একটি জাতী হিসেবে চিন্তা করতে ভালবাসে এবং যারা এমন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যেখানে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে একজন বাঙ্গালী বাবু কলকাতার গর্ভনমেন্ট হাউসে অধিষ্টিত হবে, তারা অবশ্যই সেই ধরনের যে কোনো ভাঙনের বিরুদ্ধে তিক্ত মনোভাব পোষণ করে যা তাদের

Dhaka University Institutional Repository

এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বাধাস্বরুপ। এখন তাদের চিৎকারের কাছে নতিস্বীকার করার মত দুর্বল হয়ে পড়লে আমরা আর কখনো বাংলাকে বিভক্ত অথবা ছোট করতে সক্ষম হবনা এবং তার দ্বারা আপনারা ভারতের পূর্বদিকে এমন একটা শক্তিকে জমাটবদ্ধ ও কঠিন করবেন যে শক্তি ইতিমধ্যে অপ্রতিরোধ্য হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলার নিশ্চিত উৎস হিসেবে বিরাজ করবে।"(৬)

লর্ড কার্জন স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন জমাটবদ্ধ শক্তি তাদের জন্য একটি সংকেত সেই কথা এবং এ বিষয়ে তাদের অভিসন্ধি। আর এ মনোভাব শুধু ব্রিটিশ শাসকদেরই নয় পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সরকারও ভয় পেতেন, তাই ১৯৬৬ সালে যখন শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি আদায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন আইয়ুব খান তখন বলেছিলেন এটি হচ্ছে বৃহৎ বাংলা গঠনের পরিকল্পনা। "দেশভাগ পূর্ববঙ্গীয় সমাজের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, যে শক্তি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়ে জাতীয় জাগরণের ইঙ্গিত বহন করেছিল তা সমান্তরালভাবে লড়াই অব্যাহত রেখে চলছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পটভূমিকায় শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়-দফা প্রস্তাব ঘোষণা করে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা সম্পন্ন সর্ব-পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতির বিপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারন ও জীবন পরিচালনার দাবিনামা উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবনায় ক্ষিপ্ত আইয়ুব খান হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিলেন, এসব হচ্ছে বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের পরিকল্পনা।"(৭)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

১ ভারতবর্ষের ইতিহাস / রমিলা থাপার।

২ **Gustave le Beon : Les Civilisations de L'Inde, Book III, p.146(**
http://www.indianmuslims.info/history_of_muslims_in_india.html

৩ নির্বাচিত প্রবন্ধ/সাম্প্রদায়িকতা/বদরুদ্দীন উমর/পৃষ্ঠা ১৬১

৪ নির্বাচিত প্রবন্ধ/সাম্প্রদায়িকতা/বদরুদ্দীন উমর/পৃষ্ঠা ১৬১

৫ বদরুদ্দীন উমর/ বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পৃষ্ঠা ১০

৬ Sumir sarkar : The swadeshi Movement in Bengal 1903-1908 page 19-20.

৭ দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা / মফিদুল হক পৃষ্ঠা ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায় ঃ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গার কারণ

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঃ

ভারত উপমহাদেশে দাঙ্গার চেয়ে সম্প্রীতির উদাহরনই বেশি। যুগ যুগ ধরে একসাথে বসবাস এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার যে নজির এ অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তৈরী করেছে তা দৃষ্টান্ত। "স্বাধীনতার আগে এবং পরেও আমাদের মধ্যে সমাজবাদী দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেছেন যে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ আসলে শোষক শ্রেণী কর্তৃক তাদের শোষণ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কৌশল ও ছদ্মাবরণ মাত্র।" (১) স্বাধীনতা অর্থ ১৯৪৭ এ ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা বোঝানো হয়েছে। কথাটি শুধু সমাজবাদী দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নয়। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হলেও ব্যতিক্রম কয়েকটি ঘটনা ছাড়া কেউ আসলে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়নি সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। হয়েছে রাজনীতি, ক্ষমতা দখল, অর্থনৈতিক উন্নতিতে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের তাগিদে। ধর্ম এখানে একটি লেবাস মাত্র। তবে কট্টোর মনোভাবের বিষয়টিকেও এড়িয়ে যাওয়া যাবেনা যেমন পাকিস্তানের ব্লাসফেমি বা ধর্মদ্রোহ আইন ও সম্প্রতি এর ফলে কয়েকটি হত্যাকান্ডর ঘটনা। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলার পরও সংশোধণীতে যে সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম অর্ন্তভুক্ত করা, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা, ভারতের সব ধরনের সরকারী কাজের শুরুর সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আনুষ্ঠানিকতা পালন করা। এখনও হরিয়ানা অঞ্চলে অবৈধ সম্পর্কের কারণে হত্যা করার যে সামাজিক তথাকথিত পুণ্য প্রথা এমন কিছু কিছু প্রকট বিষয় রয়েছে। তবে কোন সম্প্রদায়ের ভেতরের ধর্মীয় রীতি নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য সম্প্রদায়কে আহত না করছে ততক্ষণ এ থেকে দাঙ্গার আশংকা নেই। কিন্তু এসব নিয়ম থেকে চর্চা হচ্ছে গোড়ামীর যা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আরো কঠোর মনোভাব তৈরি করতে সহায়তা করছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

দাঙ্গা আসলে ক্ষমতায়ন এর আগ্রহ থেকেই তৈরি। পরে এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলো ইন্ধন দিয়ে থাকে।

"আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইহজাগতিক দাবি সমূহ নিছক কোন বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী হবার জন্য যখন সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় উপস্থাপন করতে থাকে, আমার মতে তখনই তা সাম্প্রদায়িকতার মূল বিন্দু হয়ে ওঠে। এর অভিব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের বা বহুবিচিত্র হতে পারে। কিন্তু মূল বিচার্য হল- ইহজাগতিক দাবি সমুহকে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ভাষায় আবরিত করে উত্থাপন করা হচ্ছে কিনা? সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে ইহজাগতিক; কিন্তু এর বহিরাবরণ ধর্মীয়। আর এই বহিরাবরণই প্রায়শ আমাদের প্রতারিত করে।"(২)

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলা যায় এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা বলতে যে বিষয়টি স্পষ্ট অর্থাত ধর্ম বা গোষ্ঠিগত সাম্প্রদায়িকতা সেটি আধুনিক ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের নয়। সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার সূচনা ও ইতিহাস একটু আগের হলেও এর উদাহরণ তৈরী হয়েছে বিংশ শতকের শুরু থেকে।

নথিবদ্ধ প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ১৮৯১ সালে কলকাতার উত্তরাঞ্চলে শ্যামবাজারে। এর কারণ ছিল মসজিদ বলে কথিত একটি বাড়ী ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। দাঙ্গায় অংশগ্রহনকারী ৫০০০ এর মত মানুষের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা মুসলমান তন্তুবায় শ্রেণীর। এ ঘটনার জের ধরেই শ্যামবাজারের চিৎপুর ও মেছুয়াবাজার নামে পরিচিত এলাকায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর পর ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য বঙ্গের পাটকল কেন্দ্র করে শ্রমিক মালিকদের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে। তবে এর মধ্যে ১৮৯৬ সালে কয়েকটি দাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে যা ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেকার দাঙ্গা।

১৮৭৪ সালে বোম্বাইয়ে জামা মসজিদ এলাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এ দাঙ্গার পর আবার হনুমান মন্দিরে আক্রমন কেন্দ্র করে ১৮৯৩ সালে হিন্দু-মুসলমান একটি দাঙ্গা হয় যাতে নিহতর সংখ্যা ছিল ৮০। এ বছরই আজমগর ও বিহারের পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্ব উত্তর প্রদেশে কোরবানীর ঈদ উপলক্ষ্যে ভয়াবহ রক্তপাত ঘটে। ইন্ডিয়ার স্ট্যাটুটারি কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৮৫ সালে লাহোর ও কর্ণাল, ১৮৮৬ সালে দিল্লী, ১৮৮৯ সালে ডেরাগজী খাঁ, ১৮৯১ সালে পালাকোড এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। তবে এর আগে ১৮১৬, ১৮৩৭, ১৮৫০, ১৮৭০ এবং ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাম নবমী ও মহরমের শোভাযাত্রা নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত কয়েকটি দাঙ্গার উদাহরণ সম্পর্কে জানা যায় এগুলো মুলত উত্তর ভারতের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এর পেছনে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি কাজ করেছে সেটি হিন্দি-উর্দু ভাষাকে কেন্দ্র করে তৈরি বিবাদ।

সবচেয়ে প্রাচীন যে দাঙ্গার খবর পাওয়া যায় সেটি ১৭২৯ সালে মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার সময় বাদশাহ মহম্মদ শাহের শাসন কেন্দ্র লালকেল্লার সামনে জামা মসজিদ এলাকায় ভয়াবহ এক দাঙ্গা। তবে এসবের কোন দাঙ্গাই শুধু ধর্মীয় গোড়া মনোভাবের কারণে সংঘটিত হয়নি বা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিতর জন্য না। এর পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণ। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্কেরও রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টান্ত।

হুসেন শাহ, পরালগ খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির সামন্তসভায় ও রোসাঙ্গেও রাজসভায় (১৪০০-১৬০০ এর মধ্যে) হিন্দু ও মুসলমান একসাথে সাহিত্য এবং কাব্যসাধনা করেছে। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনার বহু নজির রয়েছে, এমনকি নগর কেন্দ্রসমুহেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগেই গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নবদ্বীপের ন্যায়দর্শন, বৈষ্ণব পদাবলী, বাংলা কীর্তন প্রভৃতি রচিত ও প্রচারিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট যে রাজধর্ম সমাজ জীবনে চেপে বসেনি ও সংস্কৃতির স্বতঃস্ফুর্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়নি। সম্রাট বাবরের সময় বহু মসজিদের সাথে মন্দির তৈরীর ইতিহাস রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে হিন্দু রাজাদের রাজ্যসভায় মুসলমান কবি কিংবা মুসলমান রাজার আমলে হিন্দু মন্ত্রী বা রাজার কাছের মানুষ হওয়ার ইতিহাসও রয়েছে।

'নবাব বাবুদের নবকীর্তি' শীর্ষকে প্রকাশিত শ্রী জগচ্চন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র:- " বাঁশ বেড়িয়ার শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কিংকর গুণকার ও মতিলাল বাবু কাচরা পাড়ার পাঁচ ঘরা শাকিনে একজন পোদের ভবনে পরম সত্যনাম বেদিস্থাপন করিয়া প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক এক পংক্তিতে বসাইয়া অন্ন ব্যাঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছিলেন এবং প্রায় শতব্রাহ্মণ পিত্তলের থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তৎস্থানে ফিরিঙ্গিতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরআন পাঠ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ পন্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন...... ।" (৩) অমনি সম্ভাবনাপূর্ণ একটি মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবার সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে পুরনো দিনের পত্রিকায়।

একই পত্রিকার সেই সময়ের আরো একটি সম্প্রীতির সংবাদ

এর ঘটনাস্থল বিহারের পাটনা, উপলক্ষ্য আরজানি সাহেবের দরগায় পহেলা বৈশাখের মেলা যেখানে প্রায় এক লক্ষ ভক্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। সংবাদপত্রের খবর ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'কোন দাঙ্গা ও বিরোধাদি কিছু না হইয়া নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইয়াছে'। এ কথা অনুমান করা ভুল হবেনা যে এধরণের ধর্মাচরণ ও পারস্পরিক সহনশীলতার ঘটনা সেসময়ে আরো অনেক এবং সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটতো। কিন্তু সংবাদ পত্রে প্রকাশ করার রেওয়াজ তেমন ছিলনা। এখানে উল্লেখ করা সমসাময়িক সময়ের দুটি সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন দুটি উৎসবে দেখা যায় দু'সম্প্রদায়ের সহাবস্থান এতটাই সাধারণ ছিল যে তা খবরের কাগজে প্রকাশ হবার মত যথেষ্ট গুরুত্বও পেতনা। যে দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো তা আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছরের আগে যখন মানুষের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে গেলে ছিলইনা সে সময়ের সম্প্রীতির উদাহরণ। তাই বলে তখনকার মানুষ কোন অংশে কম ধর্মপ্রাণও ছিলেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেড়শ বছর আগের ধর্মপ্রাণ অল্প শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহনশীলতার যে শিক্ষা ছিল তা দেড়শ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাপ্তির সাথে সাথে একেবারেই কমে গেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দখল-রাজনীতির কৌশল যা মানুষের সম্প্রীতির মনোভাবকে পুরোপুরি করায়ত্ব করেছে।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান এক হয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈরী উন্মাদনা দেখা গেছে তেমনি আবার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু পরিবারের জীবন রক্ষা কিংবা হিন্দু বাড়িওয়ালা তার মুসলমান ভাড়াটিয়াকে বাঁচাতে হিন্দু সন্ত্রাসীদের হাতে জীবন দিয়েছেন এমন উদাহরণও কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

কাশ্মীরে হযরত বাল মসজিদ থেকে মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র কেশ চুরির ঘটনা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। সেখানে বিহারীদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষার জন্য মুসলমান কর্মিদের জীবন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। হিন্দুদের প্রাণ রক্ষার জন্য তৈরী শান্তি রক্ষা কমিটির বেশিরভাগ নেতা-কর্মি সদস্যই ছিল মুসলমান।

কিন্তু এ অঞ্চলে শাষণ করে যাওয়া, চেঙ্গিজ, মুঘল, পর্তুগীজদের চাইতেও ভয়াবহ ছিল ব্রিটিশরা। তবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা দখল করে অর্থনৈতিক ভাবে শোষণের উদ্দেশ্যে। তারা কোন প্রকার ন্যায়নীতির ধার ধারেনি। চেঙ্গিজ, তৈমুর, নাদির, মাহমুদ, হিটলার প্রমুখের চেয়েও ভয়াবহ ইষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানী কারণ শুধু লুন্ঠন বা ধ্বংস নয় স্থায়িভাবে দোহন ছিল তার উদ্দেশ্য। এবং স্বার্থ হাসিলের জন্যে ঔপনিবেশিক ইংরেজের পক্ষে যে কোন উপায় অবলম্বনই অসম্ভব ছিলনা। ধর্ম প্রচার তাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে এ দেশকে প্রজা বানিয়ে নিজেদের আরো আরো বেশি সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা ধর্মকে ব্যবহার করেছে। বিভেদ তৈরি করেছে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের। তাই ধর্মকে ব্যবহার করে অসাম্প্রদায়িকতার সূচনা আসলে ব্রিটিশরাই করেছে।

"যখন শিক্ষিত ও অগ্রসর হিন্দুসমাজের বিবেকমান মানুষের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী স্বজাত্যবোধের জন্ম নেয় তখন ভারসাম্য রক্ষার জন্য চতুর ইংরেজ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও রাজশক্তি হারানোর কারণে ইংরেজবিমুখ মুসলমানদের আনুগত্যলাভের বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠে। ইংরেজ এই কুটিল ভারসাম্যের মাধ্যমে একদিকে নিজের ক্ষমতা নিরাপদ করেছে ও অপরদিকে জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দুর্বল করেছে।" (৪)

সারা ভারতবর্ষে মুসলমান ছিল প্রথমত সংখ্যালঘু এবং দ্বিতীয়ত হিন্দুর তুলনায় অনগ্রসর, তাই তার ওপর সৃষ্ট মনস্তাত্বিক চাপের কারণে সে হয়ে ওঠে স্পর্শকাতর, সংশয়াচ্ছন্ন, শঙ্কাপ্রবন। ফলে পিছিয়ে পড়া স্থানীয় মুসলমান নিজের প্রতিদ্বন্দীরূপে গণ্য করে সর্ববিষয়ে প্রতিপক্ষরুপে খাড়া করল-জবরদখলকারী ও ভেদবুদ্ধির নায়ক ইংরেজকে নয়- প্রতিবেশী হিন্দুকে। বিদ্যাভিমানী জাত্যভিমানী বর্ণহিন্দুও প্রতিদ্বন্দিতায় মেতে ওঠে। এতে উভয় সমাজেই সাম্প্রদায়িক চেতনা পুষ্টি ও প্রতিপত্তি লাভ করে।

এবার আসা যাক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণের দিকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শত শত কারণ রয়েছে যার সবিস্তারে বর্ণনা আসলে সাধ্যাতীত। আমি মুল কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি। এতে বিংশ শতকে প্রশাসনিক কিছু দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যার ফলে সম্প্রদায়গত বিভেদ তৈরি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসব কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে এবং নতুন করে সূচনা হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দাঙ্গার কয়েকটি কারণ :

কোন দাঙ্গাই নির্দিষ্ট একটি কারণ থেকে হয়না। অনেক ক্ষোভ-বঞ্চনা জমা হলেই যে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ দাঙ্গায় রুপ নেয়। তেমনি বিংশ শতকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও শুধু মাত্র চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার মত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারনে সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে আরো বিস্তৃত কয়েকটি কারণ। যা একদিনের নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অসম ব্যবস্থার ফলে এক পর্যায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িকতা আর তা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যেমন ঃ

বঙ্গ-ভঙ্গ

বিংশ শতকের শুরুতে বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি অন্যতম কারণ। বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু-মুসলমান এই বিভেদ নীতি আরো চুড়ান্ত রুপ পায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরই ১৯০৭ সালে পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন স্থানে যেমন ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লায় ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। প্রশাসনিকভাবে ভাগ করে দেয়ায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আর সম্প্রীতির কোন আতাঁত থাকেনা। বিভেদের চিহ্ন যখন স্পষ্ট তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিহিংসা দীর্ঘ ও প্রতিশোধপরায়ন হয়ে উঠে। ১৯০৩ সালের প্রথম দিকে বাংলার ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার বঙ্গভঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা করেন। কার্জন এই পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি।

প্রথমত- বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত বিশাল প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রন। দ্বিতীয়ত- পূর্ববাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন করে মুসলমানদের জন্য চাকরি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত- বাঙ্গালি হিন্দু মধ্য শ্রেণীর সম্প্রসারণ ও ক্ষমতাকে খর্ব করা।

যে তিনটি উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ হয়েছিল তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সবচেয়ে কার্যকর। বঙ্গবিভাগের ফলে বাংলার বর্ণহিন্দুরা ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করে দেয়। কারণ, এতে তাদের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা প্রবল গণআন্দোলনের রুপ ধারণ করে। এর ফলে বিলাতি দ্রব্য বর্জন এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সূত্রপাত হয়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগ কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত শ্রেণীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। এদের উত্তরণের সাথে সাথে শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর বিকাশ ও বিবর্তন শুরু হয়। উনিশ শতকে হিন্দু মানসে যে নব জাগরণ ঘটেছিল তারই মুসলমান সংস্করণ দেখা যায় বিশ শতকের প্রথম দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু উনিশ শতকের হিন্দু নবজাগরণের তুলনায় বিশ শতকের মুসলমান নব জাগরণ অনেক কম হিন্দু বিদ্বেষী। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জোরদার এবং সংগঠিত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মধ্যশ্রেণীর এবং কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের একটা তরঙ্গ প্রথমবারের মত প্রবলভাবে বঙ্গদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে । রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধর্মের ব্যবহার হিন্দু মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই যেন রীতিসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এরই জের হিসাবে ১৯০৬ সালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ দিনের হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি অবস্থানে যেন মুসলমানদের ভিন্ন দল গঠন থেকে শুরু হলো বিভেদের প্রকট দৃষ্টান্ত।

"বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের পরপরই বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলন, অন্যটি গোপন বিপ্লববাদী তৎপরতা। ঢাকা ছিল বিপ্লববাদী কার্যক্রমের একটি প্রধান কেন্দ্র। যার নীতি নির্ধারন করতেন পুলিন দাস, প্রতুল গাঙ্গুলি প্রমুখ ব্যক্তি। " (৫)

বঙ্গভঙ্গর ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন " মানুষের সাথে মানুষের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তাকে স্বীকার করার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখিনি। সেই কারণেই আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খন্ড খন্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারিনি।" (৬)

অন্য যায়গায় বলেছেন

"বঙ্গ বিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখন্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।...হিন্দু-মুসলমানদের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।" (৭)

এ হলো বাংলা ভাগ হওয়ায় পরিণতির কথা আর ভাগ করার কারন হিসেবে বঙ্গভঙ্গের প্রধান স্থপতি রিজলী লিখেছিলেন-

"ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি। বিভক্ত বাংলা যা নয়-- আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য একে বিভক্ত করা এবং এভাবে আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের দুর্বল করে তোলা।"(৮)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাত পরবর্তিতে ১৯৪৭ সালে যে দ্বিজাতী তত্ত্বের প্রয়োগ যে সফল করা হয়েছিল ১৯০৫ সালে তারই একটি মহড়া দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। বিভক্ত করে দুর্বল করা ও সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়ার মহড়া।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ড বিধি অনুসারে কঠোর শাস্তির বিধান থাকলেও ভারত উপমহাদেশে অসংখ্যক দাঙ্গার পর যে স্বল্প সংখ্যক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়া শুরু করে তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত নামমাত্র ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়েছে । আর এ ধারা শুধু ব্রিটিশ আমলে নয় এখন পর্যন্ত চলে আসছে বরং দিন দিন বাড়ছে। এমনকি বহু সংখ্যক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রায়ে যাদের দোষি সাব্যস্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই শাস্তি পেয়েছে। এই চিত্র শুধু আমাদের দেশে নয় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক ব্যর্থতার এই একই চেহাড়া। প্রশাসনিক ব্যর্থতার এই নিদর্শনের পেছনে নেতৃত্বের রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব, বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

প্রশাসনিক পদে নিয়োগ পাবার ব্যাপারে গান্ধীজির বক্তব্য ছিল নিম্নরুপ।

" সরকারি বিভাগ সমুহে চাকরি পাবার ব্যাপারে আমার অভিমত এই যে সেখানে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রবর্তন করলে তা দক্ষ প্রশাষনের পক্ষে মারাত্মক হবে। কারণ প্রশাষনকে দক্ষ হতে হলে তা যোগ্যতমের হাতে থাকা চাই। অবশ্যই তা কোনরকম পক্ষপাত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ৫ জন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হলে এক একটি সম্প্রদায় থেকে এক একজন করে নয়, যোগ্যতম ৫ জনকেই নিতে হবে তা তাদের সবকয়জন মুসলমান বা পার্শী হলেও। নিচের দিকের পদে ভর্তি করার সময়ে প্রয়োজনে নিরপেক্ষ পরীক্ষকদের দ্বারা গঠিত কোন বোর্ডের দ্বারা তা করা যেতে পারে এবং তাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য থাকতে পারেন। কিন্তু পদের সংখ্যা কদাচ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত করা উচিত নয়। শিক্ষায় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সমুহের জাতীয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাবার অধিকার থাকবে। এ সুবিধা কার্যকরীভাবে পেতে অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু দেশের সরকারের অধীনে যাঁরা দায়িত্বশীল পদ পেতে চান, প্রয়োজনীয় যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবার পরই তাঁরা তা পাবার আশা করতে পারেন। "(৯)

এত গেল প্রশাসনিক পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিষয়ে জটিলতার কথা এবার একটি চড়মপন্থী দলের সাথে প্রশাসন কিভাবে জড়িত থাকে তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যেতে পারে একটি ইসলামী চড়মপন্থী দলের উত্থান ও বর্তমান অবস্থা দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

"দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় জঙ্গিগোষ্ঠী এলইটির কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯০ সালে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার নাম হাফিজ মোহাম্মদ সাইদ। অবশ্য আশির দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গঠিত আফগান সার্ভিসেস ব্যুরো থেকেই এলইটির উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী সরে গেলে এলইটির সদস্যরা তাজিকিস্তান ও বসনিয়ার গৃহযুদ্ধে অংশ নেয়। কিন্তু কাশ্মীর রক্ষার লড়াইয়ে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের আহ্বানে তারা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। অভিযোগ রয়েছে, ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে লড়াই করতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) সরাসরি সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছে এলইটিকে। এলইটির মুল ঘাটি এখন লাহোরের কাছে মুরিদকে এলাকায়। সেখানে পাকিস্তান সরকার এলইটিকে ৭৭ হেক্টর জমি দান করেছে। এ ছাড়া পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে দলটির বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে বলেও দাবি ভারতীয় গোয়েন্দাদের।"(১০).

এ সংবাদের সাথে ছবি ছাপা হয়েছিল লস্কর-ই-তাইয়েবা প্রধান মোহাম্মদ সাইদের। ক্যাপশন ঃ হাফিজ সাঈদ ঃ লস্কর-ই-তাইয়েবার প্রধানকে আটকে রাখতে পারেনি পাকিস্তান।

প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলে আইন কতখানি লঙ্ঘন করা হতে পারে এমনকি তাতে কোন জবাব দিহিতারও প্রয়োজন হয়না এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ মনে হয় ২ মে ২০১১ পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদে আল কায়দা শীর্ষ নেতা লাদেনকে হত্যার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হামলা। যুক্তরাষ্ট্র কোন অনুমতি ছাড়াই পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করেছে। এবং এ বিষয়ে তাদের কাছে কারণ জানতে চাইলে এর সদুত্তর হিসেবে তারা পাকিস্তান প্রশাসণের জঙ্গি দমনে এবং ওসামা বিন লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার বিষয়ে ব্যর্থতার কথাই বলেছে। যদিও এটি সম্পূর্ন আন্তর্জাতিক আকাশসীমা আইন বিরোধী ঘটনা এবং যুক্তরাষ্ট্র নিজের ইচ্ছে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আফগানিস্থান, ইরাকেও এই অযুহাত দেখিয়ে নিয়ম বহির্ভূত আচরণ করছে তারপরও এখানে পাক প্রশাসণের ব্যর্থতার দায় অস্বীকার করার উপায় নেই। কয়েক বছর লাদেন ওই অঞ্চলে পরিবার নিয়ে বসবাস করার পরও পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসএস সেটি জানতোনা এটি তাদের ব্যর্থতা। আর যদি যেনে থেকেও তা প্রকাশ না করে তাহলে চড়মপন্থীদের সাহায্য করার প্রমান স্পষ্ট। যেভাবেই দেখা হোক না কেন ওসামা বিন লাদেনের পাকিস্তানে অবস্থান সেদেশের সরকারের ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। এ ব্যর্থতার কারণে বিশ্ব দেখলো যুক্তরাষ্ট্র যে কোন মুহূর্তে পাকিস্তানের স্বার্বভৌমত্বকে অবজ্ঞা করতে পারে।

পাকিস্তান ভিত্তিক চড়মপন্থী দল শুধু আল কায়দা ও তালেবানরাই নয় এভাবে জয়স ই মুহম্মদ ভারতের আর এসএস, বিজেপি, জনসংঘ সংহতি বাংলাদেশের শিবির, আল্লাহর দলের মত কট্টোর মনোভাবের নেতা-কর্মী এবং দল ও প্রশাসনের মদদ পেয়ে থাকে। প্রয়োজনে সরকার তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারও করে। একটি দেশের মধ্যে কোন জঙ্গি সংগঠন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তাকে প্রতিহত করা সম্ভব নয় এটি আসলে এক প্রকার অবিশ্বাস্য কথা। সরকারই তার প্রয়োজনে এ ধরনের ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন চড়মপন্থি দলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে। কখনো কখনো তাদের নৈরাজকতা সৃষ্টির সুযোগও তৈরি করে দেয়। তবে আমি এখানে ধর্মীয় চড়মপন্থী দলের কথা উল্লেখ করেছি। শ্রেণী বৈষম্য বা সামাজিকতায়, জনসংখ্যায়, উদ্বাস্তু হয়ে আসা জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে অধিকার আদায়ের জন্য তৈরি চড়মপন্থী সংগঠনের উদাহরন টানছিনা।

চড়মপন্থি দলগুলোর সহিংসতার সময় প্রশাসণের ইন্ধন দেয়ার একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সময় প্রশাসনের নির্বিকার আচরণ।

“ Junagadh (Gujarat): The analysis of the role of police officials involved in law and order management during 2002 Gujarat riots and afterwards, throws interesting and yet shocking facts to the fore. The cops belonging to dalit and backward communities had joined hands with their political bosses to commit heinous crimes against Muslims. On the contrary the upper caste Hindus, particularly Brahmins, resisted the unconstitutional orders of the contemporary BJP government and went out of their way to help Muslims. In fact among the police officers who exposed the “role and conduct” of Chief Minister Narendra Modi and others during the riots, most belong to upper caste.

The prominent among those who displayed their hostility towards Muslims and struck terror by targeting Muslims and killing them in fake encounters include IPS officials DG Vanzara, Rajkumar Pandian and Dinesh MN as well as N K Amin, a Gujarat Police Service(GPS) official. Vanzara, Pandian, Dinesh and Amin were all involved in fake encounter of Sohrabuddin Sheikh and others. Vanzara leading the team, in every encounter, told the media that those killed in the ‘encounter’ were Lashkar-

Dhaka University Institutional Repository

e-Toiba operatives and on a mission to kill Modi and VHP leader Pravin Togadia.

Vanzara hails from the most backward communities of the state and his education was financed by Muslims of his native village (Illol).

Deputy Superintendent of Police, Nobel Parmar who is a dalit-convert-Christian, investigated the Godhra train burning incident and booked large number of innocent Muslims including Maulana Hussain Umarji. As a reward for his services, he was later on promoted as Superintendent of Police and also given two extensions after retirement. But the upper caste police officials who resisted unconstitutional orders against Muslims had to "pay" the price for their "disobedience." (১১).

এরপর প্রশাসণের পক্ষ থেকে রয়েছে জঙ্গিদের শনাক্ত করা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জটিলতা। অনেক ক্ষেত্রেই মুল হোতা ধরা পড়েননা। ধরা পড়ে শিষ্য কিংবা সদ্য দলে যোগ দেয়া আনাড়ী সদস্যরা। আর পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করেই তার দায়িত্বের সমাপ্তি টানেন। দলের মাথা পর্যন্ত পুলিশের দৌড়ে আর কুলায়না। আবার যাদের ধরা হয় তাদের পরিচয়, ঠিকানা নিয়েও রয়েছে নানা রকম বিপত্তি। খোদ বাংলাদেশেই এমন অনেক চড়মপন্থিকে আটক করা হয়েছে যাদের বিচার-শাস্তির কোনো ফলোআপ নেই। আটকের দুদিন পর্যন্ত জনগনের উৎসাহ থাকে তারপর সবাই ভুলে যায় প্রশাসন ভুলে আরও আগে।

"বাংলাদেশে আটক বিদেশী জঙ্গিদের মামলা নিয়ে বিপাকে পুলিশ। স্থায়ী ঠিকানা না থাকার কারণে মামলা নিস্পত্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাওয়া হলেও স্থায়ী ঠিকানা মিলছেনা এসব জঙ্গীদের। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির হাতে গ্রেফতার প্রায় দুই ডজন বিদেশী জঙ্গি দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি। আইনগত নানা জটিলতার কারণে বছরের পর বছর বিচার ছাড়াই বন্দী রয়েছে এসব জঙ্গীরা। বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার বিদেশী এসব জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পুলিশ ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা করে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাসপোর্ট ও ডলার জালিয়াতির মামলা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয় বিদেশী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। দেশের ভেতরে জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও সন্ত্রাস বিরোধী আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়নি। এই আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র বাংলাদেশে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান রয়েছে। গোয়েন্দারা জানায়, পুলিশ সদর দপ্তরের মাধ্যমে ইন্টারপোলের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট দেশে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, তাদের দেয়া অধিকাংশ ঠিকানাই ভুল। গোয়েন্দারা জানান, একজন আসামীর স্থায়ী ঠিকানা ছাড়া তার বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া যায়না। তাই স্থায়ী ঠিকানার অভাবে বিদেশী জঙ্গিদের মামলা নিস্পত্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। গোয়েন্দারা আরও জানায় পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই তৈয়বা ও ভারতের বিচ্ছিন্নতা বাদী সংগঠন উলফার একাধিক সদস্যের স্থায়ী ঠিকানায় গিয়ে তাদের দেশের পুলিশ কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। ”(১২) .

প্রশাসনে লোক নিয়োগে অনিয়ম থেকে শুরু করে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় ব্যর্থতা, উসকানি মুলক আচরণ এবং চড়ুমপন্থীদের আটক করতে না পারা কিংবা আটক করলেও তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার ব্যর্থতা এসবই প্রশাসনিক দুর্বলতা। প্রশাসনিক দুর্বলতাই অনেক সময় সংঘর্ষ বা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে বাড়িয়ে দাঙ্গার রুপ দেয়।

সংবিধান জটিলতা

গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন। তাই সংবিধানে উল্লেখ সাম্প্রদায়িক বিষয়ের গুরুত্ব কতখানি সেটি বলার অপেক্ষা থাকেনা। আর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানের ক্রটিপূর্ণ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা যথেষ্টই রয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গঠিত সংবিধানে দেশকে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে সংশোধনের পর সংশোধন আরোপ বিশেষ করে দেশকে সাম্প্রদায়িক করে তোলার যে জোড়- তোড় চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তাতে করে ধর্ম নিরপেক্ষ কাগজে কলমে দাবি করলেও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

“জিয়াউর রহমানের শাসনকাল চমক, রহস্যময়তা ও অভিনবত্বে ভরপুর। তিনি তার শাসনপর্বের প্রথমভাগে রাষ্ট্রশাসন ও রাজনীতিতে চমক সৃষ্টির চেষ্টা চালান। সংবিধান সংশোধন করে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকদের বাংলাদেশি রুপে পরিচিত করেন, সংবিধানের মূল চার নীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে সংবিধানের শুরুতে ‘ বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম’ যুক্ত করেন এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনের বৈধতা প্রদান করেন।”(১৩).

এরপর ১৯৮১ সালে এরশাদ ক্ষমতায় যেয়ে এই পথকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে যুক্ত করেছেন ইসলামকে।

Dhaka University Institutional Repository

"রাষ্ট্রের পশ্চিমী ধারনার উদার দিকগুলো খর্বিত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের চরিত্র প্রদান করা হয় এবং সংবিধানের প্রস্তাবনার সূচনায় ' বিসমিল্লাহ' সংযোজন করা হয়। সর্বজনের অধিকার স্বীকৃতির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র সেখানে একটি ধর্মের প্রাধান্যকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে পাল্টানো হয় রাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক চরিত্র। এর জের হিসেবে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করে এবং সমাজকে পশ্চাৎমুখী ও হিংসাত্মক দ্বন্দে আকীর্ণ করে তোলে। পরবর্তীকালে একই ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয় রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের ধারণা।"(১৪).

এত গেল বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার নমুনা। তবে শুধু ধর্ম নয় শ্রেণীগত ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ কিছু বৈষম্য যা থেকে তৈরি হচ্ছে আরেক রকম সাম্প্রদায়িকতা।

যেমন সংসদে সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে। বর্তমানে সংরক্ষিত আসন পূরণ করা হয় মূলত দলীয় মনোনয়নের ভিত্তিতে-এক্ষেত্রে নির্বাচনের কোনো অবকাশ থাকেনা। এ ধরনের পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনের নারীরা অলঙ্কার হিসেবেই বিবেচিত হয়। তাই নারীর সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য এ পদ্ধতি উপযোগি নয়। তারপরও যে পদ্ধতি রয়েছে সংরক্ষিত আসনের জন্য তা নবম সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর পর নারীদের তাহলে রাজনীতিতে অংশগ্রহনের সুযোগ কিভাবে থাকবে?

"আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে বাংলাই শুধু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও তাদের অধিকারের বিষয়টি আমাদের সংবিধানে উপেক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধনীগুলোর মাধ্যমেও এ উপেক্ষার অবসান ঘটানো হয়নি। তাই ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তা ও তাদের ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি সংশোধনী প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করারও অনুরোধ জানানো হচ্ছে।"(১৫).

" ভাষার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, নারী রাজনীতিসহ অসংখ্য ধরণের বৈষম্য রয়েছে আমাদের সংবিধানে। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি প্রয়োগের ব্যর্থতা। সংবিধান শুধু প্রয়োগেই নয় সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকেরা। একই সাথে তারা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের দাবি তুললেও কেউ কেউ এর পক্ষেও কথা বলেছেন। সংসদ ভবনে আজ সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটির সাথে বৈঠকে অংশ নেয়া আমন্ত্রিত ১৯ জন নাগরিকের অধিকাংশই এসব মতামত দেন। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সাবেক বিচারপতি, আইন ও সংবিধান বিষেশজ্ঞদের মতামত শোনার পর সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটি এবার তাদের বৈঠকে আমন্ত্রন জানায় দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের। বৈঠকে আমন্ত্রিত প্রায় সবাই, রাষ্ট্রের চার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু সংবিধানের না রাখার পক্ষে জোরালো মত দেন। তবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থাকবে কিনা, এনিয়ে বিশিষ্টজনদের বক্তব্যে মতভেদ ছিলো। এছাড়াও বৈঠকে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বীক জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি, নারীর ক্ষমতায়ন, নাগরিকের মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য, ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যদের ভোটদানের ক্ষমতা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিসহ বেশকিছু বিষয়ে মতামত শোনা হয়। বুধবার জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকদের সাথে বৈঠক করবে কমিটি। আইন প্রণয়ন করতেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি।" (১৬).

" রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকরা। সকালে সংসদ ভবনে মন্ত্রীসভা কক্ষে সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটির সাথে বৈঠকে সম্পাদকরা এ পরামর্শ দেন। একই সাথে তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করারও পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ কমিটির চেয়ারপারসন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান, ডেইলি স্টারের মাহফুজ আনাম, সমকালের গোলাম সরওয়ার, কালের কন্ঠের আবেদ খান, নিউজ টু'ডের রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ডেইলি সানের সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, আমার দেশের মাহমুদুর রহমান, ইনকিলাবের এ.এম.এম. বাহাউদ্দিন, ফিন্যানন্সিয়াল এক্সপ্রেসের মোয়াজ্জেম হোসেন, জনকন্ঠের আতিক উল্লাহ খান মাসুদ, নয়া দিগন্তের আলমগীর মহিউদ্দিন, আমাদের সময়ের নাইমুল ইসলাম খান ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের শাহজাহান সরদার। অন্যদিকে, উপস্থিত ছিলেন সংসদীয় বিশেষ কমিটির কো-চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও সদস্যরা।"(১৭).

ভারতের শাষণতন্ত্র রচিত হয়েছে ১৯৫০ সালে। ঐ বছর সারা ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

সংবিধানে সেক্যুলারিজমের কথা থাকলেও প্রত্যেক সরকারের ভেতর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে তৈরী হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। আবার নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারও সংবিধান স্থগিত করে অবমাননা করছে এর নিয়ম। যেমন ১৯৭৫ সালে ভারতের তৎকালিন ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস সংবিধান স্থগিত করে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল।

"স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু প্রথম যে কাজগুলো হাতে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে বর্ণপ্রথার বিলোপ ছিল অন্যতম। সব সরকারি নথিপত্র, দলিল ও দরখাস্তে বর্ণ চিহ্নিত করার কলামটি মুছে দেয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কল্পনাও করতে পারেননি, স্বাধীনতার ৬২ বছর পর স্বাধীন দেশের সার্বভৌম সংসদ ব্রিটিশ যুগের সেই কলঙ্ক আবার ফিরিয়ে আনবে। পরিহাস আরকি যে কংগ্রেস দল ব্রিটিশদের তারিয়ে ছিল তারাই আবার ব্রিটিশদের চালু করা বর্ণবাদি নিয়মটি ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিল। গত সপ্তাহে ঘোষণা করা হয়েছে, আগামী বছরের

Dhaka University Institutional Repository

আদমশুমারির ফরমে যার যার বর্ণ চিহ্নিত করার একটি ঘর থাকবে। ভারতের সংবিধানে তফসিল সম্প্রদায় ও উপজাতীয় ছাড়া আর কোনো সামাজিক গোষ্ঠীকে স্বীকার করা হয়না।"(১৮).

এদিকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত পাকিস্তানের সংবিধান নিয়ে রয়েছে নানা রকম সংকট। এ পর্যন্ত মোট ৮ বার সংশোধন হয়েছে দেশটির সংবিধান। প্রেসিডেন্ট ইউসুফ আলী জারদারী ক্ষমতা গ্রহনের পর গৃহিত অষ্টম সংশোধনীতে আনা হয়েছে অসংখ্য পরিবর্তন। এর মধ্যে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি একটি শুভ দিক নিসন্দেহে তবে এখনও সংবিধানে মতামত প্রকাশের পরাধীনতা, সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকার অনিশ্চিত। সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্বীকৃতির কথা বলা হলেও প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এই নিয়মটি ফিরিয়ে এনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নীতিগতভাবে পাশ করে নিয়েছে পাকিস্তান।

" ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্বীকৃতির কথা বলা হলেও প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। সংবিধানে এটি ফিরিয়ে এনে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা হয়েছে সংবিধান।"(১৯). এছাড়া পাকিস্তানে রয়েছে ব্লাসফেমীর মত বিতর্কিত একটি আইন। যেটি কোনভাবেই সংবিধান এবং মানবাধিকারকে সমর্থন করেনা, এমনকি ইসলাম পরিপন্থীও বটে।

"PTI has condemned the attempt of the PPP government to make political capital out of the unfortunate case of Aasia Bibi. . Mr. Khan termed blasphemy law (Section 295-C of PPC), which has been misused over the years to unfairly target minorities, against the spirit of Islam and Constitution of Pakistan. He said that teachings of Islam are very clear on standards of justice being equal for Muslims and non-Muslims. It is about time that religious scholars, minority leaders and political parties should sit together and amend this law with consensus and save the poor victims from the agony and suffering caused to them due to the misuse of the law." (20).

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম উল্লেখ করে দেয়া, ভারতে আদমশুমারীতে বর্ণ প্রথা উল্লেখের নিয়ম সংযোজন কিংবা পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর অবশ্যই মুসলমান হওয়ার বাধ্যবাধকতা এসবই সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। তাই একটি দেশের সর্বোচ্চ আইনের মধ্যেই যখন সাম্প্রদায়িকতার বীজ অনুমোদন করে দেয়া থাকে তখন রাষ্ট্র এই উষ্মা থেকে কতটা দুরে থাকতে পারে! জনগণ ইচ্ছে করলেওত সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হতে পারেনা।

এখন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলার পরও যদি বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দুদের সংবিধান পড়তে যেয়ে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলতে হয় তাহলে এদেশের মুসলমান আইন প্রণেতাদেরও ভাবা

Dhaka University Institutional Repository

উচিত যদি ভারতে সংবিধানের জন্য এমন কোন শ্লোক বা গীতার অংশ নির্ধারণ করা হয় তাহলে মুসলমানদের জন্য সেটি কেমন কঠিন হয়ে দাড়াবে ? কিংবা ভারতের বর্ণবাদের বিষয়টি ধরা যাক।

সংবিধানের এসব বিতর্কিত বিষয় থেকেই সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়। শ্রেণীগত বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য থেকেও শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। শান্তি চুক্তির পরও এর যথাযথ প্রয়োগ এবং অধিকারের কথা সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত না হওয়ায় এ দেশে আদিবাসীদের স্বীকৃতি প্রদান নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি চলছে কয়েক যুগ ধরে। ২০১০ সালে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে ঘটে যাওয়া সহিংসতা তার সর্বশেষ উদাহরণ।

অর্থনীতি

দাঙ্গার অন্তরালে যে সব বিষয়গুলো কারণ হিসেবে কাজ করে তার মধ্যে বোধহয় অর্থনীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয়ই আসলে অর্থনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এখানে এর কয়েকটি দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণী বৈষম্য তৈরী হলে দাঙ্গার কারণ হতে পারে। এক সম্প্রদায় অপেক্ষা অন্য সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করলে দাঙ্গা হতে পারে। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নয়নের পরেই আসে ক্ষমতায়ন। স্বাভাবিকভাবে স্বাবলম্বী বা বাণিজ্য সম্প্রসারিত হলে মানুষ কর্তৃত্বের আশা করে আর তখন যোগ হয় রাজনৈতিক বলয়। সেক্ষেত্রে দাঙ্গার সূত্রপাত হতে পারে।

ভারতের ৯০ দশকের বেশিরভাগ দাঙ্গাই সংঘটিত হয়েছে অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে যেমন ' পশ্চিম উত্তর প্রদেশের একটি ছোট শহর খুর্জাতে ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে ও ৯১ এর ফেব্রুয়ারীতে যে ভয়ানক দাঙ্গা হয় প্রথম দৃষ্টিতে তা অযোধ্যার বিষয়কে কেন্দ্র করে মনে হলেও বিভিন্ন তদন্তে প্রমানিত হয়েছে সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রয়োজন মেটাতেই দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা করে ওই দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

এর অনেক আগে থেকে শেরশাহের আমলে খুর্জা ছিল কর্মচঞ্চল এলাকা। শেরশাহ রোডের জন্য প্রসিদ্ধ অঞ্চল এটি। দুরদুরান্ত থেকে মানুষ আসতো বেচাঁ কেনার জন্য। মুলত শষ্য কেনাবেচাঁই বেশি হতো এ এলাকায়। এর সাথে ছিল মাটির বাসন কোসনের কাজ। আর মৃৎপাত্রের জন্য যে মোঘলি কাজ করা হতো তার জন্য যথেষ্ট খ্যাতিও লাভ করে এ অঞ্চল। তিন পুরুষ ধরে মৃৎ শিল্পিরা এখানে জড়িত ছিলেন এ পেশার সাথে। ফলে গড়ে উঠে মৃৎ শিল্পের কারখানা। একই সাথে কারখানার সাথে যুক্ত রয়েছে কয়লা আমদানির বিষয়টি। আর কয়লা বাজারের সাথে জড়িয়ে পরে অনেকের স্বার্থ। শুরু হয় মৃত শিল্প কারা বাজারে বিক্রি করবে ? কারা দাম নির্ধারণ করবে ? কি পরিমান বাসনে কোসন বিক্রি হবে ? কয়লার দাম কিভাবে নির্ধারিত হবে এসব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রতিযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

খুর্জা সবুজ বিপ্লবের সাথেও যুক্ত। পশ্চিম উত্তর প্রদেশের এই অঞ্চল একদিকে কৃষি শ্রম শিল্পের রুপ পায় অন্য দিকে ক্ষুদ্র শিল্পর ফলে দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে বাণিজ্যের। উদ্ভব হয় অল্প পুজিঁর ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের নিজেদের নিয়োজিত ব্যবসায়ী। এই শ্রেণী ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকদের ভিত্তি। অথচ শহরের ৩০-৪০ ভাগই ছিল মুসলমান। আর সে সময় জনসাধারনের আগ্রহ ছিল কংগ্রেস অথবা জনতা দলের প্রতি। শুরু হয় অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিভেদ।

এ ধরনের উদাহরণ ভারতের ভিওয়ানডি, ভাগলপুরসহ বিভিন্ন দাঙ্গার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এ উদাহরণ বাংলাদেশের দুটি বন্দর অঞ্চল চট্টগ্রাম ও খুলনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব অঞ্চলে বাণিজ্যিক সু-ব্যবস্থার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতই সংখ্যালঘুদের আর্থিক অবস্থান ফলে সমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব। তাই ১৯৫০, ১৯৬৪ বা ভারতে বাবরী মসজিদ ঘটনার পর এসব এলাকাতেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের হার দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি। মুলত অর্থনীতিইত নিয়ন্ত্রন করে ক্ষমতা তাই একে কেন্দ্র করেই সাম্প্রদায়িকতার শ্রেণী বিন্যাস। এ উদাহরণ শুধু আজকের নয়। সাম্প্রদায়িকতার সূচনা থেকেই তার সাথে অর্থনৈতিক বিষয়টি জড়িত।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ঃ

সরকারের ভেতর যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকে তবে সে রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানেরত হাজার হাজার নজির রয়েছেই আমরা নিজেদের দেশেরই কয়েকটি ঘটনা দিয়ে এর উদাহরণ টানতে পারি।

২৫ এপ্রিল ২০১১ কালের কণ্ঠ পত্রিকার হেড লাইন ছিল ' বিএনপি-জামায়াত নেতারা সংখ্যালঘু নির্যাতন করেন। শিরোণামে সংবাদটির কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি।

"বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতার প্রত্যক্ষ মদদে ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনা ঘটে। ওই সব ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় এবং তখনকার বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতনের মদদদাতা হিসেবে কমিশন বিএনপি-জামায়াত জোটের বেশ কয়েকজন নেতার নামও উল্লেখ করেছেন। প্রতিবেদনে বিএনপি-জামায়াত জোটের ১৮ হাজার নেতা-কর্মীকে ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার মদদদাতা হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে সহিংসতায় অংশ নেন। কমিশন ২০০১ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনা আমলে নিয়েছে। কমিশনের হাতে ৫৫৭১ টি অভিযোগ রয়েছে। এ সবের মধ্যে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ৩৫৫টি, ধর্ষণসহ গুরুতর আঘাতের ঘটনা ছিল ৩২৭০টি। কমিশন তদন্ত করেছে

Dhaka University Institutional Repository

৩৬২৫ টি ঘটনা।" (২১). ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিক নেতা-কর্মীদের উপর চরম নিপীড়ন চালানো হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এসব সহিংসতায় চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছিল বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা।

"২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর নরক নেমে এসেছিল দেশের অনেক ষংখ্যালঘু পরিবারের নারীর জীবনে। কেবল নারীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন নয়, বিজয়গর্ব আর প্রতিশোধপরায়নতায় মত্তরা নির্বাচনের পর দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের শত শত ঘটনা ঘটিয়েছিল। সংখ্যালঘুদের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল বিভিষিকাময় এক পরিস্থিতি।"(২২)

আবার একই সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

১২ই মে ২০১১ সালে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার ফতোয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে "রামপুরা টিভি ভবনের পশ্চিম পাশে ও ব্রিজ সংলগ্ন শত বর্ষের পুরাতণ শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর মন্দির এবং দুই শতাধিক হিন্দু পরিবারের বসতবাড়ি হাতিরঝিল প্রশস্ত করার নামে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়ার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার এক বিবৃতিতে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, রামপুরা টিভি ভবনের পশ্চিম পাশে ও ব্রিজ সংলগ্ন শত বর্ষের পুরাতন শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর মন্দির এবং দুই শতাধিক হিন্দু পরিবারের বসতবাড়ি ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার হাতিরঝিল প্রকল্পের রাস্তা প্রশস্ত করার নামে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিয়ে দুঃশাসনের আরেকটি ন্যাক্কারজনক নজির স্থাপন করেছে। এতে করে বর্তমান সরকার ৭২-৭৫ সালে তৎকালীন আওয়ামী বাকশালী সরকার কর্তৃক শ্রী শ্রী কমলা কালি মন্দির ধ্বংসের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অথচ বর্তমান সরকার মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বললেও নিজেদের স্বার্থে চরম ফ্যাসিবাদী আচরণ করে তারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের মানুষের উপর পাশবিকতা ও নির্মমতা চালাতে কখনোই দ্বিধা করেনা।"(২৩) তবে সরকারের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব শুধু এখন নয়। এর ইতিহাস বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকেই বলা চলে। "মুজিব শাসনামলের শুরুতেই ভারত বিরোধীতার নামে সাম্প্রদায়িক শক্তি জোট বাধতে শুরু করে। একদিকে জামায়াত ও মুসলীম লীগ, অন্যদিকে ভাসানী ন্যাপ ও পিকিংপন্থী বামগোষ্ঠী।"(২৪)" মুজিব শাসনামলের শুরু থেকেই কিছু কিছু পত্রিকার কণ্ঠে চড়া সুর ধ্বনিত হতে শুরু করে। কখনো কখনো তা ছিল উস্কানিমুলক, শালীনতা বহির্ভূত এবং রাষ্ট্র ও জনস্বার্থ বিরোধী।"(২৫)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যায় নির্মিত সাড়ে চারশ বছরের বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার ঘটনায় ভারত সরকার যে চরমতম সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ করেছে সেটি তৎকালিন ভারত সরকারের মনোভাব প্রকাশ করতেই যথেষ্ট। ইতিহাসে ভারত সরকারের সেই সাম্প্রদায়িক আচরণের প্রমান নির্ধারণ হয়ে গেছে। শুধু আদভানী নয় কংগ্রেস সরকারও এর সমান সমর্থক। "বিজেপি ও এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সবচেয়ে দৃঢ় মিত্র শিবসেনা। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে যে দাঙ্গার ওপর শ্রীকৃষ্ণা কমিশনের প্রতিবেদনে শিবসেনাপ্রধান বাল ঠাকরেকে অভিযুক্ত করা হয়। এই প্রতিবেদনটি কংগ্রেস সরকার হিমাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে।"(২৬) তবে এর ফলে আশে পাশের দেশের সরকারের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা চরম ভাবেই দেখা গেছে। বাংলাদেশে বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দেয়ার পর কতটা আতংক ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে আমি তা অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পাকিস্তানেও এর প্রভাব ছিল ভয়ানক। " ১৯৯২ সালে উগ্রবাদী হিন্দু গ্রুপগলো বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পর ভারত রক্তাক্ত হয়েছিল। তখন পাকিস্তানেও মন্দির পুড়েছিল।"(২৭)

পারস্পরিক সহনশীলতার অভাব

দাঙ্গার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক কারণ আছে যেগুলোর তালিকা রচনা করা সম্ভব নয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ পারস্পরিক সদ্ভাব ও সহনশীলতার অভাব। এই মূল কারণই অপর বহু তাতক্ষণিক কারণে ও পেছনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকে। দেখা যায় ছেলে- ছেলে ঘুড়ি উড়ানো বা লাটু ঘোড়ানোর মত নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ঝগড়া হয়, বিবাদমান বালকরা একই সম্প্রদায়ের হলে বড় রকমের কোন সংঘর্ষ ঘটেনা কিন্তু যদি একপক্ষ হিন্দু আর অপর পক্ষ মুসলমান হয় অথবা উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণের তফাত থাকে তাহলে এই তুচ্ছ ঘটনাটি আর তুচ্ছ না থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রুপ নেয়। বাংলাদেশের ঢাকায় আর ভারতের লক্ষ্ণৌতে এরকম তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। এ গেল ছোট ঘটনার উদাহরন আর যদি অতি অবাঞ্চিত ধর্ষণের মত সামাজিক দুর্ঘটনা ঘটে এবং তা যদি হয় ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তবে তা দাঙ্গা হতে পারে কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় যে একই সম্প্রদায়ের কারনে নিজেদের মধ্যে বিচার মিমাংসা হয়ে যায় তা আর দাঙ্গায় রুপ নেয়না। এমনকি রিকশা যাত্রী ও চালকের মধ্যে ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি হয় এবং দুজন যদি হয় ভিন্ন সম্প্রদায়ের তাহলেও দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। পৃথক সম্প্রদায়ের ছেলে- মেয়ের মধ্যে প্রণয়ের সর্ম্পকেও সাম্প্রদায়িকতা দেখা যায়। এর সবচেয়ে বেশি উদাহরন ভারতের কয়েকটি ঘটনা।

Dhaka University Institutional Repository

মতপ্রকাশের অধিকারে বাধা দান থেকে এমন ঘটনা ঘটে। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ বললে মনে করা হয়, হয়তো ভালোর জন্য বলছে তাহলে আর একবার ভাবা যায় আর অন্য সম্প্রদায়ের হলেই অভিযোগ উঠবে মত প্রকাশে হস্তক্ষেপ করে স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারত উপমহাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সরকার প্রচারিত কারণ হলো 'মুসলমানদের অভিযোগ যে হিন্দুরা তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতেছে। সস্তা সুক্ষ বিলাতী বস্ত্র এবং সাদা বিলাতী লবন ও চিনি ক্রয় করিতে তাহারা বাধা পাইতেছে ও ততপরিবর্তে মোটা- দেশি কাপড় ও মেটে দেশি কর্কচ ও ময়লা শরকরা কিনিতে হিন্দুদের দ্বারা বাধ্য হইতেছে।' সরকারের এমন প্রচারণার ফলে যে মুসলমান ব্যক্তি এ সবের কিছুই বোঝেন না তিনিও অপরপক্ষকে সন্দেহ করা শুরু করেন।

হিন্দু সম্প্রদায় গরুকে তাদের মাতা সমতুল্য জ্ঞান করেন। গরু পুজাঁ করেন। কিন্তু মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে উপমহাদেশের সামর্থবান মুসলমানদের জন্য ঈদুল আযহায় গরু কোরবানী করা পুণ্যের বিষয়। এই অসমঝতা নিয়ে বহুবার বিরোধের সুত্রপাত হয়েছে। এর একটাই কারণ পরস্পরের প্রতি অসহনশীল মনোভাব। দু'পক্ষই কেউ কারো ধর্মীয় মনোভাব এবং দুর্বল যায়গাটি বুঝতে নারাজ। তবে গো হত্যাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত দাঙ্গা অধিকাংশই ভারতে সংঘটিত হয়েছে। সম্প্রতি সময়ে গো হত্যা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া যায়নি।

গান্ধীজি তাঁর 'হিন্দু - মুসলিম টেনশান - ইটস কজ এন্ড কিউর' প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের দুটি চিরন্তন কারণ উল্লেখ করেছেন, একটি গো হত্যা নিয়ে অপরটি গান- বাজনা- নামাজ প্রসঙ্গে।

তাঁর ভাষায়- "এর প্রথমটি হলো গো হত্যা। আমি যদিও গো রক্ষাকে হিন্দু ধর্মের একটি মুল উপাদান মনে করি (মূল উপাদান এই জন্য যে সাধারণ ও বিশিষ্ট বর্গ সবার কাছে এটি গ্রহণীয়।) তবুও এর জন্য মুসলমানদের উপর বিরুপতার কারণ আমি কখনও বুঝে উঠতে পারিনি। ইংরেজদের কারণে প্রত্যহ যে গো হত্যা হয় তার সম্বন্ধে আমরা উচ্চ-বাচ্য করিনা। কোন মুসলমান গো বধ করলে আমরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠি। গোরুর জন্য যেসব দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা উদ্যমের অপচয়ের বাতুল প্রয়াস। এর পরিণামে একটি গোরুরও প্রাণ রক্ষা হয়নি বরং মুসলমানদের মনে প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং গো হত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গো রক্ষা আমাদের নিজেদের দিয়ে শুরু করতে হবে। ভারতের মত বিশ্বের আর কুত্রাপি বোধহয় গো জাতির এমন অনাদর করা হয়না। অগ্রভাগে লোহার কাঁটা লাগানো ছড়ি দিয়ে হিন্দু গাড়োয়ানদের জোয়ালে আবদ্ধ বলদদের তারনা করতে দেখে আমি কতবার চোখের জল ফেলেছি। আমাদের গো সম্পদের অধিকাংশের অর্ধ বুবুক্ষু চেহাড়া সবার পক্ষে লজ্জার বিষয়। হিন্দুরা বিক্রি করে বলেই গরুর গলায় কসাইয়ের ছুড়ি পরে। একমাত্র কার্যকরি ও সন্মানজনক উপায় হলো মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং গো রক্ষার দায়িত্ব তাদের মর্যাদার উপর ছেড়ে দেওয়া। গো রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

সমিতিগুলোর দৃষ্টি গরুদের খাদ্য সরবরাহ, তাদের উপর নিষ্ঠুরতা বন্ধ করা, দ্রুত ক্ষীয়মান গোচারণ ভূমি বাচাঁনো, গো প্রজাতির উন্নয়ন, দরিদ্র গো পালকদের কাছ থেকে গরু কিনে নেয়া এবং পিঞ্জরাপোলগুলিকে আধুনিক স্বাবলম্বি ডেয়ারিতে পরিণত করার উপর পড়া উচিত। উপরে উল্লেখিত কর্মসূচীর কোন একটিকে উপেক্ষা করলে হিন্দুদের তরফ থেকে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি পাপাচরণ করা হবে। মুসলমানদের হাতে গো বধ বন্ধ করতে না পারলে তাদের পাপ হয়না, গুরুতর পাপ হয় তখন যখন তারা গো রক্ষার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ করেন।"(২৮)

তার অর্থ হিন্দুরা যখন দেখছে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে গরু নিধন হচ্ছে সেটা তাদের কাছে অতটা খারাপ লাগছেনা কিন্তু মুসলমান গরু কোরবানী করলেই তারা ভাবছে এটি সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্ম পরিপন্থী। তাদের ধর্মকে নষ্ট করা হচ্ছে। আসলে বিষয়টি মানষিক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীলতার অভাব। "মসজিদের সামনে বাদ্য এবং সাম্প্রতিককালে এমনকি হিন্দু মন্দিরে আরতি অনুষ্ঠানের প্রশ্ন আমি প্রার্থনা প্রেরিত চিত্তে লক্ষ করেছি। গো হত্যা হিন্দুদের কাছে যেমন এক দুষ্ট ক্ষত স্বরুপ, মুসলমানদের কাছে মসজিদের সামনে বাদ্যও অনুরুপ। আর হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের গো হত্যা থেকে জোড় করে নিবৃত্ত করতে পারেনা তেমনি মুসলমানরাও ছুড়ি তলোয়ার উচিয়ে মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্য ভান্ড সহকারে ধর্মীয় শোভা যাত্রা যাওয়া বা মন্দিরের আরতি বন্ধ করতে পারেননা। তাদের হিন্দুদের সদিচ্ছার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। হিন্দু হিসেবে নিসন্দেহে অন্য হিন্দুদের আমি পরামর্শ দিব যে দরাদরির ভাবনা দ্বারা চালিত না হয়ে তারা যেন নিজেদের মুসলমান প্রতিবেশিদের মনোভাবের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করেন এবং যখনি সম্ভব তাদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেন। আমি শুনেছি যে কোন কোন যায়গায় হিন্দুরা ইচ্ছা করেও মুসলমানদের বিরক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানদের নামাজ শুরু হওয়ার সময়ে আরতি করা আরম্ভ করেন। এমন ঘটে থাকলে তাকে অসংবেদনশীল ও বন্ধুত্ব বিরোধী কার্জ বলতে হবে। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে অপর পক্ষের মনোভাবের প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া হবে। এর জন্য কোন বিচার বিবেচনার প্রয়োজন ঘটেনা। তবে মুসলমানদেরও কদাচ বল প্রয়োগে সঙ্গীত- বাদ্য বন্ধ করার কথা ভাবা উচিত নয়। কোন শাসানি বা প্রত্যক্ষ হিংসার সামনে নতি স্বীকার করার অর্থ হলো নিজ আত্ম সন্মান এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করা। যে ব্যক্তি কদাপি শাসানির সামনে আত্মসমর্পন করেনা, সর্বোদাই সে অপরের বিরক্তির কারণ কমাতে এবং এমনকি পরিহার করতে সক্ষম।"(২৯)

Dhaka University Institutional Repository

গণমাধ্যমের উস্কে দেয়া সংবাদ প্রচার

(সাম্প্রতিক একটি তথ্য) গণমাধ্যমের উস্কে দেয়া সাম্প্রতিক একটি চিত্র হলো যেমন ভারতের গণমাধ্যমে বিজেপি সমর্থিত আর এসএস দলের সমর্থকদের হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পতাকা পৃথক বলার যে সংবাদ প্রচার। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের পতাকা তিনটি রংয়ের মিলে। সবুজ সাদা ও কমলার সমান মাপের সহাবস্থানে পতাকাটির নকঁশা তৈরি। কিন্তু ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময়ও একবার তারা এই পতাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। দেশ ভাগ হওয়ার পর এই দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে একই পতাকা হিন্দু ও মুসলমানরা বহন করতে পারেনা। ভারতের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুসারে হিন্দুদের পতাকার রং হওয়া উচিত স্যাফরণ বা গেরুয়া রঙের। কোন কোন আরএসএস সংঘে এমনকি জাতীয় পতাকার পরিবর্তে এই গেরুয়া রঙের পতাকা পর্যন্ত তোলা হয়। একই সাথে ছবিসহ সে সংবাদ প্রচার ও বাবরী মসজিদে হিন্দু সেনাদের আক্রমনের সময় এই পতাকা বহন করে নিয়ে যাওয়ার খবরে স্বাভাবিকভাবেই ভারতে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। ২০০৮ সালে জুলাইতে কাশ্মীরের আখনোর মসজিদে বিজেপি কর্মীরা উঠে তিনরঙা বর্তমান জাতীয় পতাকাটি টাঙিয়ে দেয়ার ছবি কাশ্মীর নিউজ এজেন্সি ফলাও করে প্রকাশ করেছিল। একই সাথে ওই বছরের ৩১ জুলাই ও ১৪ আগষ্ট ' হিন্দুস্থান' পত্রিকায় 'উইদার' নামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয় যাতে হিন্দুদের জন্য গেরুয়া পতাকার দাবিতে সুর মেলানো হয়েছে। এই ধরণের দাবিতে যখন কোন পত্রিকা সুর তোলে তা যেমন ওই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে চেতনার জন্ম দেয় তেমনি তাদের বিরুদ্ধে ওই সম্প্রদায়ের তৈরি হয় ব্যাপক ক্ষোভ আর তা থেকেই ঘটে যেতে পারে নতুন কোন সঙ্ঘর্ষ ও দাঙ্গার ঘটনা। নিচে দুটি ছবি দেয়া হলো

১

VHP and BJP activists hoisting Tiranga on a masjid in Akhnoor, Jammu in July 2008 [Photo by News Agency of Kashmir]

Dhaka University Institutional Repository

২

RSS workers hoisting saffron flag at an RSS function. [Photo: The Hindu]

এখানে উল্লেখ করা সংবাদটি ভুল নয় তবে পাশাপাশি দুটো ছবি প্রকাশ করে পাঠকের মনে যে সাম্প্রদায়িকতা তৈরী করা হয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে উসকানি মুলক আচরণ। শুধু সাম্প্রতিক সময়ে নয় অতীতেও সংবাদপত্রগুলোর এমন প্রচারণা, ভুল প্রচারনার ফলে পাঠক বা দর্শক বাড়ানোর জন্য মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে বা উড়ো খবর প্রচার করে সাম্প্রদায়িক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। যে ছোট খাট পরিস্থিতি সহজে মীমাংসা হয়ে যেত সংবাদপত্রের ভুল তথ্য বা উসকে দেয়া সংবাদের কারণে তা বড় আকার ধারন করে সহিংসতায় রুপ নিয়েছে। যেমন ভারতে ১৯৮০ সালে ১৩ই আগষ্ট থেকে শুরু হওয়া মোরদাবাদ দাঙ্গার ঘটনায় 'আসলী ভারত' নামে একটি হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮ ই আগষ্ট সংবাদ প্রচার করলো যে " নরহত্যার সূত্রপাত ১৩ ই আগষ্ট যে ইদগাতে হয় সেখানে অনেক মুসলমান অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এসেছিলেন। আপত্তিকর ছবিও প্রচার করা হয়। দিল্লীর পুলিশ ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৩-ক ধারা অনুযায়ী ঐ পত্রিকার ৪ হাজার কপি বাজেয়াপ্ত করে। ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং কানপুর থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক জাগরণ' পত্রিকার ১৮ই আগষ্টের সংখ্যা উত্তর প্রদেশের কানপুর, আগ্রা, বেরিলি, এলাহাবাদ, উন্নাও চন্দৌসী ও আমরোহা, মধ্যপ্রদেশের মহউ, জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগর ও পুরাতন দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছড়ানোর জন্য দায়ী। অপর একটি সংবাদপত্রে এই মর্মে খবর বেরোয় যে বিশেষ একটি মসজিদে মুসলমানেরা বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র জমা করেছেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে এবং পুলিশকে অকারণ মসজিদটিতে খানা-তল্লাশী চালাতে হয়।"(৩০)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এ সংবাদ যে উড়োখবর দিয়ে ভিত্তিহীন তথ্য প্রমান ছাড়া লেখা হয়েছিল সেটি পরে প্রমানিত হয়েছে। সেদিনের নামাজে যদি চড়মপন্থীরা প্রস্তুত হয়েই যেতেন

Dhaka University Institutional Repository

তবে বৃদ্ধ ও নিজের শিশু সন্তানটিকে সাথে নিতেনা। ঘটনায় অসহায় হওয়ায় যুবকদের চেয়ে নিহতর সংখ্যা বেশি ছিল ছোট ছোট শিশু ও বয়স্কদের।

১৯৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গাগুলির সময় এরকম অনেক উদাহরণ আছে। এর জন্য ভারতের প্রেস কাউন্সিল তার " ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১-২২ শে জানুয়ারীর সভায় আজ, দৈনিক জাগরণ, স্বতন্ত্র চেতনা ও স্বতন্ত্র ভারত নামক চারটি দৈনিক পত্রিকাকে ভৎর্সনা করে যেগুলি বিগত বৎসরে অযোধ্যার দাঙ্গার ঘটনাবলীর সংবাদ প্রচারের সময়ে ' সাংবাদিকতার নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করার সঙ্গে সঙ্গে কারচুপি করা (গ্রেপ্তার করা জনৈক মহন্তের ফোটোগ্রাফের সামনে জেলের গারদ জুড়ে দেওয়া) ছবি উস্কানী দেয় এবং সামরিক বাহিনী ও পুলিশের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও প্রচার করে।"(৩১)

দাঙ্গার ইতিহাস /শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় ১৯৪ (১ ও ২)

আবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সময়ে নিজেদের জনগণের স্বার্থেই সংযত হওয়ার বিষয়টি রয়েছে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার সময় পাকিস্তানের টিভি চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত উস্কানীমুলক। নাদিম এফ পরচা লিখেছিলেন "এ সময় পাকিস্তানের অধিকাংশ বেসরকারি টিভি চ্যানেল নিজেদের অজান্তেই সবচেয়ে খারাপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এগুলো যেভাবে সরকারি দল, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত বা ধর্ম প্রসঙ্গ এলেই অনুশোচনাহীনভাবে স্লোগান সর্বস্বতায় আঁচলবন্দী হয়ে পড়ে, এবার তেমনই ভূমিকায় দেখা যায় তাদের।"(৩২)

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ইতিহাসেও এমন অসংখ্য উস্কানীমুলক সংবাদ রয়েছে। এ বিষয়টি আমি এ দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গণমাধ্যমের অবস্থানের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

সংস্কৃতির সংকট ঃ

সংস্কৃতির সংকটের কারণে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা তৈরি হতে পারে সে উদাহরণ দিতে আমি আমার সংবাদ প্রচার ও বই -সঙ্গীত নিয়ে লেখা দুটি আর্টিকেল উল্লেখ করছি।

সংবাদ প্রচার বিষয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে বলেছিলেন সংস্কৃতির বাহন। আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক পাঠটা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাষণামল থেকে। ঔপনিবেশিক রাজশক্তি যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল তার ফলাফল হলো আজকের উচ্চশিক্ষিত মানুষ। আর বিভেদের যে রাজনীতি সূচনা করে গিয়েছিল তার ফলাফল হলো শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের বৈষম্যগত অবস্থান। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন তাদের 'ভাগ করো এবং শাষণ করো' নীতির কথা। প্রত্যক্ষভাবে ৪৭ এ দেশভাগের সময় এর প্রয়োগ স্পষ্ট হলেও বীজ কিন্তু বুনেছিলো ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর ইংরেজ জাতি বুঝেছিলেন এ জাতিকে ভাগ করে তারপর শাষণ। যারই প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ আর দুই সম্প্রদায়কে ঠেলে দিয়েছে দুটি পৃথক দল গঠনে। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ সারা ভারত মুসলীম লীগ’ ও সারা ভারত হিন্দু মহাসভা নামে দুটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। কমলহীরের সাথে তুলনীয় শিক্ষা যদি থাকতো তবে কি সম্ভব হতো? ঔপনিবেশিক রাজশক্তির প্রয়োজনে আসলে এ দেশে তৈরী করা হয়েছিল আত্মমর্যাদাবিহীন, সৃজনশীলতাহীন এমনকি বিবেকবোধহীন কিছু কেরাণী। তারা ছিল শুধুই ইংরেজদের আজ্ঞাবহ।

এ জাতি যে সজ্ঞানে নিজের ক্ষতি করতে পারে একথা চতুর শাষকেরা সেদিনই বুঝেছিল যেদিন সুতানটি বন্দরে ব্যবসার অনুমতি মেলে। তারপরত ২শ বছর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের এত পট পরিবর্তনের পরও কি আমাদের মধ্যে আসলে জাতীয়তাবোধ তৈরী হয়েছে? এই বোধের অভাব আরো বেশি হয়েছে কারণ অবক্ষয় ও স্থবিরতার হাত থেকে সেই সুশিক্ষিত মানুষও রেহাই পায়নি। সংস্কৃতির সংকট ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি মহলেও। তাই দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকতেও ২৯ এপ্রিল ২০১১ দুপুর ও সন্ধ্যার সংবাদে বেশিরভাগ টিভি চ্যানেলের লীড নিউজ ছিল ‘রুপকথার মত বিয়ে’। পত্রিকাগুলো বের করেছে ভবিষ্যত রাজা ও রাণীর বিয়ের সংবাদ নিয়ে সাপ্লিমেন্টারী। একটি টিভি চ্যানেলে দেখলাম বিয়ের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা উপস্থাপকরা ইচ্ছে করে ইংলিশ স্টাইলে ধারা বর্ণনা করছেন। পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের সংবাদে কেট মিডলটন নাস্তায় কি খাবেন থেকে নৈশভোজে কি গাউন পড়বেন তার বর্ণনা রয়েছে। ভাগ্যিস আর এগোয়নি।

আমার জিজ্ঞাসা এই বিয়েতে কি ডলার বা পাউন্ডের মূল্য উঠানামা করেছে ? টাকার লেনদেন বেড়েছে? ব্রিটেন আমাদের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছে? শুধু আগ্রহর জন্য এই বিয়ের সংবাদকি প্রধান শিরোণাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে? সেদিন কি কোন দেশের খবর ছিলনা যা দিয়ে শিরোনাম হতে পারে ?

সেই একই কথা আমাদের সংস্কৃতির সংকট এবং কমলহীরের মত শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে অসচেতনতা। এর ফলে আমরা আজ ঔপনিবেশিকতা থেকে কাগজে কলমে মুক্ত হয়েও মনে-প্রাণে ঔপনিবেশিকতা এড়াতে পারিনি বরং চর্চাই বাড়িয়েছি। তাই সিপাহী বিদ্রোহ, জালিয়নওলাবাগ হত্যাকান্ড, ৪৬ এর দাঙ্গা সর্বোপরি দেশভাগ মহাত্মা গান্ধি যাকে বর্ণনা করেছিলেন নিজের শরীর দ্বিখন্ডিত করার সাথে, সব ভুলে যাই। ভুলে যাই র‌্যাডক্লিফ এর না দেখা ভারতবর্ষের ওপর লাল দাগের চিহ্ন যা আজও সীমান্তে সীমান্তে ক্ষত। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক কারণ গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে মান্য করেছি ব্রিটেনকে আর নিজেদের রেখেছি শিক্ষার্থি হিসেবে।

রাজধানীতে অসংখ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোর নামকরণ হয়েছে পাশ্চাত্যের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের অনুকরণে। অভিভাবকরা তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অবজ্ঞার চোখে

Dhaka University Institutional Repository

দেখেন, পয়সা খরচ করিয়ে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানকে পড়িয়ে অহংকার করেন। কিন্তু ব্রিটেনের রানীর মুকুটে খচিত ১০৫ ক্যারটের কোহিণূরটি যে এ উপমহাদেশেরই রত্ন তাকি আমরা জানি?

১৯৩১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী লন্ডনের হাউস অফ কমন্স্ সভায় উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন ‘ ভারতবর্ষ হাতছাড়া হলে আমাদের চূড়ান্ত অনিষ্ট হবে। মৃত্যুর শামিল হবে এই ক্ষতি। চাই কি, একটা অখ্যাত শক্তিতে পরিণত হয়ে যাব আমরা ধীরে ধীরে’ (ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট)। তাই হয়েছে। তারা চলে গেছে ঠিকই তবে মানষিকতায় দিয়ে গেছে কৃতদাসের চিহ্ন। আর রাজউৎসবে আমরা যারপরনাই তাই হাততালি দিতে দিতে হাতের তালু লাল করে ভাবি এই বোধহয় সংস্কৃতির উত্তরণ। শাষণ কি শোষক চাইলেই করতে পারে যদি শোষিতের দারুণ বোকামী আর মেরুদন্ডহীনতা না থাকে? (৩৩)

<u>বই ও সঙ্গীত নিয়ে</u>

ব্যাগের দোকান পার হয়ে সেই পুরনো দিনের সবুজ দরজা লাগানো এ.বি বুক ডিপোর গায়ে দুটো তালা। ইউনির্ভিাসিটিতে পড়ার সময় ৪০ টাকা দিয়ে একটা বই কেনার অযুহাতে এই দোকানে দুই তিন ঘন্টা বসে বই পড়া যেত। এখানে বসেই সিটি অফ জয়, রেজারেকশনের অনুবাদ পড়েছিলাম আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সহপাঠিরই আশ্রয়স্থল নিউমার্কেট।

গান ও বইয়ের দোকানদারদের প্রধান ক্রেতা শিক্ষার্থী ও তরুন প্রজন্ম। এদিকে সচেতন পাঠক এবং ভালো শ্রোতারাও দোকানে গেলে আরো ৫ টা নতুন বইয়ের সন্ধান, কিছু রেফারেন্স পেয়ে যান। কিংবা একটা গানের সিডি খুজতে গেলে সাউন্ড বক্সে শুনে হয়তো ভালো লেগে যায় অপছন্দের কোন ক্লাসিক্যাল মিউজিক। নিজের জন্য না হলেও নিয়ে আসেন পিতার জন্য। পাঠাগার থেকে কার্ড দিয়ে বই আদান-প্রদান, পাশের বাড়ির বন্ধুর সাথে বই দেয়া- নেয়ার অভিজ্ঞতা শুধু যাদের রয়েছে তারাই জানেন এর আনন্দ। তবে বই বলতে যে দুটি মলাটের মধ্যে ধারনকৃত অসংখ্য পৃষ্ঠার বন্ধনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার লাইব্রেরীর মধ্যে যে বইয়ের কথা বলে গেছেন সেই ধারণার পরিবর্তন এসেছে। বই অর্থ শূন্যের ভেতর ইলেকট্রিক শব্দর গাথুনীও বটে। গান শুনবার পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন। গ্রামোফোন, মাইক, ক্যাসেট প্লেয়ার, সিডি, এমপি-ফাইভ পেছনে ফেলে এখন আইপড। সত্যিই বদলে গেছে অনেক কিছু, গানের মতো যা দেখি নতুন লাগে।

ইংরেজি ছোট হাতের e অক্ষরটিতে এসে পৌছেছে সমস্ত যোগাযোগ। ই অর্থাত ইন্টারনেট মাধ্যমটি মুলত শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশক থেকে। বুদ্ধিজীবির নোটবইয়ে অশোককুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, ‘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শিক্ষা, সরকারি কার্যকলাপ এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা তিনটিরই ভিত

Dhaka University Institutional Repository

কেঁপে গিয়েছিল। প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা তখন থেকেই ভাবনা শুরু করেন এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় না রেখে শূণ্য মার্গে ঈষৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে সংরক্ষিত করার। প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থার সংরক্ষণ নিয়েই এই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল পরে অন্য দুটিতেও প্রয়োগ ঘটে।'

আজ আর সেই ঈষৎ সংরক্ষনের অপেক্ষায় বসে নেই সুপারসনিক গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট। বছরখানেক আগের এক জরীপ অনুযায়ী বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত। যার সংখ্যা ১ দশমিক ১৭ থেকে ১ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নর্থ আমেরিকায় ৭২ % এবং সবচেয়ে কম আফ্রিকায় ৫%। ব্যবহারকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ছাত্র এবং সবচেয়ে কম ২ শতাংশ ব্যবহারকারী হলেন সরকারী র্কমকর্তারা। সাধুবাদ জানাই প্রযুক্তির এই সাফল্যকে। নিশব্দের মধ্যে শব্দকে বেধে রাখার প্রয়াসকে, শূন্যের ভেতরে ইতিহাস সংরক্ষনের সাফল্য অবশ্যই বিশাল উত্তোরণ। কিন্তু লেখার বিষয় ইন্টারনেট নয়, এর ব্যবহার। ওই জড়িপে বাংলা ভাষার কতজন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত তা বলা হয়নি। তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্টারনেট চালু হয়েছিল। 'শিক্ষা ব্যবস্থা' এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে। শুরু হয়েছে এস এস সি পরীক্ষা। গতবারের এসএসসি এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম, দ্বিতীয় স্থানে রাজধানীর স্কুলগুলোর নাম থাকলেও সার্বিকভাবে ভালো ফলাফল করেছে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা যাদের হাতের কাছে ইন্টারনেট বিষয়টি এখনও দূরহ। আমাদের দেশে নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা অধিকাংশ শিক্ষার্থী।

কিন্তু কথা হচ্ছে আসলে কতটা পড়া লেখা বা একটা নতুন শব্দের খোঁজে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে? বেশিরভাগ সময়েই ইমেল, জিমেইল, নানা সাইট সর্বোপরি ভাত-মাছ খাবার মতো ফেসবুকের ব্যবহার। নিসন্দেহে সামাজিক যোগাযোগের এ মাধ্যমটির শক্তি অনেক বেশি তার প্রমানত মধ্যপ্রাচ্যে তরুনরা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের তরুনরা ব্যবহার করছে কিভাবে? আর সারাদিন এই ইন্টারনেট কেন্দ্রীক জীবন মূল সংস্কৃতি থেকে কতটা দূরত্ব তৈরী করছে ?

বাঙ্গালীর পরিমিতি বোধের অভাব বড় বেশি। তাই যে প্রযুক্তি দিয়ে অন্যেরা উৎকর্ষে পৌচ্ছাচ্ছে সেই একই প্রযুক্তির ঘোরে আমাদের সংস্কৃতি সঙকটের মুখে। রমনার বটমূলে এসো হে বৈশাখ কিংবা চারুকলায় পৌষ ফাগুনের পালায় আমরা হই হই করে উঠি বটে কিন্তু ওটুকুই। অন্যের সংস্কৃতিকে নিজেদের আঞ্চলিকতার সাথে মিশিয়ে যে আত্মতৃপ্তি পাই, ভাবি এই বিশ্বায়ন, সেখানে কিন্তু ঘাটতি রয়েছে। শুধু নেয়ার নয় নিজেদেরও কিন্তু পৌছে দেয়ার প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমাদের ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া আমরা পৌছে দিতে পারছি অন্য দেশে? আমাদের লেখকদের ভালো বই? গত ৫ বছরে নিউ মার্কেটে বন্ধ হয়ে যাওয়া বইয়ের দোকানের তালিকায় রয়েছে বুক এম্পোরিয়াম, ক্রিসেন্ট বুক ডিপো, বুক বিউটি, সার্বজনীন গ্রন্থালয়সহ দশ বারোটি দোকান। বন্ধ হয়ে গেছে

Dhaka University Institutional Repository

বিজলী ঘর, সিকো, আকস এর অডিও ক্যাসেটের দোকান। সঙ্গীতা, সাউন্ডটেক, বিউটি কর্ণার, বেতার জগতের মত নামকরা সব মিউজিক কপি রাইট, প্রডিউসার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

এর দোষ কিন্তু ইন্টারনেটের কাধে চাপালে হবে ভুতের মত পা পেছনে দিয়ে সামনে হেটে চলার প্রচেষ্টা। ত্বরিত যোগাযোগের যে মাধ্যমটি ব্যবহার করে অন্যেরা বিশ্বায়ন ঘটাচ্ছে সেই মাধ্যমের অপব্যবহারে আমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে সঙকটে ঠেলছি। সমস্যাটা আমাদের পরিমিতি বোধ ও প্রয়োজনীয়তা না বুঝে উঠায়। অন্যের বাড়ির পিঠা বেশি মিষ্টি লাগার প্রবনতায়। (৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১ দাঙ্গার ইতিহাস/ শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৫।

২ কমিউনাল এন্ড কমিউনাল ভায়োলেন্স ইন ইন্ডিয়া / ড.আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার পৃ. ১৮৯-১৯০

৩ সমাচার দর্পণ পত্রিকার ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারী বা ১৬ ই ফাল্গুন ১২৩৬ সন।

৪ সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা / আবুল মোমেন। পৃ ঃ ৩২।

৫ বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, জুলফিকার হায়দার. পৃ.৭১-৭২।

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / সংকলন / ১৩৬০ সংস্করণ,পৃ.৬০-৬২।

৭ লোকহিত,পৃ.২৬০. রবীন্দ্র রচনাবলী ২৪তম খন্ড।

৮ Ghulam mursid, co- existencein aplural society under colonial rule : hindu-muslim relation in Bengal 1757-1912 ‘ the journal of the institute of Bangladesh studies.vol.1.rajshahi 1976.p- 313.

৯ 'হিন্দু - মুসলিম টেনশান - ইটস কজ এন্ড কিউর'।

১০ দৈনিক প্রথম আলো ১২ মার্চ ২০১০। (আল কায়েদার জায়গা নিচ্ছে লস্কর-ই-তাইয়েবা?)

১১ Gujarat riot: Dalit cops attacked Muslims, upper caste protected them / **TwoCircles.net,**

১২ ৭.৫.২০১১/ সন্ধ্যা ৭ টার বুলেটিন শিরাণাম। (এটিএন বাংলা)

১৩ বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা / জুলফিকার হায়দার পৃ.২৩০।

১৪ দেশভাগ,সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা/ মফিদুল হক/ পৃষ্ঠা ১২৭।

১৫ দৈনিক ইত্তেফাক / সংবিধান সংশোধনের রাজনীতি পৃষ্ঠা. ১১। ৫ মে ২০১১

১৬ ৩.৫.২০১১ সন্ধ্যা ৭ টার সংবাদ/ এটিএন বাংলা।

১৭ ৪.৫.২০১১ সন্ধ্যা ৭ টার বুলেটিন সংবাদ। এটিএন বাংলা।

১৮ দৈনিক প্রথম আলো ১৬ মে ২০১০। দিল্লীর চিঠি। কুলদীপ নায়ার

Dhaka University Institutional Repository

১৯ পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী আসমা জাহাঙ্গীর। দৈনিক প্রথম আলো। ২৩ এপ্রিল ২০১০।

২০ ISLAMABAD Mr. Imran Khan, Chairman PTI. (Blasphemy law against the spirit of Islam and Constitution of Pakistan: Imran Kh) (http://pkpolitics.com/discuss/topic/blasphemy-law-against-the-spirit-of-islam-and-constitution-of-pakistan-imran-k)

২১ ২৫ এপ্রিল ২০১১ দৈনিক কালের কণ্ঠ। পৃষ্ঠা ১ ও ১০।

২২ ২৫ এপ্রিল ২০১১ দৈনিক প্রথম আলো। পৃষ্ঠা ৯

২৩ শীর্ষ নিউজ ডট কম . ৪.৫.২০১১

২৪ বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা / জুলফিকার হায়দার পৃ.২২৫।

২৫ বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা / জুলফিকার হায়দার পৃ.২২৬।

২৬ দৈনিক প্রথম আলো ৯ ফেব্রুয়ারী/ সাম্প্রদায়িকতা-রাম পুনিয়ানী

২৭ দৈনিক সমকাল ৩ অক্টোবর ২০১০।(অযোধ্যার শিক্ষা- নাদিম এফ পরচা)।

২৮ 'হিন্দু - মুসলিম টেনশান - ইটস কজ এন্ড কিউর'

২৯ 'হিন্দু - মুসলিম টেনশান - ইটস কজ এন্ড কিউর'

৩০ এস.কে ঘোষ কমিউনাল রায়টস ইন ইন্ডিয়া পৃ. ৪২। ১

৩১ টাইমস অব ইন্ডিয়া ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১।

৩২ দৈনিক সমকাল ৩ অক্টোবর ২০১০।(অযোধ্যার শিক্ষা- নাদিম এফ পরচা)।

৩৩ ৫.৫.২০১১ ইত্তেফাক

৩৪ ১৬.৪.২০১১ ইত্তেফাক

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায় ঃ গণমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৭৫৭ সালের আগে ইংরেজরা ভারতবর্ষে ক্ষমতার আড়ালে থেকে নিয়ন্ত্রন হাতে রাখলেও সরাসরি শাসনভার গ্রহন করেনি। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর সরাসরি রাণীর ফরমান জারির পর এদেশে তাদের শাসনের ঘোষণা হয়। এরও বেশ কিছুদিন পর তারা শুরু করে ইংরেজি পত্রিকার প্রকাশ।

আর তখন থেকেই দেখা যায় পত্রিকার বদৌলতে দাঙ্গার সংখ্যা বাড়ছে। আগে ভারতের ভাগলপুরে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হলে সে খবর পূর্ব বাংলা পর্যন্ত পৌছতনা। দেখা যেত যখন উপমহাদেশের এক প্রান্তে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হচ্ছে একই সময় অন্য প্রান্তে এক হিন্দু প্রতিবেশির বাড়িতে দাওয়াত খেত মুসলমান প্রতিবেশি। কিন্তু ইংরেজদের সংবাদপত্র প্রকাশনা ও ভিতরে ভিতরে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে তিলকে তাল করে উপস্থাপনের কৌশলে সেই সম্প্রীতিতে ধীরে ধীরে চির ধরা শুরু করলো। যে বিষয়টি হয়তো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতো দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে হিন্দু-মুসলমান যুক্ত থাকলেই সংবাদ প্রচার করা হতো, হিন্দু দ্বারা মুসলমান অপমানিত অথবা মুসলমানের হাতে হিন্দুরা নির্যাতিত। এ ধরণের অপপ্রচারের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দিন দিন চড়ম আকার ধারণ শুরু করে। এর সাথেত এক সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ প্রদান অপরদিকে অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষোভ প্রদর্শন রয়েছেই। আর সংবাদপত্র আজ যেমন ঘটনার অতিরঞ্জন করে পাঠক বাড়াতে চায় তখনও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। তবে প্রথম দিকে সংবাদপত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ইউরোপের জীবন-যাপন এর খবর ছাড়া তেমন কোন সংবাদ উঠে আসেনি। অল্প সময়ের মধ্যে যখন স্থানীয়রাও সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করে তখন প্রথমে স্থানীয় উচুঁ শ্রেণীর কথা পরে সম্প্রদায়গত আলোচনা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের কথাও প্রকাশ শুরু হয়। আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর সবসময় যে শুধু বাড়িয়ে প্রচার করা হতো তা নয়। সংবাদপত্রের মালিক তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থর জন্য বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতো। রাজনীতির জন্য সংবাদকে যে ব্যবহার করা হয় উদাহরণ তখন থেকেই।

বঙ্গ-ভঙ্গ সমসাময়িক গণমাধ্যমের ভূমিকা

১৯০৩ সালে প্রথম যখন কার্জনের বঙ্গবিভাজন পরিকল্পনা ঘোষিত হয় তখন থেকেই এর বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ উত্থিত হচ্ছিল। কিন্তু সরকারের দিক থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রকাশ্য উদ্যোগ তেমন দৃশ্যগোচর না হওয়াতে আন্দোলন ক্রমে ভাটা পড়ে। তবে এই উপলক্ষ্যে জনচিত্তে যে একটা পরিবর্তনের ঢেউ জেগেছিল নানাভাবে তার প্রকাশ মিলছিল। নতুন এই চেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কেবল সম্পৃক্ত হননি, তিনি একে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রয়েছে তার সার্থক প্রতিফলন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুর তাঁর এই প্রবন্ধ প্রথম পাঠ করেন ২২ জুলাই, ১৯০৪ সালে। এই রচনা এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করে যে ৩১ জুলাই অপেক্ষাকৃত বড় মিলনায়তন কার্জন হলে এর দ্বিতীয় পাঠের আয়োজন হয় দর্শনীর বিনিময়ে। ভারতী পত্রিকার খবরে যানা যায় চার ঘন্টার মধ্যে বিক্রি হয়েছিল ১২০০ টিকেট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চারণ করেছিলেন 'দেশ যখন একদা জাগ্রত হইয়া 'কন্সটিটিউশন্যাল অ্যাজিটেশনে'র রেখা ধরিয়া রাজ্যেশ্বরের দ্বারের মুখে ছুটিয়াছিল, তখন সমস্ত শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিবেগ তাহার মধ্যে ছিল। আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সেই স্রোতের পথ বাঁক লইবার উপক্রম করিতেছে। তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে-এখন সে আত্মশক্তি আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতা লাভের দিকে অনিবার্যভাবে চলিবে, কোনো একটি বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদলাভের দিকে নহে।'

কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গর পরপরই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আসল চেহাড়া যেন বেরিয়ে আসে। প্রত্যেকে তার স্ব স্ব ধর্মের প্রচারণাকে এমন তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল যে তা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, বুদ্ধিমান ইংরেজ জাতি ভেতরের এই বিভেদের কথা অনেক আগেই টের পেয়েছেন বলে তারা বাংলাকে ভাগ করার মত কূটনৈতিক বুদ্ধি বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। বঙ্গভঙ্গর পরপরই শুরু হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বজাত্যবোধ। এতদিন একসাথে থাকার নমুনা যেন আর মুহূর্তেও এক মানচিত্রের দাগের পর খুঁজে পাওয়া যায়না। হিন্দুরা তাদের পত্রিকায় মুসলিম বিদ্বেষী বিষোদগার অন্যদিকে মুসলমানরা তাদের প্রকাশিত পত্রিকায় হিন্দুদের বিরোধী বিষোদগার শুরু করে প্রতিযোগিতায়। বাংলা ভাগ হওয়ার ২ বছর পরই ১৯০৭ সাল থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অধ্যায়।

ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লায় যেসব সহিংস ঘটনার অবতারণা হয় তা একটি অভিন্ন চরিত্র প্রকাশ করে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান ফারাককে মুখ্য করে পরস্পরের অভিন্ন স্বার্থ বাতিল করে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয় সম্প্রদায়গত চিন্তা, বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়ানো হয় এবং পরিণামে এই হিংসা রুপ নেয় রক্তাক্ত সংঘাতের। হিংসা প্রচারের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় ময়মনসিংহের জনৈক ইবরাহিম খাঁ প্রনীত 'লাল ইশতেহার' নামক চরম সাম্প্রদায়িক প্রচার পুস্তিকায়। ইশতেহারটির ভাষা ও বক্তব্য এতই নিম্নরুচির ও উস্কানিমুলক ছিল যে ঢাকা সম্মেলন এবং ১৯০৭ সালের মার্চে বরিশালে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে কয়েকজন মুসলিম নেতা পর্যন্ত এর প্রচারণা ঠেকাতে উদ্যোগি হয়েছিলেন। বিট্রিশ পণ্য বর্জনের স্বদেশী ডাকের বিপরীতে ইশতেহারে বলা হয় 'হে মুসলমানরা, উঠ, জাগো, তোমরা হিন্দুদের সাথে একই স্কুলে পড়ো না, হিন্দুর দোকান হতে কিছু ক্রয় করোনা, হিন্দুদের দ্বারা তৈরি কোনো পণ্য স্পর্শ করো না।' তোমরা অজ্ঞ, এই কথা বলে ইশতেহারে জ্ঞানের এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য প্রকাশ করে বলা হয় 'যদি জ্ঞান অর্জন করো তবে তোমরা অবিলম্বে সকল হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাতে পারবে।' স্বদেশি আন্দোলনের ডাকে যদি দীর্ঘদিন ধরে যাদের সাথে সহাবস্থান তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয় তবে সেটা কতটা দেশের জন্য আর কতটা সম্প্রদায়গত বিরোধের মনোভাব থেকে তাত আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এই বক্তব্য প্রান্তিক কোনো ব্যক্তির একক প্রচারণা হিসেবে বিবেচনা করা যেত, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মুসলিম নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা, নবাব খাজা সলিমউল্লাহর অনুগত বিশিষ্ট নেতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রকাশ করে। লাল ইশতেহারকে এমনি মর্যাদা দিয়ে মুসলিম নেতৃত্বের মন-মানসের রুপটি মেলে ধরলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। এটাও লক্ষনীয়, কুমিল্লায় দাঙ্গা বাঁধে মুসলীম লীগের শাখা গঠনকল্পে। সেখানে নবাব সলিমউল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী আসার পরপর। যে পক্ষই দায়ী হোক, সম্প্রীতি রক্ষায় মুসলিম লীগ নেতাদের জোড়দার প্রচেষ্টা তেমন লক্ষ্য করা যায়নি সেসময়। বরং দেখা যায় জামালপুরের বকশিগঞ্জে দাঙ্গার সময় প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে ' হে মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা কি জান যে, সরকার এবং নবাব সলিমউল্লাহ সাহেব সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমর্থক? সুতরাং আমরা আর কার পরোয়া করবো?'

তাই একথা নিসন্দেহে বলা যায় সে সময়ে শিক্ষিত ও সুশীল শ্রেণীর মধ্যে কোথাও কোথাও সম্প্রীতির আহ্বান শোনা গেলেও তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল দু'সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ সম্প্রদায়গত চেতনা। যার প্রকাশ হয়েছে সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

ডাইরেক্ট একশনডে- গণমাধ্যম

১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ে পত্র-পত্রিকার প্রচারণা তুলে ধরার আগে সে সময়ের ভয়াবহতা তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত কিছু ছবি সংযোগ করা হলো।

Family waiting in railroad station trying to escape city after bloody rioting between Hindus and Muslims

Dhaka University Institutional Repository

1.Corpse of a man seen through a wheel of a cart on its way to be cremated after bloody rioting between Hindus and Muslims Calcutta (Kolkata) 1946

2. Men adding wood & straw to funeral pyres in preparation for cremation of many corpses after bloody rioting between Hindus and Muslims Calcutta (Kolkata) 1946

1. Corpses lying among pieces of wood in preparation for cremation after bloody rioting between Hindus and Muslims Calcutta (Kolkata) 1946

2. Men unloading corpses from truck in preparation for cremation after bloody rioting between Hindus and Muslims 2 Calcutta (Kolkata) 1946

Dhaka University Institutional Repository

1. Vultures feeding on corpses lying abandoned in alleyway after bloody roiting between Hindus and Muslims Calcutta (Kolkata) 1946

2. Severed foot in a wooden box during cleanup of corpses after bloody rioting between Hindus and Muslims Calcutta (Kolkata) 1946

1. Vultures sitting on the roofs of a building while corpses lie below, abandoned in alleyway after bloody rioting between Hindus and Muslims 2 Calcutta (Kolkata) 1946

2. Vultures sitting on the roofs of a building while corpses lie below, abandoned in alleyway after bloody rioting between Hindus and Muslims Calcutta (Kolkata) 1946

1 People waiting in railroad station trying to escape city after bloody rioting between Hindus and Muslims 2

2 People waiting in railroad station w. their cows as they try to escape city after bloody rioting betweeen Hindus and Muslims

Dhaka University Institutional Repository

1. People waiting in railroad station trying to escape city after bloody rioting between Hindus and Muslims

Man carrying another man as they wait in railroad station trying to escape city after bloody rioting between Hindus and Muslims

1.Hindu women & children eating one of their 2 daily meals of rice as they take refuge from communal riots at relief station run by the Muslim League at Lady Bradbourne College

2. Hindu woman w. her children, eating one of their 2 daily meals of rice as they take refuge from communal riots at relief station run by the Muslim League at Lady Bradbourne College

১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময় পত্রপত্রিকার ভূমিকা কি ছিল তা নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে তবে ৬৫ বছর আগের মূল পত্রিকা এখন খুঁজে পাওয়া দুরহ। আমি কয়েকটি বই থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সে সময়ের পত্র-পত্রিকার আচরণ উল্লেখ করছি।

কিছু উর্দু পত্র-পত্রিকা এ সময় বল প্রয়োগের মনোভাব দেখিয়ে মুসলমান সমাজকে সাম্প্রদায়িক মোহে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা চালায়। আর দাঙ্গাটা যে করবে ঐ উর্দু-অলারাই, বাঙ্গালী মুসলমানেরা নয়, এ সত্য প্রকাশিত রচনায় ক্রমে উন্মোচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আগষ্ট ছিল রোজার মাস। এই মাসকে উল্লেখ করে কলকাতার মেয়র ও লীগের কলকাতা জেলা সম্পাদক প্রচারিত এক পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল "এই রমজান মাসেই ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়।--- আল্লাহর ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছেন।" (১)

এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় আজাদ মসুলমান ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান বলেন

"ধর্মের দোহাই দিয়া এই দাঙ্গায় মুসলমানগনকে উত্তেজিত করানো হইয়াছে।" (২) অন্যদিকে হিন্দু পত্রিকার তরফ থেকেও প্রচার চলছিল। প্রবাসীতে লেখা হয় "সাম্রাজ্যবাদ আজ পাট গুটাইতেছে ; সুতরাং লীগ এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অন্যান্য অধিকারগুলি কায়েম রাখিবার চেষ্টায়।' জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, লীগের প্রচারের বিরুদ্ধে 'কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু মহাসভাঘেষা সংবাদপত্রগুলির মধ্যেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়" (৩)। কংগ্রেস নেতা বিজয়সিংহ নাহার বলেন "এই প্রত্যক্ষ সঙ্গ্রাম আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিধান সভার ইউরোপীয় সদস্য জি.মরগ্যানের মতে যে গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে।" উদ্বিগ্ন হবার মত কারণ যথেষ্টই আছে, কারণ বিভিন্ন এলাকা থেকে হুমকির খবর পাওয়া যাচ্ছে।"(৪) কমিউনিষ্ট পার্টির পত্রিকায় লেখা হয় 'ঘরোয়া লড়াই এবং ব্যাপক দাঙ্গার' আশঙ্কার উল্লেখ করে জাগ্রত এবং হুশিঁয়ার মুসলমান জনগনের কাছে মিলিত সংগ্রামের আবেদন জানানো হয়। " নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার জানতে চান, বাংলা সরকার কি এখন মুসলিম লীগের সাব কমিটি হয়ে কাজ করছে ? "(৫)

১ থেকে ৫ পর্যন্ত উক্তিগুলো মীজানুর রহমানের কৃষ্ণ ষোলোই পৃষ্ঠা ২০- ২২ থেকে সংগ্রহ করা।

গুজরাট দাঙ্গায় গণমাধ্যম

PRESS COUNCIL OF INDIA

Soochna Bhawan 8-C.G.O Complex Lodhi Road New Delhi-110 003

COMMUNAL VIOLENCE IN GUJARAT- ROLE OF THE MEDIA

(Adjudications rendered on 30.6.2003 in 24 cases)

Dhaka University Institutional Repository

Complaint

Shri V.D. Mishra, Commissioner of Police, Aurangabad filed three complaints dated 23.05.2002 alleging publication of exaggerated and provocative news items in local news papers of Aurangabad following the Godhra incident in Gujarat.

The complainant has submitted that subsequent to the tragic incident at Godhra in Gujarat on 27.02.2002, the local newspapers of Aurangabad started publishing exaggerated, biased, inciting and irritating news items, creating communal hatred thereby exciting the feelings of both the communities. The complainant alleged that the daily papers such as □Tarun Bharat□, □Saamna□ & □Vishwamitra□ had played a leading role in highlighting the incidents and flaring communal hatred between Hindus and Muslims by publishing highly provocative, baseless and exaggerated news.

The English translations of the captions of the news items supplied by the complainant are as follows:

S.No.	Name of Daily News Paper	Date	Published News Headlines
1.	Tarun Bharat	07.03.2002	Stone pelting, arson at Bhigarin Nagar, Curfew imposed. (25 die in fresh violence in Gujarat)
2.	-do-	14.03.2002	Who won & who lost?
3.	-do-	12.04.2002	Hindus are real enemy of Hindu.
4.	-do-	12.04.2002	Hindus are dead & culprits are Hindus
5.	Saamna	11.03.2002	Gandhar to Godhra. Islamic world is involved in Terrorism.
6.	-do-	12.03.2002	Instigation came from the Mosque to burn Ramsevaks in Godhra.
7.	-do-	15.03.2002	Godhra fire incidence is Islamic Tradition.
8.	-do-	15.03.2002	Recognized thefts at Ayodhya.

Dhaka University Institutional Repository

9.	-do-	21.03.2002	Godhra incidence took place because Ramsevak kidnapped Muslim girl.
10.	-do-	09.04.2002	Sangh Branches increased in Gujarat after riot.
11.	-do-	17.04.2002	Hindustani Muslim not problems but disaster.
12.	-do-	17.04.2002	Hindus goodness is in the hands of polite Hindus.
13.	Vishwamitra	04.03.2002	Lots of Mosques Destroyed, Females are raped, Govt. supplying petroleum articles to goondas team.
14.	-do-	06.03.2002	Effects of Gujarat riots reached upto Muslim justice of High Court.
15.	-do-	07.03.2002	Hindus value is Rs. Two lakhs and Muslim value is only one lakh in Gujarat.
16.	-do-	09.03.2003	Violence in Gujarat started from the incidence of Sabarmati Express (The details investigation made by the Washington Post)
17.	-do-	10.03.2002	Killings of Musbms, Mr. Chandrababti Naidu disturbed, likely to withdraw Support to Vajpayee Government (Ayodhya is responsible for violence & blooding)
18.	-do-	11.03.2002	70 Crore Rupees damaged in only 12 days, will rich Gujarat becomes Beggar (Dangers reflections of Hindu terrorism & evil miracle).
19.	-do-	12.03.2002	Mr.Singhal, Togadiya & Ramchanrandas who are scare to Government & court are completely free. (Then why arrest of Mr. Kamran & Yunus Siddigi)
20.	-do-	13.03.2002	Caretaker of general people Aslam Bhure as given in tension to all others including central Govt. All are awaiting judgement of supreme court) (Emergency construction at judgement of Supreme court)
21.	-do-	14.03.2002	Supreme Court warns to Vishwa Hindu Parishad. Restricted not to interfere. Those who are taking political advantage of Hinduism are feared.

Dhaka University Institutional Repository

22.	-do-	16.03.2002	Ayodhya drama flops due to lack of effective dialogues, emotional scene & sweet music.
23.	-do-	03.04.2002	Collected Muslims addresses from Corporation, Telephone exchange & Election list (No relation between Godhra & Gujarat riots)
24.	-do-	05.04.2002	Godhra incidence; Received E-mail of important information of □Those Karsevak.
25.	-do-	08.04.2002	Vajpayee visited Gujarat, cried but could not cross □Laxman Rekha□ (Alert if tried to touch Mr. Modi)
26.	-do-	11.04.2002	Show the proof how your relative died in Gujarat riot otherwise help could not BE given. (Atrocities to Muslims in Gujarat from Modi)
27.	-do-	16.04.2002	□Vajpayee Sabse Bada Papi Hai, woh Girgit Ki Taraha rang badalta hai□ (Ramsevak themselves started Gujarat Riots)

The complainant alleged that all the above-impugned news items were damaging and intended to create disharmony. The complainant requested the Council to warn the respondent newspapers for inflaming communal passions.

Dhaka University Institutional Repository

খুর্জা দাঙ্গায় গণমাধ্যম ঃ

দাঙ্গা শুরু হবার দু সপ্তাহ পূর্ব থেকে শহরে ক্রমাগত বোমার বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু করা প্রচার-পত্রের অভিযান আরও উগ্র বিষ ছড়ান আরম্ভ করল। আর শুরু হল প্রভাতফেরী। ঐ প্রভাতফেরীর সময়ে যেসব শ্লোগান উচ্চারিত হত তাতে ধমক অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। শহরে উত্তেজনা ও আতঙ্ক প্রসারী ক্যাসেট বাজান হতে লাগল। দাঙ্গার খবরে পূর্ণ সংবাদপত্রে শহর ছেয়ে গেল। সংবাদপত্রগুলি ঐসব খবরে যথেষ্ট ঝাল-মশলা যোগ করার কাজ করত। কখনও আলীগড়, কখনওবা বদাঁয়ু থেকে নানা খবর আসতে লাগল। সর্বশেষ এল জাহাঙ্গীরপুরীর দাঙ্গার খবর এবং তার দুই দিন পরই খুর্জায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। আলীগড়েরর দাঙ্গার পর খুর্জার হিন্দু পুরুষদের ভিতর সিদুঁর ও চুড়ি বিতরণ করা হল এবং বলা হতে লাগল যে তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ আশে-পাশেই তাদের স্বধর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে অথচ তারা এর প্রতিশোধ নিচ্ছেনা। " শেষ পর্যন্ত ১৪ ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে এক মুসলমান যুবককে ছুরিকাঘাত করা হর। 'আজ' পত্রিকায় ইতিপূর্বে খবর ছাপা হয়েছিল যে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে। সেই আজ পত্রিকা আবার 'যাচাই করে' খবর ছাপল যে ছুরিকাহত যুবকটির মৃত্যু ঘটেছে। যুবকটির নাম সলীম। কোন দপ্তরের কেরানী সে। তার মৃত্যুসংবাদটিও ছিল নিছক গুজব। 'যাচাই করে' ঐ মিথ্যা খবর ছেপে 'আজ' উত্তেজনা ও বিদ্বেষ বাড়ানোর ব্যাপারে নিজের যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করলো। খবর ছাপার পর দিনই ১৫ ই ফেব্রুয়ারী শহরে দাঙ্গা বেধে গেল। ঐ দিন আবার শহরে অযোধ্যায় মৃত করসেবকদের অস্থি-কলস পৌঁছাবার কথা। দাঙ্গা লাগার অপর একটি কারণ হল এদিনই খুর্জায় প্রথম দাঙ্গার সময়ে এ ভাবে ১০-১৫ লাখ এবং দ্বিতীয় বারে ৯০ লাখ টাকা এই ভাবে বাজী ধরে সংগৃহীত হয়।" (৬)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ১৯৯২, ১৯৯০ ও ১৯৬৪ সালে গণমাধ্যম

জানুয়ারী ১৯৯০ ইনকিলাব

১. ১৯৯০ সালের পহেলা জানুয়ারী নরসিংদীর টাউন হলে আইনজীবি সমিতির একটি সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী।

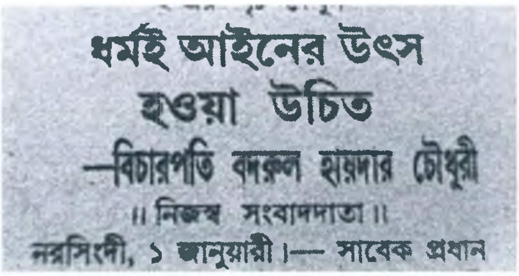

ধর্মই আইনের উৎস হওয়া উচিত
—বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী
॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ॥
নরসিংদী, ১ জানুয়ারী।— সাবেক প্রধান

১.

টাউন হলের দেয়ালে একটি পোষ্টার লাগানো ছিল তাতে লেখা 'ধর্মই আইনের শক্তি' । পোস্টারটি দেখে বিচারপতি তার বক্তব্যে বলেছিলেন " জীবনে অনেক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে গিয়েছি এত ভালো শ্লোগান চোখে পড়েনি। সামাজিক অনুষ্ঠান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়নে ধর্মই আইনের উৎস হওয়া উচিত। আল্লাহ মানুষকে সর্বোচ্চ বিচারের ক্ষমতা দেননি। তিনি নিজেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। ফিলিপাইনের সুপ্রীম কোর্ট প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট মার্কোসকে সেদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করেছিলো। কিন্তু তবু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার পতন ছিলো লক্ষ্যনীয়। তাই মানুষের উপর নির্ভর করা যায়না। " **১. ইনকিলাব ২.১.১৯৯০/ পৃষ্ঠা-১**

২. সেই সময়ের পত্রিকায় এভাবেই ধর্মীয় সম্মেলনের দাওয়াত ছাপানো হতো। ইনকিলাব ২.১.১৯৯০/ পৃষ্ঠা-১

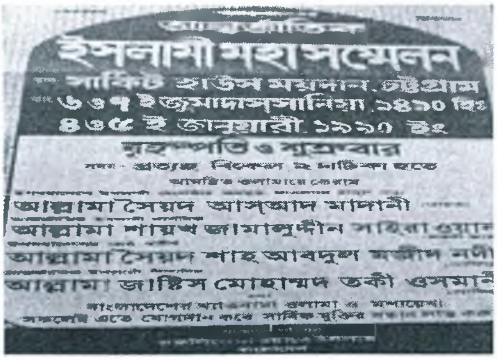

ছবি ২

Dhaka University Institutional Repository

৩. সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ শিরোণামে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে ৪ কলামের। তাতে সে সময়ে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাবরী মসজিদ ইস্যুতে বাংলাদেশের নীরব থাকার কারণ হিসেবে বলেছেন এ দেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিরা ভারতের তাবেদারী করছে। " কিন্তু চিহ্নিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিজীবি মহল তাদের বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে অতি ভারতীয় প্রীতি বজায় রাখবার জন্য ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত চক্রান্তে নিশ্চুপ থেকে বাংলাদেশীদেরকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রুপে বিকৃত অর্থে চিহ্নিত করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরা মিথ্যাচারত করছেন বটেই, সত্যিকার অর্থে এরাই কি মোনাফেক নন? ইনকিলাব ৩.১.১৯৯০/ আর্টিকেল সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ / লেখক এনামুল হক।

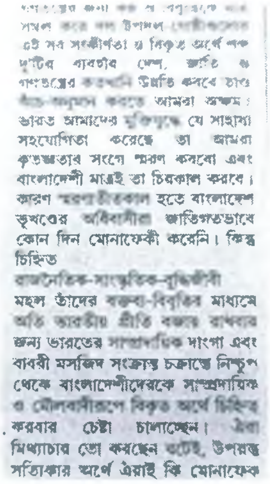
ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তা আমরা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করবো এবং বাংলাদেশী মাত্রই তা চিরকাল করবে। কারণ স্মরণাতীতকাল হতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা জাতিগতভাবে কোন দিন মোনাফেকী করেনি। কিন্তু চিহ্নিত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিজীবী মহল তাঁদের বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে অতি ভারতীয় প্রীতি বজায় রাখবার জন্য ভারতের সাম্প্রদায়িক দাংগা এবং বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত চক্রান্তে নিশ্চুপ থেকে বাংলাদেশীদেরকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীরূপে বিকৃত অর্থে চিহ্নিত করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ঐরা মিথ্যাচার তো করছেন বটেই, উপরন্তু সত্যিকার অর্থে ঐরাই কি মোনাফেক

ছবি ৩ আর্টিকেল এর শেষ অংশের লেখা

৪. ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে খুশী করতে ইসলামী ভার্সিটি সরানোর এই চক্রান্ত শিরোণামে একটি সংবাদ সেই সময় দীর্ঘদিন দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে রেখেছিল। যেটি কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেটি প্রথমে গাজীপুরে তৈরীর কথা ছিল। পরে তা অন্যত্র স্থানান্তরের প্রশ্নে দেশের কট্টরপন্থীরা বারবারই আঙ্গুল তুলেছে ভারতের সাম্প্রদায়িকতার প্রতি।

৪.১

ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে খুশী ক
ইসলামী ভার্সিটি সরানোর এই চ

৪.২

সংবাদ ও ছবি দুটি ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে নেয়া ২৬.১.১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

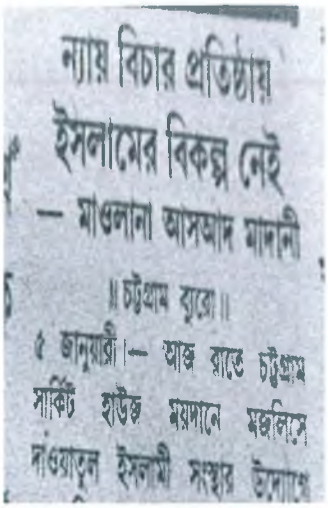
ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিকল্প নেই
— মাওলানা আসআদ মাদানী
॥ চট্টগ্রাম ব্যুরো ॥
৫ জানুয়ারী।— আজ রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ ময়দানে মজলিসে দাওয়াতুল ইসলামী সংস্থার উদ্যোগে

সে সময়ের পত্রিকায় ধর্ম প্রচার করে সাম্প্রদায়িকতা তৈরির আরো একটি উদাহরণ। এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করে ধর্মীয় কট্টোর মনোভাব তখন উস্কে দেয়া হতো। ৬.৩.১৯৯০ পৃ.১ । ছবি ৫

৬. জানুয়ারী মাসে ভারত শাষিত কাশ্মিরে সহিংস পরিস্থিতি নিয়ে এই পত্রিকাটির কয়েকটি উস্কানীমুলক সংবাদের প্রমান ।

৬.

THE DAILY
কার্ফ্যু অমান্য করে বিক্ষোভ ঃ সংঘর্ষ ঃ আরো কার্ফ্যু
মুসলিম পুলিশের বিদ্রোহ ঃ কেন্দ্রের কাছে আরো সৈন্য প্রার্থনা
মসজিদে মসজিদে জেহাদের ডাক
শ্রীনগর বিদ্রোহ নগরীতে পরিণত
মধ্যে জরুরী অবস্থা তুলে নিতে হবে ঃ পার্লামেন্টে

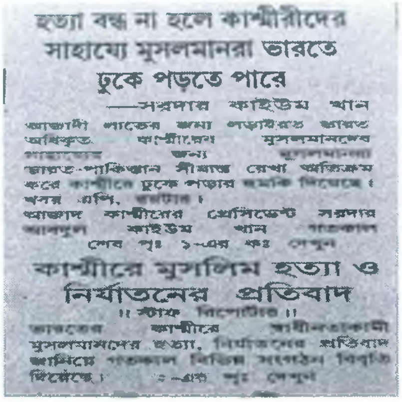
হত্যা বন্ধ না হলে কাশ্মীরীদের সাহায্যে মুসলমানরা ভারতে ঢুকে পড়তে পারে
—সরদার কাইউম খান
শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন
কাশ্মীরে মুসলিম হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ
॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥
২-এর পৃঃ দেখুন

প্রথম সংবাদটির হেডিং মসজিদে মসজিদে জেহাদের ডাক, শ্রীনগর বিদ্রোহ নগরীতে পরিণত একই দিনের পত্রিকায় দ্বিতীয় হত্যা বন্ধ না হলে কাশ্মীরীদের সাহায্যে মুসলমানরা ভারতে ঢুকে পড়তে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তারপরেই দেখা যাচ্ছে আরো একটি সংবাদ তাতে লেখা কাশ্মীরে মুসলিম হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদ। ২৩ জানুয়ারী পৃষ্ঠা ১.

৭. সংবাদের হেডিং / কাশ্মীর থেকে হিন্দু-ভারতের শাসন উৎখাতে জেহাদী মুসলিমদের আজাদীর লড়াই শুরু। এর উপরে ক্যাপশনে লেখা রয়েছে শ্রীনগরে মুজাহিদদের ইসলামী হুকুম জারিঃ সিনেমা হল, বার- রেস্তোরাঁ ও ভিডিও দোকান বন্ধ। ২৬ জানুয়ারী আন্তর্জাতিক পাতা

কাশ্মীর থেকে হিন্দু-ভারতের শাসন উৎখাতে
জেহাদী মুসলিমদের আজাদীর লড়াই শুরু

ছবি ৭

৮

বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার ঃ লড়াই ঃ প্রতিরোধ দিবস
ইসলামী বিশ্ব ও জাতিসংঘের প্রতি আহবান

কাশ্মীরে মুসলিম হত্যা
বন্ধে হস্তক্ষেপ করুন

ছবি ৮. ১৯৯০ সালে কাশ্মীর স্বাধীন হওয়ার জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিল তাতে কাশ্মিরে বসবাসরত হিন্দু মুসলমান উভয়েই সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এদেশের পত্রিকায় পক্ষপাতিত্ব মুলক সংবাদ প্রকাশে মুসলমানদের উসকে দেয়ার পথ তৈরি করে। ২৯.১.১৯৯০ ইনকিলাব।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙবার পর থেকে বাংলাদেশের একটি পত্রিকার প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ। ১৯৯২

<u>০৭.১২.১৯৯২ (২)</u>

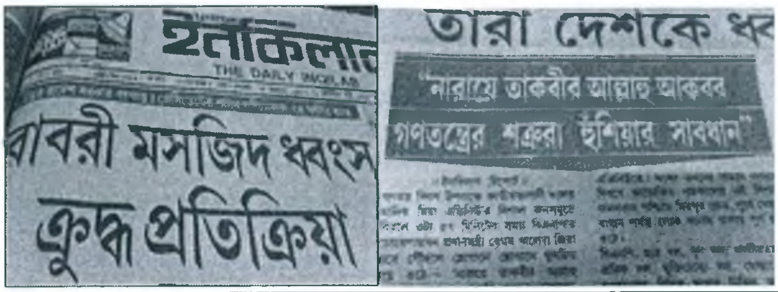

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পরদিন ঢাকায় প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাবের হেডলাইন. ১. বাবরী মসজিদ ধ্বংস ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। ২. "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর গণতন্ত্রের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান"

<u>০৮.১২.১৯৯২ (৯)</u>

তৃতীয় দিন ফলাও করে ছাপা হয়েছিল সারা ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শতাধিক নিহত আহত ১ হাজার। এবং আরেকটি সংবাদ সারা বিশ্বের মুসলমান মর্মাহত বলে জানিয়েছেন ওআইসি মহাসচিব। শত শত বছরের পুরণো মসজিদ ভেঙ্গে ফেললে মুসলমানরা মর্মাহত হবে সেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ খবর প্রচার করলে যে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি তৈরী হবে সে সংবাদটি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন ছিল। বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানের মত বাংলাদেশের মুসলমানরাও আকস্মিকভাবে বেদনা বোধ করবে। কিন্তু প্রতিবেশি রাষ্ট্রের এই জের যে এদেশের মুসলমানরা সংখ্যালঘুদের উপর প্রতিশোধ হিসেবে নিতে চাইবেনা এটাত পত্রিকার বোঝা উচিত। ফলাফল যা হবার তাই হয়েছিল। একই দিনের পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য সংবাদ থেকেই তার প্রমান।

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলমান
ভারতে সৃষ্ট পরিস্থিতির ওপর

১. বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলমান।

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গায় বিভিন্ন মহলের নিন্দা ঃ সম্প্রীতি বজায় রাখার আহবান

২ . বাবরী মসজিদ ভাঙ্গায় বিভিন্ন মহলের নিন্দা ঃ সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান। ৩. দাঙ্গার সময় অগ্নিসংযোগের ছবি।

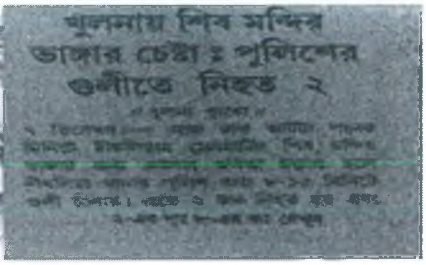
খুলনায় শিব মন্দির ভাঙ্গার চেষ্টা ঃ পুলিশের গুলীতে নিহত ২

৪. বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে গতকাল বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে জামায়াত এ ইসলামীর সভা। ৫. খুলনায় শিব মন্দির ভাঙ্গার চেষ্টা ঃ পুলিশের গুলিতে নিহত ২। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনায় বায়তুল মোকাররমে একটি দলের সভা এবং প্রতিবাদ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিন্তু সভা অপেক্ষা দেশের মধ্যে একটি মন্দির ভেঙ্গে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২ জন নিহত হওয়ার সংবাদটি নিসন্দেহে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ন। একই দিনের পত্রিকায় দুটি সংবাদ প্রকাশের উপর ট্রিটমেন্ট দেখলেই স্পষ্ট হয় সেদিন ওই পত্রিকার কাছে আসলে কোনটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। যদি সাম্প্রদায়িকতা উস্কে না দেয়ার অভিপ্রায়ে খুলনার ঘটনাটি ছোট করে ছাপানো হয়ে থাকে তবে জামায়াতে ইসলামীর সভার সংবাদটি এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

৬. বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পরের দিন অর্থাত ৭ ডিসেম্বর বিক্ষুব্ধ রাজধানীর চিত্র। ৭. ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শিরোণামে সংবাদ। এই সংবাদের দ্বিতীয় প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে, " রয়টার, এফপি, এপি, বিবিসি প্রদত্ত খবর অনুযায়ী ভারতে হাজার হাজার উগ্র হিন্দু কারফিউ উপেক্ষা করে বাবরী মসজিদ এলাকা দখল করে রেখেছে। তারা কারফিউর মধ্যে রাতারাতি মসজিদের ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে ফেলে সেখানে মন্দির নির্মানের কাজ শুরু করে দিয়েছে। মসজিদের জায়গায় উগ্র হিন্দুরা উল্লাসে মেতে উঠেছে। তারা মুছলমানদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। তারা বলছে যেমন করে বাবরী মসজিদ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি তেমনি করে ভারত থেকে মুসলমানদের উৎখাত করবো। সংবাদদাতারা জানান, হিন্দু সাধুরা নিকটতস্থ সরযু নদী থেকে পানি এনে মসজিদের জায়গাটি পবিত্র করে এবং সেখানে রামের একটি মূর্তি স্থাপন করেছে। তারা বলছে ঠিক মসজিদের যায়গায় একটি মন্দির গড়ে তোলা হবে।" যখন দেশের কোটি কোটি মুসলমান মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার কারণে মর্মাহত তখন পুংখানুপুংখ এই সব বর্ণনা নিসন্দেহে তাদের উসকে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতায়। সাম্প্রদায়িকতা শুধু একটি ঘটনা থেকেই তৈরী হয়না। সেই ঘটনাকে যখন সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করে প্রচার করা হয় তখন তা ছড়িয়ে পড়ে। আর বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার সময় এই প্রচারের কাজটি করেছিল কিছু সংবাদমাধ্যম।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১২.৯২ (৮)

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অব্যাহত ঃ নিহত ৫০০

পাকিস্তান ও বৃটেনে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ

১. ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অব্যাহত। ২. পাকিস্তান ও বৃটেনে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ।

এ ঘটনা বিশ্বের শত কোটি মুসলমানের অনুভূতিতে চরম আঘাতস্বরূপ
—ছারছীনার পীর ছাহেব

ছারছীনার পীর ছাহেব হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ এক বিবৃতিতে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করায় তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও বিক্ষোভ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের দ্বারা বিশ্বের শত কোটি মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রচণ্ডভাবে ও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানা হয়েছে। তিনি

উচ্ছৃংখল তরুণদের হাতে দু'জন যুবক প্রহৃত
॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

গতকাল সন্ধ্যায় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির তোপখানা রোডস্থ অফিসের সামনে একদল উচ্ছৃংখল তরুণের হাতে পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত দু'জন যুবক প্রহৃত হন। ঘটনার সময় একটি মিছিল জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ঘাদানি কমিটির পক্ষে স্লোগান দিতে দিতে নির্মূল কমিটির অফিসের দিকে যাচ্ছিল। সে সময় দু'জন যুবক পাজামা পাঞ্জাবী পরে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে মিছিল থেকে উচ্ছৃংখল যুবকরা জামায়াত জামায়াত ধর ধর বলে পাজামা পাঞ্জাবী পরা নিরপরাধ যুবক দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বেদম প্রহার করতে থাকে। পরে পুলিশ এসে যুবক দু'জনকে

৩. এ ঘটনা বিশ্বের শত কোটি মুসলমানের অনুভূতিতে চরম আঘাতস্বরুপ- ছারছীনার পীর ছাহেব। ৪. উচ্ছৃংখল তরুনদের হাতে দু'জন যুবক প্রহৃত। প্রথম সংবাদে ছারছীনা পীর ছাহেব অবিলম্বে ওই স্থানে মসজিদ নির্মানের যে দাবি জানিয়েছেন তা সমর্থন যোগ্য কিন্তু তারপরই যে ভারতকে বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন তাকি সহজে সমর্থন যোগ্য? নিসন্দেহে বাবরী মসজিদ সাংঘাতিক একটি মর্মাহত ঘটনা কিন্তু যে দেশ স্বাধীনতার সময় সবার আগে সমর্থন দিয়েছে সেই দেশকে একটি ইস্যুতে বয়কটের ঘোষণায় রাজনীতি কতদূর যেতে পারে তা তিনি ভেবে বলেছিলেন কিনা যানা নেই কিন্তু পত্রিকা তা বক্স করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপেছিল। দ্বিতীয় সংবাদে ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটির অফিসের সামনে পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত দুই যুবকের প্রহৃত হওয়ার খবর। এটা বেশ ভালো একটা উপায় উস্কানী না দিয়েও উস্কে দেয়ার। ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে কথা বলে আসছে সেই বিষয়ে কালিমা লেপনের উদ্দেশ্যে যোগ সংযোগ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে ৫. রাজধানীর পুরাণা পল্টনে এক হিন্দু বাড়িতে অগ্নি সংযোগের পর দ্বিতীয় তলা থেকে বাড়ীর এক মহিলা সদস্যকে মই দিয়ে নামানোর দৃশ্য। ৬. পুরাণা পল্টনে মরনচাঁদ এন্ড সন্স মিষ্টির দোকানে ভাংচুরের পরের দৃশ্য।
৯/১২/১৯৯২

বিটিভি সিএনএন-এর খবরে বাবরী মসজিদ আক্রমণের ছবি দেখাচ্ছে না

[illegible]

মার্ক টালির রিপোর্ট

নতুন বসানো রামমূর্তির সামনে হিন্দু পুলিশ প্রার্থনা শুরু করে

[illegible]

৭. বিটিভি সিএনএন-এর খবরে বাবরী মসজিদ আক্রমনের ছবি দেখাচ্ছেনা। " বাংলাদেশ টেলিভিশন, সিএনএন-এর খবর দেখানোর সময় বাবরী মসজিদ আক্রমনে ছবি দেখাচ্ছেনা। কিন্তু কথা হলো এতে কি লাভ হচ্ছে? বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এর বিস্তারিত খবর জনসাধারণের অজানা থাকছেনা।" মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে, যখন বিশ্বের সব দেশ থেকে প্রতিবাদ হচ্ছে তখন মসজিদ ভাঙ্গার ছবি না দেখিয়ে বিটিভি ও সিএনএন নিশ্চয়ই

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িকতাকে নিয়ন্ত্রন করতেই চেয়েছে। কিন্তু সেদিকেও খুচিয়ে খুচিয়ে মর্মাহত মানুষের মনে ক্ষোভটাকে আরো উসকে দিয়েছে গণমাধ্যম।

৮. নতুন বসানো রামমূর্তির সামনে হিন্দু পুলিশ প্রার্থনা শুরু করে। মঙ্গলবার ভোরে আধাসামরিক বাহিনী অযোধ্যায় পৌছায়। এসময় এক পুলিশ রামের মূর্তি দেখে প্রার্থনা শুরু করে। মার্ক টালির রিপোর্ট থেকে এ সংবাদ ছাপা হয়। আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে যেখানে রামের মূর্তি মসজিদ ভেঙ্গে তারা বসাতে পেরেছে সেখানে একই ধর্মীয় অনুশাষনের এক পুলিশ প্রার্থনা করতে পারে এতে ত নতুন করে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নাকি পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে আসলে প্রশাসন বা নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছিল? কিন্তু শিরোণাম এভাবে দিয়ে সংবাদ প্রকাশ উদ্দেশ্যমূলক সেটা নিশ্চিত।

১০.১২.৯২

ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ৭৫০

বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়া

কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা তিন ব্যক্তি নিহত

১. ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ৭৫০

২. কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা, তিন ব্যক্তি নিহত।

১০/১২/১৯৯২

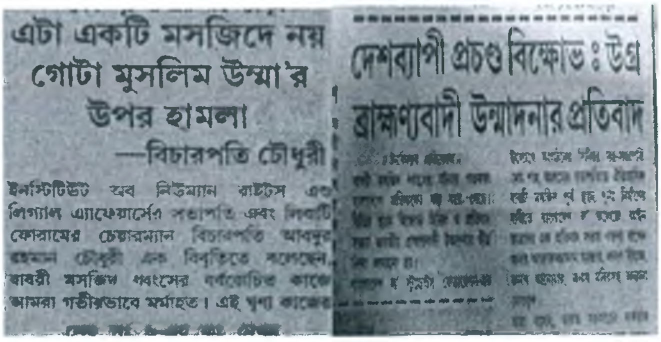

এটা একটি মসজিদে নয় গোটা মুসলিম উম্মা'র উপর হামলা
—বিচারপতি চৌধুরী

ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস এণ্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্সের সভাপতি এবং ... ফোরামের চেয়ারম্যান বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের বর্বরোচিত কাজে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এই ঘৃণ্য কাজের

দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভ ঃ উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী উন্মাদনার প্রতিবাদ

১. এটা একটা মসজিদ নয় গোটা মুসলিম উম্মা'র উপর হামলা।

২. দেশব্যাপী প্রচন্ড বিক্ষোভ ঃ উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী উন্মাদনার প্রতিবাদ।

১০/১২/১৯৯২

১১.১২.৯২ (২)

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ভারতে ভয়াবহতম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় নিহত ১ হাজার ঃ রাস্তায় লাশ

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় বাবরী মসজিদ

শেখ দরবার আলম

১. ভারতে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় নিহত ১ হাজার ঃ রাস্তায় লাশ

২. ভেতরের পাতায় ছাপা প্রবন্ধ / অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হয়েছে। এই প্রবন্ধের একটি প্যারা উল্লেখ করছি। মুসলমানদের জন্য ভালো কিছু করতে চাইলে তারা করতে পারতেন। কিন্তু এরা তা করেননি। বাবরী মসজিদে নামায পড়ার অধিকার কেড়ে নিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল জওহরলাল নেহেরুর আমলে। আর বাবরী মসজিদ এলাকায় রাম মন্দিরের শিলা ন্যাস করা হয়েছিল রাজীব গান্ধীর আমলে।---- লেখকের যুক্তি গ্রহন করছে ইতিহাস পর্যালোচনার উপরে কিন্তু এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে এ ধরনের সমীকরণ তুলে ধরে উস্কে দেয়াত সংবাদ মাধ্যমের নীতিতে পড়েনা।

Dhaka University Institutional Repository

১২.১২.৯২ (২)

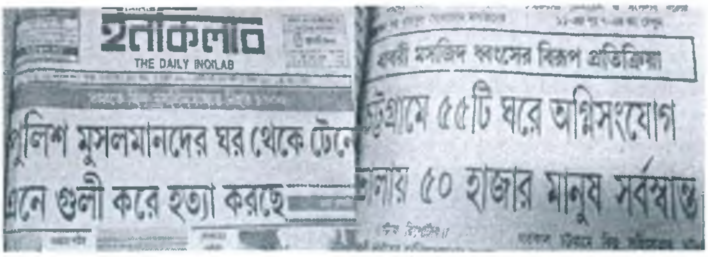

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
বাবরী মসজিদ ধ্বংসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া
পুলিশ মুসলমানদের ঘর থেকে টেনে এনে গুলী করে হত্যা করছে
ট্টগ্রামে ৫৫টি ঘরে অগ্নিসংযোগ
লায় ৫০ হাজার মানুষ সর্বস্বান্ত

১. পুলিশ মুসলমানদের ঘর থেকে টেনে এনে গুলী করে হত্যা করছে।

দৃষ্টি আকর্ষন করছি এই হেডিংটির দিকে। এটি ছিল হেডলাইন। এমন শিরোণাম পড়ে যে কোন মুসলমান যদি তার প্রতিবেশি হিন্দুর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় তবে এর জন্য কি সংবাদ মাধ্যম অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ি নয়?

২. চট্টগ্রামে ৫৫ টি ঘরে অগ্নিসংযোগ, ভোলায় ৫০ হাজার মানুষ সর্বসান্ত

১৩.১২.৯২(২)

জগন্নাথ হলের সামনে শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম লাঞ্ছিত
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ভারতকে এক মারাত্মক সঙ্কটে নিক্ষেপ করেছে
—সিপিআই

১. জগন্নাথ হলের সামনে শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আবুল কালাম লাঞ্চিত। খবরটি যদি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাঞ্ছিত খবর হিসেবে ছাপা হতো তবে উদ্দেশ্যমূলক হতোনা।

২. হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ভারতকে এক মারাত্মক সঙ্কটে নিক্ষেপ করেছে-- সিপিআই

Dhaka University Institutional Repository

১৪.১২.৯২ (২)

বাবরী মসজিদ ধ্বংসে ইসলামের প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ

ওলামা মাশায়েখদের প্রতিবাদ সভা

বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের এজেন্টরা মাওলানা আজিজুল হকের উপর হামলা করেছে

১. বাবরী মসজিদ ধ্বংস ইসলামের প্রতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জ / কাতারের এই সংবাদটির উপরে লিখা ছিল ভারতে দাঙ্গায় নিহতদের দুই-তৃতীয়াংশই মুসলমান।

২. বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের এজেন্টরা মাওলানা আজিজুল হকের উপর হামলা করেছে।

১৫.১২.৯২ (২)

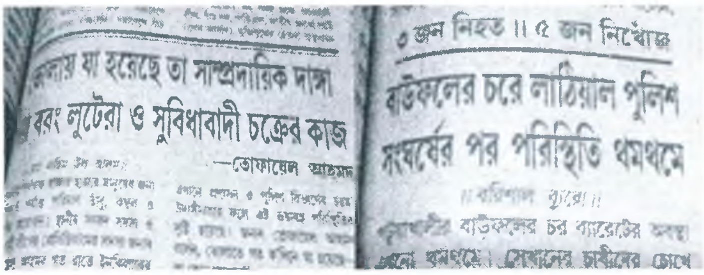

যা হয়েছে তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বরং লুটেরা ও সুবিধাবাদী চক্রের কাজ

—তোফায়েল আহমদ

৩ জন নিহত ।। ৫ জন নিখোঁজ

বাউফলের চরে লাঠিয়াল পুলিশ সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি থমথমে

১. ভোলায় যা হয়েছে তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয় বরং লুটেরা ও সুবিধাবাদী চক্রের কাজ-- তোফায়েল আহমদ

২. বাউফলের চরে লাঠিয়াল পুলিশ সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি থমথমে/ ৩ জন নিহত। ৫ জন নিখাঁজ ১৫/১২/১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

১৮ তারিখের পত্রিকায় 'সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা শিরোণামে' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর একটি লেখা ছাপা হয় । এটি ১৯২৮ সালে সওগাত পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল/ সওগাত ১৩৩৪ আষাঢ় (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ)। দেশে সাম্প্রদায়িক উষ্ণ অবস্থার ভেতর এমন লেখা ছাপানো উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা রাখেনা। লেখার শেষ প্যারাটি আমি উল্লেখ করছি।

' পারিবারিক জীবনে যাহা ঘটিতেছে, জাতীয় জীবনেও তাহা ঘটিতে পারে। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, সমষ্টিরুপে সে তেমনি আপনার বিচিত্র আশা-আকাংখা ও স্বতন্ত্র সত্তা প্রকাশ করিতে লালায়িত হয়। সহোদোর যেমন সহোদরের সাথে বিরোধ করে, আপনার অস্তিত্ব ও অধিকারের জন্য মুসলমানের পক্ষেও তেমনই হিন্দুর সাথে কলহ বিচিত্র কিছু নহে। হিন্দুর স্বার্থপরতা হইতে ইহার জন্ম মুসলমানের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকাশের চিন্তা হইতে ইহার উৎপত্তি।' লেখার একেবারে শেষের লাইনে শব্দ দুটি লক্ষ্য করা যাক। এখানে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা বোধের উন্মেষে লেখক হিন্দুদের ক্ষেত্রে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হলো 'স্বার্থপরতা' এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে বলেছেন আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকাশ। এই আত্মচেতনা থেকেত হিন্দুদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা আসতে পারে লেখক সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে দোষারোপ করেছেন সাম্প্রদায়িকতার দায়ভার শুধুই হিন্দুদের। তবে এ লেখাটি বাবরী মসজিদ সমস্যা তৈরি হওয়ারও ৬৪ বছর আগে লেখা একটি প্রবন্ধ। ৬৪ বছর পর একটি সংকটকালিন সময়ে সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ একটি লেখা ইনকিলাব কেন ছেপেছিল সেটা একমাত্র সম্পাদকই বলতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গুলীর মুখেও আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে ফিলিস্তিনীরা স্বদেশের পথে এগুচ্ছে

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ভারত সেখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে

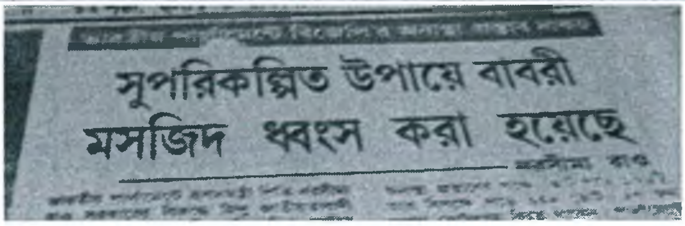
সুপরিকল্পিত উপায়ে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে

১. গুলীর মুখেও আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে ফিলিস্তিনীরা স্বদেশের পথে এগুচ্ছে ২২/১২/১৯৯২

২. ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ভারত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ২৫/১২/১৯৯২

৩. সুপরিকল্পিত উপায়ে বাবরী মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে---নরসীমা রাও।

৩১.১২.৯২ (২)

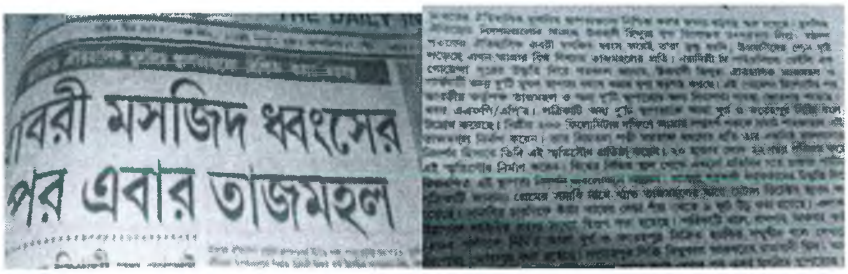
বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর এবার তাজমহল

১. বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর এবার তাজমহল

এ সংবাদে উল্লেখ করা হয়- ষষ্ঠদশ শতকের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করেই তারা তৃপ্ত হয়নি। উগ্রবাদীদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে এখন আগ্রার তাজমহলের প্রতি। নয়াদিল্লী দ্য পাইওনিয়ার ডেইলি এক গোয়েন্দা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে গতকাল জানান, উগ্রবাদী হিন্দুরা ঐতিহাসিক তাজমহল ও পার্শ্ববর্তী অন্যদুটি মুঘল স্থাপত্য ধ্বংস করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪ দৈনিক আজাদ

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে ভারত শাষিত কাশ্মীরে হযরত বাল মসজিদ থেকে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর কেশ চুরি যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এর পর পরই প্রভাব পরে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে পূর্ব পাকিস্তানে। একদিকে কলকাতা, ২৪ পরগনা থেকে হাজার হাজার শরণার্থী প্রবেশ করছে সীমান্ত শহরে সেই সাথে দেশের ভেতরে শুরু হয়েছে দাঙ্গা তবে এ দাঙ্গা তৈরিতে সেই সময়ের সরকারের ইন্ধন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দাবি -দাওয়া চাহিদা থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করতে মোনায়েম খান সরকার তখন আদমজী শ্রমিকদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালাতে। সংখ্যাগুরু মুসলমানরাও তখন একেবারে যে রেহাই পেয়ে গেছেন তা নয়। তবে মূল সন্ত্রাসটা হয়েছিল হিন্দুদের সাথে বহিরাগত বিহারী শ্রমিকদের। কিন্তু নির্যাতনের সংখ্যা ভয়াবহ হলেও সমসাময়িক পত্রিকায় তা সঠিকভাবে প্রকাশ না করে বরং কাশ্মীরের মুসলমানদের উসকে দিয়েছে। এদেশের সাধারণ মুসলমানদের ক্রোধ বাড়িয়ে তুলেছে। মানুষের মনে কট্টোর ধর্মীয় মনোভাব জাগিয়েছে। আর এর সবকিছুই সরকারের সন্তুষ্টির জন্য।

দৈনিক আজাদ ৪ জানুয়ারী ১৯৬৪।

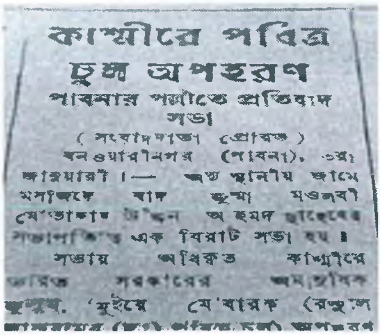
কাশ্মীরে পবিত্র চুল অপহরণ

পাবনার পল্লীতে প্রতিবাদ সভা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

... (পাবনা), ৩রা জানুয়ারী।— অদ্য স্থানীয় জামে মসজিদে বাদ জুম্মা মওলবী ... সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। সভায় অধিকৃত কাশ্মীরে ভারত সরকারের অমানুষিক জুলুম, 'মুইয়ে মোবারক ...

কাশ্মীরে পবিত্র চুল অপহরণ সংবাদ / " ভারত সরকারের অমানুষিক জুলুম, মুইয়ে মে'বারক (রসুল আকরমের (দঃ)পবিত্র চুল) অপহরণ ও দরগা শরীফ ভস্মীভূত।"

Dhaka University Institutional Repository

১০ জানুয়ারী ১৯৬৪

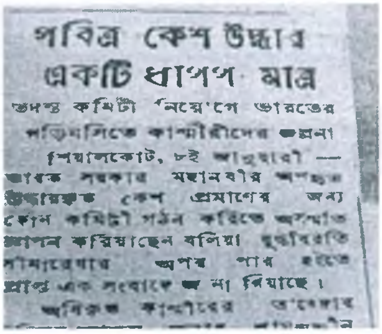

পবিত্র কেশ উদ্ধার একটি ধাপ্পা মাত্র

শিয়ালকোট, ৮ই জানুয়ারী —

১০ জানুয়ারী ১৯৬৪ পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রকাশিত হয় ' পবিত্র কেশ উদ্ধার একটি ধাপ্পা মাত্র' । সংবাদের শেষ অংশটুকু উল্লেখ করছি। ' উদ্ধারকৃত কেশ প্রমানের জন্য কাশ্মীরীরা তদন্ত কমিটি গঠনের যে দাবি জানাইয়াছে দিল্লী কর্তৃপক্ষ সরাসরি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। কাজেই ভারত সরকার কর্তৃক তদন্ত কমিটি নিয়োগে টালবাহানা করায় কাশ্মীরিদের মনে এই ধারণা আরো বধ্যমূল হইয়াছে যে কেশ উদ্ধারের ব্যাপারটি নিছক ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়।'

তবে এ সময়ের মধ্যে শুরু হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের উপর শুরু হয় নির্যাতন। কাশ্মীরে মুসলমানদের যতটা না হয়েছে তাকে আরো অধিক উস্কে দিয়ে প্রচার করেছে এদেশের ইসলাম ঘেষা পত্রিকা। কিন্তু নিজের দেশে যখন সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে তখন চেষ্টা করা হয়েছে যতটা সম্ভব ধামাচাপা দেয়ার। এমনকি প্রতিবেশী দেশে এ সংবাদ প্রচারিত হলে তা ভিত্তিহীন বা অপপ্রচার বলেই দেখিয়েছে কিছু পত্রিকা। যেমন : ১২ জানুয়ারী পত্রিকার সংবাদ অনুসারে উল্লেখ করা হয় খুলনায় সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় পত্রিকাসমূহে যেসকল খবর প্রকাশিত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সংযোগ উজির জনাব খান এ সবুর গতরাত্রে তার প্রতিবাদ করেন। ১২/১/১৯৬৪. দৈনিক আজাদ.

১৯৬৪র দাঙ্গায় দক্ষিণাঞ্চলের সংখ্যালঘুদের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন হয়েছিল এ কথা যেমন ইতিহাসে রয়েছে তেমনি খান এ সবুর তৎকালিন পাকিস্তান সরকার নিযুক্ত নাজির যে সরকারের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে আক্রমনের কথা স্বীকার করবেনা সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পত্রিকা সে সংবাদ ফলাও করে ছেপেছিল।

১২/১/১৯৬৪. দৈনিক আজাদ.

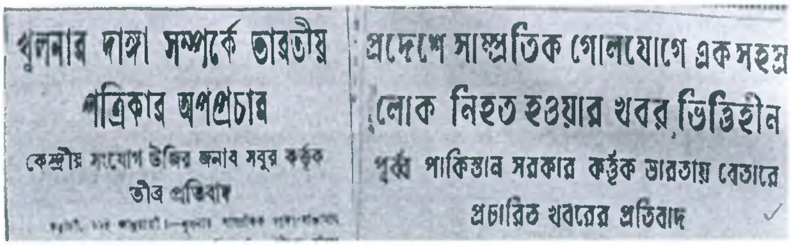

<u>দৈনিক আজাদ ১৪ জানুয়ারী ১৯৬৪ / প্রথম ও তৃতীয় পৃষ্ঠা -</u>

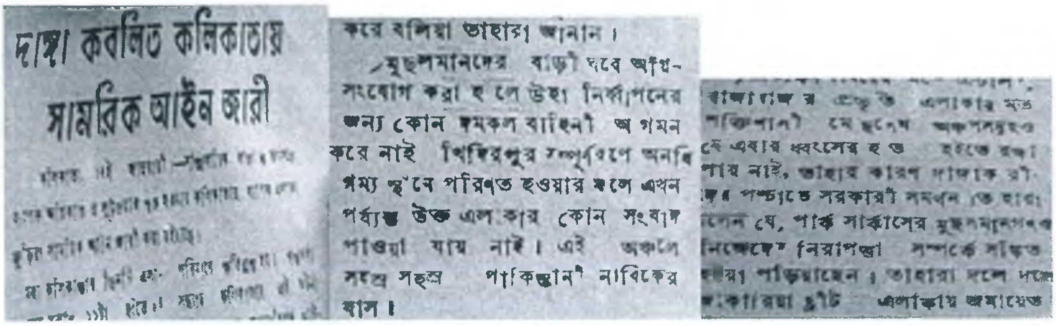

দাঙ্গা কবলিত কলিকাতায় সামরিক আইন জারী সংবাদটির অংশ বিশেষ। " মুসলমানদের বাড়ী ঘরে অগ্নি সংযোগ করা হলে উহা নির্বাপনের জন্য কোন দমকল বাহিনী আগমন করে নাই। খিদিরপুর সম্পূর্ণরুপে অনধিগম্য স্থানে পরিণত হওয়ার ফলে এখন পর্য্যন্ত উক্ত এলাকার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই অঞ্চলে সহস্র সহস্র পাকিস্তানী নাবিকের বাস।" একই সংবাদের শেষের কলামে উল্লেখ করা হয়েছে। " প্রত্যক্ষ দর্শীদ্বয়ের মতে এন্টালী, রাজাবাজার প্রভৃতি এলাকার মত শক্তিশালী মোছলেম অঞ্চলসমূহও যে এবার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই, তাহার কারণ দাঙ্গার পশ্চাতে সরকারী সমর্থন। তাহারা বলেন যে, পার্ক সার্কাসের মুছলমানগণও নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারা দলে দলে জাকারিয়া স্ট্রীট এলাকায় জমায়েত হইতেছেন। "

Dhaka University Institutional Repository

১৬ জানুয়ারী ১৯৬৪

তৎপরতার বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াক
মানবতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া
চৌধুরী নিহত
প্রতিরোধ করার জন্য
শপথ গ্রহণ

প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব কর্ত্তৃক মৌলিক
অধিকার বিলে স্বাক্ষরদান

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

তথ্য প্রকাশ করেন।
নূতন সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার
ফলে বর্তমান শাসনতন্ত্রে
সংযুক্ত করা হইবে।
পাকিস্তানকে
শাসনতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা
হইবে ও কোরান এবং
অনুযায়ী দেশের সমস্ত আইন প্রণয়ন
করা হইবে।

একই দিনের পত্রিকার সংবাদ. ১৬ জানুয়ারী ১৯৬৪ সালের পত্রিকায় হেডলাইনটি ছিল 'অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে পূর্ব্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াক '। এর নিচেই লেখা ছিল মানবতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া শান্তিকর্মী চৌধুরী নিহত। পাশের বক্সে লেখা দাঙ্গাকারীদের হটাও। এই বক্সে বিশেষভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লেখা সংবাদের কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি। ' আজকের দিনের শ্লোগান হলো, সকল ভালো মানুষ এক হও, খাটি পাকিস্তানি, আল্লাহর খাটি বান্দা, রসুলের খাটি উম্মত এক হও-গুন্ডাদের প্রতিহত কর, গুন্ডাদের চুরমার করে দাও'। সকলকে এই শপথ নিতে হবে পাকিস্তানের পাক মাটিতে শকুনী গৃধিনীর তান্ডব লীলা আর চলতে দেয়া যাবেনা। দৈনিক আজাদ ১৬/১/১৯৬৪।

এদিকে শান্তিকর্মী আমির হোসেন চৌধুরীর নিহত হওয়ার ঘটনার বিবরণে উল্লেখ করা আছে " আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী গতকল্য বুধবার গুন্ডাদের হামলা হইতে ঠাটারী বাজারের কতিপয় লোককে উদ্ধার করিতে গেলে গুন্ডারা তাহাকে ধাওয়া করে। তিনি গুন্ডাদের আক্রমনে বাধ্য হইয়া জিন্নাহ এভিনিউর দিকে দৌড়াইতে থাকিলে গুন্ডারাও কিছু কিছু ধাবিত হয়। জনাব চৌধুরী কাতর মিনতি করিয়া বলিতে থাকেন ' আমি একজন মুছলমান আমাকে মারিওনা '।"

একজন শান্তিকর্মী মানুষ যে অন্যের জীবন রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন সেই মানুষটি যখন শেষ মুহূর্তে নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে বলেন আমি একজন মুসলমান আমাকে মেরোনা তার অর্থত এমনটাই পরিস্কার হচ্ছে যে যারা তাকে আক্রমন করতে এসেছিল তারা মুসলমানদের

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমনের উদ্দেশ্যে হামলা চালায়নি। যদিও এই মহৎ হৃদয়ের মানুষটি প্রাণ দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার শেষ আকুতি থেকেই প্রমানিত হয় যে ১৯৬৪ সালে যারা হন্তারকের ভূমিকায় ছিলেন তারা মুসলমান সমর্থক এক শ্রেণীর গুন্ডা। সমসাময়িক সংবাদে কয়েকবার উল্লেখ আছে বহিরাগত হামলাকারী। তবে যানা যায় এই শ্রেণীটি আসলে ছিল আদমজীর বিহারী শ্রমিকরা। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু। নারায়নগঞ্জ, সাভারের হিন্দু শ্রেণী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ওই দাঙ্গায় ।

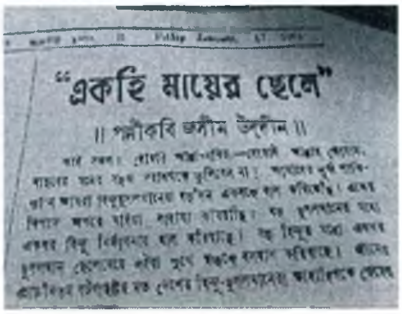
"একহি মায়ের ছেলে"
।। পল্লীকবি জসীম উদ্দীন ।।

একই দিনের পত্রিকায় পল্লী কবি জসীমউদ্দিন লিখেছিলেন "একহি মায়ের ছেলে "। "ভাই সকল! দোহাই আল্লা-নবীর,- দোহাই আল্লার কোরান, মানুষের মনের সহজ দয়াধর্ম্মকে ভুলিবেন না। আমাদের পূর্ব্ব পাকিস্তানে আমরা হিন্দু-মুসলমানেরা বহুদিন একসঙ্গে বাস করিতেছি। একের বিপদে আপদে যাইয়া সাহায্য করিয়াছি। বহু মোছলমানের মধ্যে একঘর হিন্দু নির্ভাবনায় বাস করিয়াছে। বহু হিন্দুর মধ্যে একঘর মোছলমান ছেলেমেয়ে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়াছে।"

সমাজে বিশৃংখলা বা সন্ত্রাস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি সংবাদপত্রের ভাষায় যদি সার্বজনীনতা না প্রকাশ পায় নিসন্দেহে তখন তা এক শ্রেণীর হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কতৃক মৌলিক অধিকার বিলে স্বাক্ষরদানের সংবাদও একই দিনে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সেদিন ছাপা হয়েছিল। যে বিলে স্বাক্ষরের ফলে কুরান ও সুন্নাহ অনুযায়ী দেশের আইন করার নিয়মটিকে বৈধতা প্রদান করা হয়। অর্থাত দ্বিজাতীতত্ত্বের সেই বীজ।

১৯৬৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র ইতিহাসে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার একটি মাইল ফলকের দিন। এর আগের দিনে দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য একটি শান্তি কমিটি গঠন করে এর কর্মীরা শপথ নিয়েছেন খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৭ জানুয়ারী ছিল তার উত্তরণ কাল। ১৬ জানুয়ারী দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে

Dhaka University Institutional Repository

বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সমস্ত দৈনিক পত্রিকার হেডিং এ এই অসাম্প্রদায়িক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে এক শ্লোগান ছাপা হবে।

১৭ জানুয়ারী ১৯৬৪

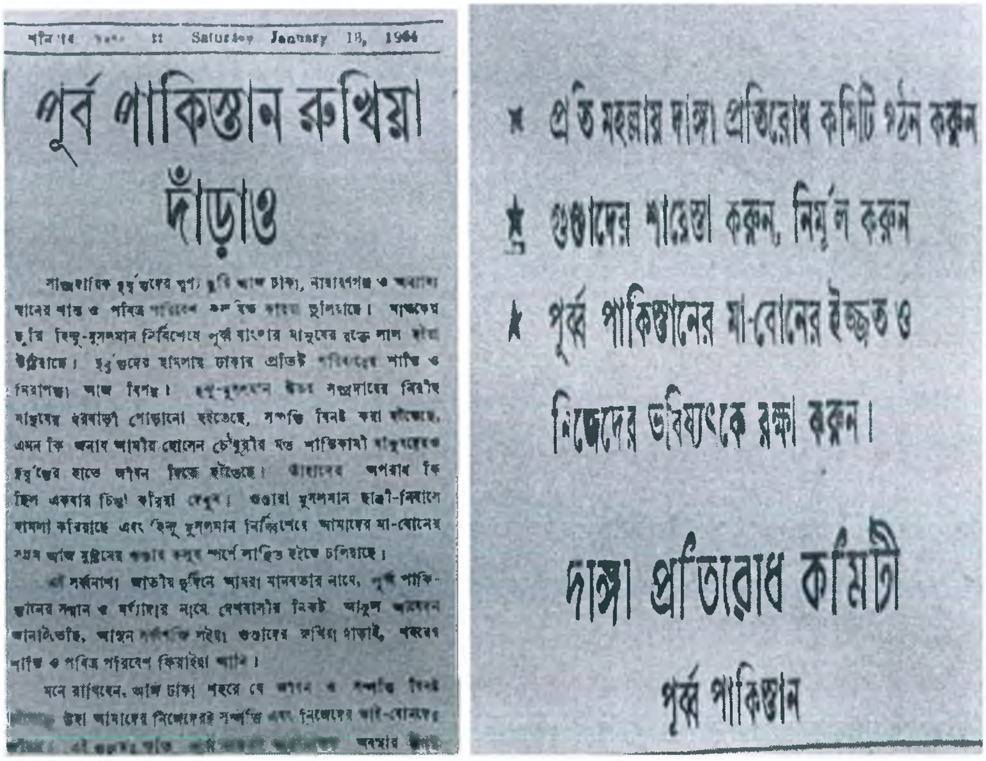

Saturday January 18, 1964

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ী পোড়ানো হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে, এমন কি জনাব আমীর হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষকেও দুর্বৃত্তের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাঁহাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুণ্ডারা মুসলমান ছাত্রী-নিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম আজ দুর্বৃত্তের কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি, আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

মনে রাখিবেন, আজ ঢাকা শহরে যে জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইতেছে উহা আমাদের নিজেদেরই সম্পত্তি এবং নিজেদের ভাই-বোনদের জীবন। ...

★ প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন

★ গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন

★ পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন।

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটী

পূর্ব পাকিস্তান

১৭/১/১৯৬৪ প্রথম পৃষ্ঠা।

এই 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও' সংবাদটি ছিল বাঙালী জাতির ইতিহাসে অসাম্প্রদায়িকতার মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধুকে আহ্বায়ক করে বৃহস্পতিবার এ কমিটি গঠন করা হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটিতে ছিলেন সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী. ওয়াহিদুল হক, আনোয়ার জাহিদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সহ অস্যংখ্য সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা।

এর পর থেকেই ধর্মীয় গোড়ামী মনোভাব পূর্ন সংবাদপত্রগুলোর সংবাদপ্রকাশের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন আসতে থাকে। যে সব পত্র-পত্রিকা প্রগতিশীল ছিল সে গুলোত ছিলই কিন্তু যারা সেই সময়ে সরকারের সমর্থনে পুরোপুরি কথা বলতো তারাও পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও শ্লোগানের

Dhaka University Institutional Repository

পর থেকে চেষ্টা করেছে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখার। তাই সেদিন দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির এই শ্লোগান দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজেও ছাপা হয়।

২১/১/১৯৬৪ প্রথম পৃষ্ঠা।

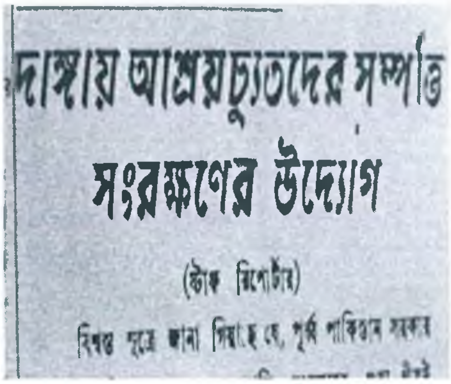

দাঙ্গায় আশ্রয়চ্যুতদের সম্পত্তি সংরক্ষণের উদ্যোগ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকার

২১ জানুয়ারী পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ ' দাঙ্গায় আশ্রয়চ্যুতদের সম্পত্তি সংরক্ষণের উদ্যোগ'।

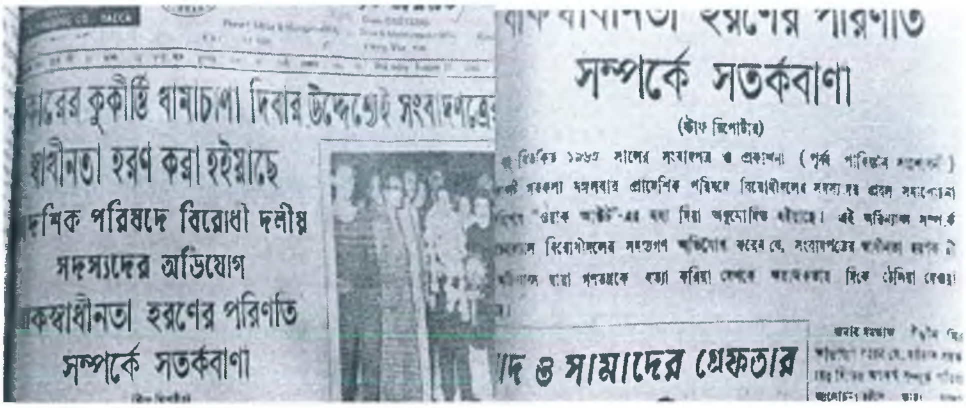

...রের কুকীর্ত্তি ধামাচাপা দিবার উদ্দেশ্যেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে

...দেশিক পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের অভিযোগ

...কস্বাধীনতা হরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী

সম্পর্কে সতর্কবাণী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

...দ ও সামাদের গ্রেফতার

২১/১/১৯৬৪

একই দিনে অর্থাত ২১ জানুয়ারী প্রকাশিত সংবাদের শিরোণাম " সরকারের কুকীর্তি ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে। " এর সংবাদটি ছিল বহু বিতর্কিত ১৯৬৩ সালের সংবাদপত্র ও প্রকাশনা (পূর্ব্ব পাকিস্তান সংশোধনি) অর্ডিন্যান্সটি গতকল্য মঙ্গলবার প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রবল সমালোচনা পরিশেষে "ওয়াক-আউট " এর মধ্য দিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে আলোচনাকালে বিরোধীদলের সদস্যগন অভিযোগ করেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকরা অর্ডিন্যান্স দ্বারা গণতন্ত্রকে হত্যা করিয়া দেশকে এক অরাজকতার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "

Dhaka University Institutional Repository

১/২/১৯৬৪ প্রথম পৃষ্ঠা

খ্যালঘুদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাষ্ট্রের সকল শক্তি নিয়োজিত করা হবে

পয়লা বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ঘোষণা

গ্রাসের ভারতীয় কারসাজির ক্ষে কঠোর হুশিয়ারী জ্ঞাপন

ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিনের সংবাদ ক্যাপশন- সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রের সকল শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। পাশের ছবিটি যশোরে কলকাতা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মোহাজিরদের ছবি।

১৭ জানুয়ারী দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির এক ইস্তেহারের সুফল সংবাদমাধ্যমগুলোর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মোহাজিরদের প্রতি দৃষ্টিদান।

তথ্য সূত্র

১. প্রবাসী, আশ্বিন,১৩৫৩

২. প্রবাসী, আশ্বিন,১৩৫৩

৩. গ্লানি,আশ্বিন,পৃ.৩১

৪. হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, ১৬ আগষ্ট

৫. হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, ১৬ ই আগষ্ট

৬. দাঙ্গার ইতিহাস / শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, পৃ ১৬৪ থেকে ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ গণমাধ্যম ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ৯.৩৪%, বৌদ্ধ ০.৭% যা প্রায় ১০ লাখের বেশি। খ্রিষ্টান ০.৩১% যা সংখ্যায় ৫৮০,০০০ জনের বেশি এবং ১ লাখের বেশি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। আদিবাসী সংখ্যা ২ মিলিয়নের বেশি যার অধিকাংশ বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

সংখ্যালঘুদের সার্বিক পরিস্থিতি কি তা বোঝানোর জন্য আদমশুমারীতে তাদের সংখ্যা হ্রাসের ধারাবাহিকতা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতির একটি ধারনা থেকে স্পষ্ট হয়। আমি সরকারের দেখানো জরিপের ভিত্তিতে দুটো বিষয়ের টেবিল উপস্থাপন করছি। একই সাথে যেসব বিষয় নিয়ে সংখ্যালঘুরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় সে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যেমন, অর্পিত সম্পত্তি আইন, গণমাধ্যমে তাদের অবস্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় নির্যাতন, সংবিধানের ত্রুটি।

HUMAN RIGHTS CONGRESS FOR BANGLADESH MINORITIES2010 এর রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যালঘু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছি।

Humanity Assassinated: Ethnic Cleansing of Minorities in Islamic Bangladesh শিরোণামে একটি রিপোর্টে উঠে এসেছে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কিছু তথ্য এবং table summarizes the atrocities of various types and their consequences এ নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন এবং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে এর বিরুপ প্রভাবের নমুনা তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

আদমশুমারীতে সংখ্যালঘুর মুল সম্প্রদায় হিন্দুদের ক্রমহ্রাসের হার

Declining Hindu population in Bangladesh region

Year	Percentage (%)
1941	28.0
1951	22.0
1961	18.5
1974	13.5
1981	12.13
1991	11.62
2001	9.2 [3]

অর্থাত ৬০ বছরে ২৮ থেকে ৯ শতাংশে নেমে এসেছে এই সম্প্রদায়ের হার। ৬ দশকে কমেছে ১৯ শতাংশ। এর অর্থ প্রতিবছরে কমেছে দশমিক ৩১ শতাংশ হারে। আমার এ গবেষণাপত্র লেখার সময়ে বাংলাদেশে ৫ম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হলেও তার তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি ফলে সর্বশেষ ২০১১ সালের হিন্দু হ্রাসের সংখ্যা উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। তবে এটুকু নিশ্চিত বলা যায় ২০০১ পরবর্তী নির্বাচনী সহিংসতার ফলে এই সংখ্যা ৯.২ থেকে আরো কমে এসেছে। তবে আদমশুমারীতে জরিপের পদ্ধতি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আমাদের দেশে যে আদমশুমারী সঠিকভাবে হয়না সে বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। “২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের ৫ম

Dhaka University Institutional Repository

আদমশুমারী। বিশাল হতাশা ও অস্তিত্বহীনতার সংশয় রয়েই যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় ৪০টির মতো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য। এই জরিপে সরকারের 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল ২০১০ এ স্থান পাওয়া মোট ২৭ জাতির মানুষই শুধু স্থান পাচ্ছে, যদিও তা সাংবিধানিক স্বীকৃতির বাইরে। কিন্তু সংসদীয় ককাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এ দেশে মোট ৭৫টি জাতির মানুষ রয়েছে। কিন্তু ২০১১ সালের এ জরিপে এদের স্থান না হওয়ার মাধ্যমে সরকারিভাবে খারিজ করে দেয়া হচ্ছে প্রায় ১০ লাখ আদিবাসী মানুষকে। (নিউ এজ, ১৩.২. ২০১১)। ২০১১ সালের জরিপ থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছে খন্দ, খাড়িয়া, সোরা, পাত্রসহ আরও কয়েকটি জাতি।"(১)

এবার দেখা যাক পাবলিক প্রশাসন ও সরকারী চাকরিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি হার।

পাবলিক প্রশাসন ও সরকারী চাকরিতে অংশগ্রহন

Hindu population by administrative divisions

Hindu Population across Bangladesh

District	Percentage (%)
Barisal	11.70
Chittagong	12.65
Dhaka	10.5
Khulna	16.45
Rajshahi	12.09
Sylhet	17.80

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ প্রশাসনে রাজধানীতে সবচেয়ে কম ১০ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সিলেটে সবচেয়ে বেশি ১৭ দশমিক ৮০ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি রয়েছে।

এবার সবচেয়ে বড় যে কারনটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা হ্রাসের জন্য কাজ করছে সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। সেটি অর্পিত সম্পত্তি আইন।

অর্পিত সম্পত্তি আইন

অর্পিত সম্পত্তি আইন - বিতর্কিত একটি আইন। ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত একে বলা হতো শত্রু সম্পত্তি। ১৯৬৫ সালের দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পাকিস্তান এর সামরিক সরকার 'শত্রু সম্পত্তি আইন' নামে একটি আইন পাস করে। রাজনীতি বা আইনগত কথা যতই থাকুক একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সে সময়ের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে হিন্দুদের সম্পত্তি গ্রাস করাই ছিল এ আইনের মূল উদ্দেশ্য।

বিতর্কিত এই আইনটির প্রয়োগের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল করা হয়েছে বলেই এটি বিতর্কিত। আইনের আওতায় এখন পর্যন্ত শুধু সরকারী হিসেবে ৭৫ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি গ্রহন করেছে বাংলাদেশ সরকার। আর এই আইনটি হলো এদেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের জন্য যতগুলো আইন করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর আইন। সংখ্যালঘুদের আর্থিক সম্পত্তি দখলের মধ্যে অন্যান্য যেসব আইন রয়েছে।

- The East Bengal (Emergency) Requisition of Property Act (XIII of 1948)
- The East Bengal Evacuees (Administration of Property) Act (VIII of 1949)
- The East Bengal Evacuees (Restoration of Possession) Act (XXII of 1951)
- The East Bengal Evacuees (Administration of Immovable Property) Act (XXIV of 1951)
- The East Bengal Prevention of Transfer of Property and Removal of Documents and Records Act of 1952
- The Pakistan (Administration of Evacuees Property) Act (XII of 1957)
- The East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance (No 1 of 1964)

Dhaka University Institutional Repository

- The Defence of Pakistan Ordinance (No. XXIII of 6 September, 1965)
- The Defence of Pakistan Rules of 1965
- The Enemy Property (Custody and Registration) Order of 1965
- The East Pakistan Enemy Property (Lands and Buildings Administration and Disposal Order of 1966.
- The Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) Ordinance No. 1 of 1969
- Bangladesh (Vesting of Property and Assets) President's (Order No. 29 of 1972).
- The Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act (XLV of 1974)
- The Vested and Non-Resident Property (Administration) Act (XLVI of 1974)
- The vested and Non-Resident (Administration) (Repeal) Ordinance 1976 The Ordinance, (No. XCII of 1976).
- The Ordinance No. XCIII of 1976.

১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ি সরকারি হিসেবে ৭০২.৩৩৫ একর (২,৮৪২ কি.মি) হলো চাষাবাদের জমি এবং ২২,৮৩৫ টি ঘর-বাড়ি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল। নোবেল প্রাইজ বিজয়ী অমর্ত্য সেনের পরিবারের সম্পত্তিও এ আইনের আওতায় পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সরকার পুনরায় তদন্ত সাপেক্ষে অমর্ত্য সেনের পরিবারের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়। তবে অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাতের An inquiry into causes and consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act' নামে করা গবেষণার তথ্য অনুযায়ী ৯২৫,০৫০ হিন্দু বসতি (বাংলাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ হিন্দু পরিবার) এই আইনের কারনে অর্পিত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে যা ১.৬৪ মিলিয়ন একর জমি। হিন্দুদের মোট প্রায় ৫৩ শতাংশের জমির সমান। দেশের মোট জমির ৫.৩ শতাংশই এর আওতাভুক্ত। আর এর সবচেয়ে বড় অধিগ্রহনকাল বাংলাদেশের প্রথম সরকার আওয়ামীলীগের ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে। শত্রু সম্পত্তির আইনের আওতায় ১৯৬৫ সাল থেকে ৭১ সালের মধ্যে ৭৫.৪ শতাংশ হিন্দু সম্পত্তি বেদখল হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ আমলে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন'এর আওতায় ১৯৭২ থেকে ৭৫ সালের মধ্যে ৭.৩ শতাংশ, ১৯৭৬ থেকে ৮১ সালের মধ্যে ৮.৯ শতাংশ, ১৯৮২ থেকে ৯০ সালের মধ্যে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ জমি বেদখল হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জরীপ অনুযায়ী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪৪.২ শতাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিএনপি) ৩১.৭, জাতীয় পার্টি ৫.৮, জামায়াত ইসলামী ৪.৮ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালীরা মোট ১৩.৫ শতাংশ এ জমির ভোগ দখল করছে।

তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৬৫ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল এ দখল। 'শত্রু সম্পত্তি আইন'-এর মাধ্যমে তথাকথিত শত্রুদের সম্পত্তি সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা থাকলেও এ আইন হিন্দু সম্পত্তির ওপর হামলার জন্যে ছিল এমন এক উপায় যাতে করে সরকারের সেগুলো দখল করার কাজ তখন থেকেই শুরু। তাদের এই দখল আইন অনুযায়ীও বেআইনী ছিল। তারপরও সরকারের সমর্থনে এবং প্রশাসনের উচ্চতম পর্যায় থেকে তশিলদার পর্যন্ত সর্বস্তরের সরকারি লোকদের সহায়তায় চলতে থাকে এ প্রক্রিয়া।

এই যে জবর দখলের প্রক্রিয়া এতে যে শুধুই হিন্দুদের জমি নেয়া হয়েছে তা নয় একের পর এক সরকারের শ্রেণী চরিত্রেরও প্রকৃত পরিচয় বেরিয়ে এসেছে এ জরিপ থেকে। যে পার্টি যখন ক্ষমতায় এসেছে তারাই তখন হামলা-লুটপাট চালিয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর সবাই তবে সংখ্যালঘু হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণটা হিন্দুদের ক্ষেত্রেই অধিক। এভাবে দখলকৃত ৯০ শতাংশ হিন্দু সম্পত্তির মালিকানার কোন আইনগত দলিল নেই, সরকারের সাথে লিজ বন্দোবস্তোর কাগজ নেই। শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় ২১ লাখ একর জমি তিন দশক ধরে প্রকৃত মালিকদের দখলের বাইরে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দুরা ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ১০ শতাংশ দেশ ত্যাগ করলেও এদের মধ্যে ৯০ শতাংশ এখনও দেশেই বাস করছে।

অর্পিত সম্পত্তির আইনের আওতায় অধিকৃত সম্পত্তি আওয়ামী লীগ সরকার ফিরিয়ে দেয়ার ঘোষণার পর হিসাবে দেখানো হয়েছে ৬,৫২,০০০ একর জমি সরকারের বেহাত হয়েছে। অর্থাৎ বেসরকারী ভাবে দখলকৃত জমি বাদ দিয়ে সরকারের দখলে নিয়ে আসা জমির মধ্যেও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি সরকারের বেদখল হয়েছে। অবশ্য হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান পরিষদ এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে বেদখল জমির পরিমাণ ১০ লাখ একরের বেশি।

সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধান প্রথম গঠনের সময় ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে কোন ধর্মের কথা উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তীতে এতবার এ বিষয়টি নিয়ে পরিবর্তন ও সংযোজন হয়েছে যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অধিক হুমকি স্বরুপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশিষ্ট জনেরা সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও সরকার তার ভোট রক্ষার উদ্দেশ্যে এ স্থান থেকে নড়ছেননা। বলছেন ৭২ এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু এই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এর কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম নামটি সংযোজিত হয় স্বৈরশাষক এরশাদের সময়ে। "অনেকে ভেবেছিলেন, অন্যদিকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বলে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেছে বাংলাদেশ। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরে পাকিস্তানের পথই গ্রহন করে দেশটি।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের মত সেখানেও ক্ষমতায় আসীন হয় জেনারেলরা। শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭২ সালের সংবিধান সংশোধন করেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। সেখান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দেন। পঞ্চম সংশোধনীতে সংবিধানের 'নির্দেশক আদর্শ' হিসেবে উল্লেখ করা হয় ইসলামকে। ৮ম সংশোধনীতে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন।"(২)

আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দল হয়ে থাকার সময় এ বিষয়ের বিরোধীতা করলেও নিজ সরকারের সময় ঠিকই বহাল রাখছেন। এর কারণ কট্টরপন্থী মুসলমানদের ভোট হাত ছাড়া না করা। "সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মবাণীর সঙ্গে এ দুটি বিষয় সাংঘর্ষিক বলে মত দেন তারা। গতকাল সংসদ সচিবালয়ে সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটির সঙ্গে বৈঠকে তারা এ অবস্থানের কথা জানান। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং বিসমিল্লাহ রাখার বিরোধিতা করে বলেন, সংবিধানের চার মূলনীতির সঙ্গে এটা সাংঘর্ষিক।"(৩)

<u>ধর্মীয় বিষয়ে</u>

সংখ্যালঘু বিষয়টি সংখ্যার নিরিখে নির্ধারিত তবে এর ভিত্তি ধর্মের ব্যবধানে। তাই ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের উপর আঘাতটা বেশি করা হয়। এই অনুশীলন দেশভাগ অর্থাত ১৯৪৭ সালের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। কখনো কম কখনো বেশি। কিন্তু থেমে যায়নি একেবারে। রমনা কালী মন্দির ধ্বংস থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুঁজার সময়ে মন্ডপে আক্রমন, হামলা এমনকি সার্বজনিন পুঁজা বন্ধ করে দেয়ার ঘটনাও যথেষ্ট। দেশে একযোগে ৩০০ মন্দিরে হামলা করে ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এখনও এ ধরণের নির্যাতন চলছে। সরকার মসজিদে আযানের ধ্বনির বদলে উলু ধ্বনি শোনা যাবে আতংক প্রকাশ করে মন্দিরে ভাংচুর করেছে। ৯২ এ বাবরী মসজিদ দাঙ্গার ঘটনার পর বিভিন্নস্থানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়েছে। " মানিকগঞ্জের সদর উপজেলার উকিয়ারা গ্রামে গত মঙ্গলবার সংখ্যালঘু দুটি পরিবারকে উচ্ছেদ করে তাদের ঘরবাড়ি ও একটি মন্দির পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ওই দুই পরিবারের সদস্যরা ভয়ে এলাকা ছেড়েছে। এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বেদম মারধরের শিকার হয়েছেন এক সাংবাদিক। কিন্তু সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। গতকালও সন্ত্রাসীরা মোটরসাইকেল নিয়ে ওই এলাকায় মহড়া দিয়েছে।"(৪)

জানা গেছে সদর উপজেলার উকিয়ারা মৌজায় ২৩ শতাংশ অর্পিত সম্পত্তি রয়েছে। বহু বছর ধরে ওই জমিতে বসবাস করেন নারায়ন মন্ডল। তাঁর মৃত্যুর পর দুই ছেলে শরৎ ও গোঁসাই মন্ডল ওই জমিতে একটি দুর্গা মন্দির ও দুটি আধা পাকা ঘর নির্মান করেন। মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে শতাধিক সন্ত্রাসী ওই বাড়িতে হামলা চালিয়ে মন্দিরসহ আধা পাকা ঘর দুটি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা মন্দির ও ঘরের কিছু অংশে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কিছু অবকাঠামো নদীতে ফেলে দেয়।

সাংবাদিক নির্যাতন ও মন্দির ভাংচুরের প্রতিবাদে স্থানীয় সাংবাদিক, বিএনপি ও জাতীয় হিন্দু মহাজোটসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন মঙ্গলবার শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে।

এর পরের দিনই পত্রিকায় শেষ পৃষ্ঠায় একই স্থানে সংবাদ প্রকাশ হয় 'ঘর ও মন্দির ভাংচুরের ঘটনায় সাজানো মামলা' শিরোণামে "মানিকগঞ্জের সদর উপজেলার উকিয়ারা গ্রামে ঘর ও মন্দির ভাংচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা থানায় মামলা করতে পারেননি। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের এক আত্মীয়কে চাপ প্রয়োগ করে মামলা করানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বুধবার রাতে করা ওই মামলায় মন্দির ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।"(৫)

মামলা প্রসঙ্গে শরৎ মন্ডল বলেন, ' আমাদের মাসতুতো ভাই আমাদের ইচ্ছেয় নয় পুলিশ অথবা প্রভাবশালীদের ভয়ে সাজানো মামলায় স্বাক্ষর করেছেন'।

সামাজিক অবস্থানে

সামাজিক ভাবেও যে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়ে আসছে এ পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে গেলেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা বছর বছর বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট ডিগ্রী অর্জন করলেও দেশের মধ্যে শ্রেণী বিভেদ, অচ্ছুত, উচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণার কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি। সম্প্রতি একটি সংবাদ পত্রিকায় অনেকের দৃষ্টি কেড়েছে। "সাতক্ষীরার কলারোয়ায় এক পুলিশ সদস্য তুচ্ছ কারণে গতকাল শনিবার কয়েকজন সংখ্যালঘু শিশুর ওপর মোটরসাইকেল তুলে দিয়ে পিষ্ট করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনায় ক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী গতকাল থানা ঘেরাও করে।"(৬)

জানা গেছে, মনিরুল ইসলাম নামে কলারোয়া থানার ঐ কনস্টেবল এর আগেও তুচ্ছ কারণে **এলাকাবাসী**কে নিচুজাত (মুচি) বলে গালিগালাজ করতো। শিশুদের দেহের ওপর তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল তুলে দিয়ে পিষ্ট করার চেষ্টা করে এবং পুরুষ সদস্যদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে এলাকা ছাড়ার হুমকি দেন।

Dhaka University Institutional Repository

দলিত জনগোষ্ঠির উপর সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্যাতনে কি পরিমান মানুষ নিগৃহিত হয় একটি সংবাদের ভিত্তিতে দেখা যাক।

"বাংলাদেশে ধর্ম, বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতা, আঞ্চলিকতা, জাতিগত ও লিঙ্গগত বৈষম্য প্রকটভাবেই রয়েছে। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে ২৭ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান । এ ছাড়া ২৮ (১) ধারায় বলা আছে,' কেবল ধর্ম, গোষ্ঠি,বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"(৭)

তবু এই ধারাকে লংঘন করে শুধু জন্ম ও পেশাগত অস্পৃশ্যতার কারণে বৈষম্য, নির্যাতন ও নিগ্রহের স্বীকার হতে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় ৫৫ লাখ দলিত জনগোষ্ঠিকে। এই দলিত জনগোষ্ঠির শিক্ষার হার ৫ শতাংশেরও নিচে। শিক্ষার হার এত কমের কারণ, তাদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়। পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের সুইপার কলোনীর শিশু হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ওই শিশুদের অনুমতি দেয়া হয়নি। সিলেটের শশধর, যশোর, কুষ্টিয়া, নীলফামারীর কাওড়া, হরিজনসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ও একই অবস্থা। পুরুষ ও নারীর বাইরে আর কোনো লিঙ্গের অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র কিংবা সমাজ গ্রহন করতে রাজি হয়নি। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তাদের প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের শ্রম শোষণের একটি গুরুত্বপূর্ন জায়গা হলো চা-বাগান। যে শ্রমিকের শ্রমের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশরা তাদের শোষন শুরু করেছিল, আজও তারা সেই শ্রম ভিত্তিক বৈষম্যের শিকার, যা তাদের সাম্প্রতিক সময়ের মজুরীর দিকে তাকালেই দেখা যায়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে চা-শ্রমিকদের মজুরী ছিল ৩২ দশমিক ৫০ টাকা। একই সময় পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের মজুরী ছিল ৫৩ দশমিক ৫০ রুপী।

ধর্মীয়ভাবে, সামাজিক অবস্থানে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও রয়েছে সরাসরি আক্রমনের চর্চা। Human rights Congress For Bangladesh Minorities এর পোষ্ট করা তথ্য অনুযায়ী ২৩ নভেম্বর ২০১০ থেকে ৮ এপ্রিল ২০১১ অর্থাৎ সাড়ে চার মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর প্রত্যক্ষ নির্যাতনের ঘটনা ২৫ টি। রয়েছে প্রশাসনের নির্বিকার থাকার অসংখ্য নজির।

সাত বছরেও বাঁশখালী উপজেলার ১১ হত্যাকান্ডের বিচার হয়নি শিরোণামে প্রকাশিত সংবাদ। "২০০৩ সালের ১৮ নভেম্বর রাতে উপজেলার দক্ষিণ সাধনপুরে শীলপাড়ায় তেজেন্দ্র শীলের বাড়িতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে তেজেন্দ্র শীলসহ ওই পরিবারের ১১ বাসিন্দা জীবন্ত দগ্ধ হয়। এ ঘটনার বিচার দাবিতে শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম নগরীতে সমাবেশে ও মৌন মিছিল করেছে ' বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ"(৮)

Dhaka University Institutional Repository

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাত বছরেও ওই হত্যাকান্ডের বিচার হলোনা। অথচ গ্রেপ্তার হওয়া আসামিরা একে একে জামিনে বেরিয়ে আসছে। এবছর থেকে ঐক্য পরিষদ ১৮ নভেম্বর সারা দেশে ' সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করছে। ওই ঘটনার পর বিমল শীল বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন।

এবার কয়েকটি রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের তথ্য থেকে ধারণা দেয়া যাক।

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগনের উপর নির্যাতন সম্পর্কে ইন্টারনেট থেকে পাওয়া একটি রিপোর্ট

Current state of minorities and indigenous peoples

স্বাধীনতার পরে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সবচেয়ে প্রথম বড় আক্রমনটি হয় ১৯৯২ সালে। ২০০ রও বেশি মন্দির তখন ধ্বংস করা হয়েছিল বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার জের ধরে।

"The persecution of religious minorities featured prominently within the political development of Bangladesh. In January 2004, the Bangladesh government imposed a ban on Ahmaddiya publications as a response to growing demands from mainstream Sunni Imams for Ahmaddiyas to be declared non-Muslims. On an application by the Ahmaddiya community, the High Court intervened to grant a stay of the governmental executive order in December 2004. Police and governmental authorities nevertheless continued to seize books and documents relating to Ahmaddiya faith, and colluded with Muslim extremists to remove signs referring to Ahmaddiya places of worship as 'mosques'. There was also a sustained campaign of harassment, violence and physical abuse against the Ahmaddiya minority. On 29 October 2004, a mob of around 300 men belonging to Khateme-Nabuwat party attacked a mosque in Brahmanbaria, seriously injuring 11 Ahmaddiyas. On 17 April, a crowd of religious extremists attacked another Ahmaddiya mosque in Jotidriangar injuring 25 people.
There was also harassment, abuse and physical destruction of properties belonging to religious minorities during the period 2004-2005. On 1 January 2004, local Bangladesh National Party officials set 20 houses belonging to the Hindu community on fire. This action was repeated in Sarkerpur village in Rangpur district in September 2004. During April 2004, 12 Ahmaddiya houses were destroyed and, on 18 September 2004, Christian convert Dr Joseph Gomes was killed by unidentified assailants. On 22 June 2006, leaders of the Khatme-Nabwat party published an open letter to Prime Minister Khaleda Zia, reiterated demands that Ahmaddiayyas be declared non-Muslims and threatening to resort to violent actions.

Religious minorities and other groups such as the Ahmaddiyas and the Biharis continue to suffer from discrimination in key areas of public life: employment, higher education and access to justice. Violence and

Dhaka University Institutional Repository

discrimination against religious and ethnic minorities continued through 2007, according to a US Government Report on Religious Freedom. The report released in September said Hindu, Christian and Buddhist minorities experienced discrimination and on occasion violence. It also said that Ahmaddiyas, an Islamic sect, faced harassment and protesters demanded that they be declared non-Muslims. The report restated that attacks on religious and ethnic minorities continued to be a problem in the 2009 reporting period too. According to the 2009 US State Report on Religious Freedom, there were no reported demonstrators or attacks against the Ahmadiyya Muslim Community, although isolated instances of harassment continued. The state is said to have 'acted in an effective manner to protect Anmadis and their property' against sporadic demands that Ahmadis to be declared as non-Muslims.

The Hindu and Christian minorities and the indigenous peoples (particularly those from the Chittagong Hill Tracts) have blamed the government for being complicit in continued seizure of their lands by the so-called Muslim vigilantes and those belonging to extremist religious parties. Amnesty International reported on the government's efforts to implement accords of the Chittagong Hill Tracts, which was signed in 1997 and recognised the rights of indigenous peoples living in the area. In August 2009, major army bases were dismantled but no further action was taken to settle a dispute over land ownership which indigenous peoples claim was given to non-indigenous Bangladeshi settlers.

Furthermore the current government has introduced several substantial restrictions on Christian communities. The most significant restriction is that all Christian organisation (including churches and Bangladesh Bible Society) have to be registered as an NGO whose charter and board remains open to governmental scrutiny and approval. The board can be dismissed at any given time and be replaced by a new board appointed by the government. This regulation is in breach of the Constitution, Article 41 (b) of which provides that 'Every religious community or denomination has the right to establish, maintain or manage its own religious institutions'.

Dhaka University Institutional Repository

There have also been recent reports of human rights violations against indigenous tribal leaders. Amnesty International expressed grave concern over reports of alleged torture and death in custody following the imposition of emergency rule in early 2007. In March 2007, a leader of the Garo indigenous community, Cholesh Richil, reportedly died in custody following torture carried out by military personnel, Amnesty said. The Garo community live in Modhupur, and since 2003 have been opposing the construction of a national park in their traditional homeland. The Garo community is also predominantly Christian."(৯)

মুসলমান থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘুদের উপর কিকি উপায়ে নির্যাতন হয় এবং এর দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী ফলাফল প্রকাশিত একটি রিপোর্টে অংশ বিশেষ উপস্থাপন করছি।

HUMAN RIGHTS CONGRESS FOR BANGLADESH MINORITIES 2010

Muslims in Bangladesh beat, deprive Christians of work

Source: Christian Today "Muslim villagers last month beat a 63-year-old Christian convert and his youngest son because they refused to return to Islam, the father told Compass. The next day, another Christian in a nearby village was beaten and robbed in related violence in southwestern Bangladesh. Aynal Haque, 63, a volunteer for Christian organization Way of Life Trust, told Compass that his brothers and relatives along with Muslim villagers beat him and his son, 22-year-old Lal Miah, on Oct. 9 when they refused to recant Christianity. The family lives at Sadhu Hati Panta Para village in Jhenaidah district, some 250 kilometers (155 miles) southwest of the capital city, Dhaka. It is in the jurisdiction of Sadar police station. Haque's relatives and villagers said that he had become Christian

Dhaka University Institutional Repository

by eating pork and by disrespecting the Quran, he said. "I embraced Christianity by my own will and understanding, but I have due respect for other religions," Haque said. "How can I be a righteous man by disrespecting other religions? Whatever rumors the villagers are spreading are false." At a meeting to which Haque was summoned on Oct. 9, about 500 men and women from several villages gathered, including local and Maoist party leaders.

"They tried to force me and my son to admit that we had eaten pork and trampled on the Quran to become Christian," Haque said. "They tried to force us to be apologetic for our blunder of accepting Christianity and also tried to compel us to go back to Islam. I told them, 'While there is breath left in our bodies, we will not reject Christianity.' "When we denied their allegation and demand, they beat us severely. They ordered us not to mix with other Muslim villagers. They confined us in our house for five days."

Haque has worked on his neighbors' land for survival to supplement the meager income he earns selling seeds in local markets, but the villagers have now refused to give him work, he said. "Every day I earn around 50 taka to 100 taka [70 cents to US$1.40] from the seed business," he said. "Some days I cannot earn any money. So, I need to work villagers' land for extra money to maintain my family."
His youngest son also worked in neighbors' fields as a day-laborer, besides attending school."We cannot live if we do not get farming work on other people's land," Haque said. Haque, his wife and youngest son received Christ three years ago, and since then they have faced harassment and threats from Muslim neighbors. His other grown son and two daughters, as well as a son-in-law, also follow Christ but have yet to be baptized. There are around 25 people in his village who came to Christ under Haque's influence; most of them remain low-profile to

Dhaka University Institutional Repository

avoid harassment from the villagers, he said. "After that incident, my neighbor warned me not to go through his land," he said. "Now I take a bath in my home from an old and dysfunctional tube-well. My neighbors say, 'Christians are the enemy of Muslims, so don't go through my land.' It seems that I am nobody in this village."

"Where is religious liberty for Haque and Ali?" Biswas said. "Like them, many Christians in remote villages are in the throes of persecution, though our constitution enshrined full liberty for religious minorities."

Way of Life Trust has aided in the establishment of some 500 house churches in Bangladesh, which is nearly 90 percent Muslim. Hinduism is the second largest religion at 9.2 percent of the 153.5 million people, and Buddhists and Christians make up less than 1 percent of the population. " (১০)

Humanity Assassinated: Ethnic Cleansing of Minorities in Islamic Bangladesh

" ১. Hindu women (from age 8 to 70) are often subjected to gang rape. About 200 Hindu women were gang raped by Muslims in Char Fashion, Bhola, in one night at a single spot (The Daily Star, Nov. 16, 2001)

1. The Islamic terrorists have levied Jizya taxes on the minority Christians and have told the Christians to give them their wives, sisters and daughters for sex if they failed to pay the tax. (Source: Christian Solidarity Worldwide, Dec. 13, 2001).
2. The Muslim thugs gang-raped mother and daughter together on the same bed with the parents and children forced to watch; and they have raped mothers in front of their children (The Daily Janakantha, Feb. 5, 2002; April 22, 2002).
3. On February 8, 1989, about 400 Muslims from the neighboring villages attacked the Hindu community of the village of Sobahan, in Daudkandi, Comilla. The Muslims

Dhaka University Institutional Repository

reminded them that, “the government has declared Islam to be the state religion, and therefore you have to either convert to Islam or leave the country.” They set ablaze every Hindu household after looting, razed the temples, and then gang-raped women. (Source: ‘Baishammer Shikar Bangladesher Hindu Sampradaya (The Hindus of Bangladesh: Victim of Discrimination), Matiur Rahman & Azizul Huq eds., 1990, cited Dutta, 2005).

4. Often the commanding officer of police stations personally conducts violence against minorities. As example, Tofazzal Hossain, Officer-in-Charge, "led a procession at the dead of night that ransacked two Ashrams (place of religious retreat for Hindus), a temple of Goddess Kali, and three houses at Gopalpur when seven to eight people were injured in mass beating." (The Daily Star, June 3, 2003).
5. On August 28, 2004, the Paramilitary forces, together with local extremists, burned down 400 dwelling houses in Mahalchari, Chittagong Hill Tracts, after looting the villages, gang raping their women and destroying Buddhist temples. These indigenous Buddhist people represented 97% of the population in 1947, by 2001 they accounted for less than 50% (US Department of State’s Country Report on Human Rights Practices, 2004).
6. The police rarely allow rape victims of minority groups to press charges against their rapists. Typically, if a rape victim goes to the police and insist on action, they are given the “run around” for a few days so the rape evidence disappears. The police officers themselves will then persecute the victims. The victims frequently face death-threats or kidnapping if they try to file charges (The Daily Janakantha, Feb. 16, 2002).
7. Eleven members of same family roasted alive (which includes a child of four day) in village Southern Shadhanpur on 19 November 2003 (Bando, 2004, p. 13)

Dhaka University Institutional Repository

Several thousand Hindu temples have already been systematically destroyed (352 in 1992 alone). Delwar Hossain Sayedee, the Jamaat-e-Islami leader decreed that all statues except those of Muslim worshipers should be destroyed (Baldwin, 2002). The Sanskrit and Hindu religious University (Saraswata Samaj) in Dhaka, in operation before independence of Bangladesh in 1971, was closed after the independence. It's land and assets was confiscated by the government of Bangladesh in a bid to wipe out Hindu educational system, whereas millions of dollars are spent for the development of Madrassas (Roy, 2008).

Following table summarizes the atrocities of various types and their consequences:

Sr. No	Category of Violence	Types of Violence	Immediate affects	Long term affects
1	Political and social discrimination	Denial to Job, Prosperity and discouragement in political involvement	Loss of social status, Unemployment, No scope for prosperity.	Social backwardness, Poverty, disenfranchised from holding political power, Political and social insignificance.
2	Legal oppression	Vested Property Act of 1972, Justice and police protection often denied.	Loss of property, forceful capture of agricultural lands.	Poverty, Mass emigration, Forced exodus, refugee displacement

Dhaka University Institutional Repository

3	Physical repression	Physical Assault, Kidnapping of women and rape.	Fear, Loss of self-respect.	Mass emigration, Forced exodus, refugee displacement.
4	Mental Torture	Islamic Death threat, Rape threat, Arson threat.	Fear, Loss of security, Physiological trauma.	Mass emigration, Forced exodus.
5	Cultural and Religious suppression	Destruction of temples, Forced conversions, Forced marriage	Social and religious genocide	Loss of inherited identity, Loss of Religious Freedom, Frustration
6	Financial oppression	Money extortion as Jizya Tax, Kidnapping children for ransom, Arson.	Fear, Loss of security, Loss of property.	Poverty, Mass emigration, Forced exodus, refugee displacement.
7	Organized Mass Torture	Sadism, Islam approved torture. Rape	Religious slaughter, Brutal suffering,	Loss of population,Mass emigration, Forced exodus. refugee displacement
8	Predetermined	Infamous genocide of	Mass death, Number of	Community cannot

Dhaka University Institutional Repository

	Mass Killing	1971, Noakhali massacre in 1946; Islam approved Mass Murders,	orphans increases.	reconstitute itself as a viable community and get destabilized, Poverty, Mass emigration of the living, refugee displacement
9	Suppression of facts	Honest journalists, educationalists and prominent people are killed, Human rights investigators are detained.	Brutalization unreported. Media silenced, censored and / or purchased by ruling party.	World blissfully ignorant and Ethnic cleansing continues unabated.

Sunday, 12 July 2009 07:20

(১১)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্রঃ

(১) দৈনিক প্রথম আলো ৫.৩.২০১১

(২) দৈনিক মানবজমিন ৪.৫.২০১১

(৩) দৈনিক মানবজমিন ৪.৫.২০১১

(৪) দৈনিক প্রথম আলো ৭.৪.২০১১

(৫) দৈনিক প্রথম আলো ৮.৪.২০১১

(৬) দৈনিক ইত্তেফাক ১৬.৫.২০১১

(৭) দৈনিক প্রথম আলো ২১.৩.২০১১।

(৮) চট্টগ্রাম, নভেম্বর ১৯ ২০১০/ বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর ডটকম।

(৯) http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127363.htm

(১০) POSTED BY HUMAN RIGHTS CONGRESS FOR BANGLADESH MINORITIES (HRCBM) AT 10:41 AM

WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010

http://quandaryreflection.blogspot.com/2010/11/muslims-in-bangladesh-beat-deprive.html

(১১) http://www.islam-watch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায় : বিশিষ্ট জনের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণমাধ্যম।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এ নিয়ে আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে কথা বলেছি। এই বিশিষ্টজনেরা প্রত্যেকে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরোধের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। একই সাথে তারা গণমাধ্যমের সাথেও জড়িত। ভারতের গান্ধীবাদি নেতা শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর সাথে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। জেল খেটেছেন। 'দাঙ্গার ইতিহাস' ও 'জিন্না পাকিস্তান নতুন ভাবনা' তার সাম্প্রদায়িকতার বিরুপ প্রভাব নিয়ে লেখা দুটো উল্লেখযোগ্য বই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ এক দশক, প্রশাসনের অন্দরমহল, বাংলাদেশঃ বাঙ্গালী মানুষ রাষ্ট্রগ্রহন ও আধুনিকতা, বাংলাদেশের রাজনীতিঃ এক দশক, বাংলাদেশের গণতন্ত্রঃ প্রক্রিয়া ও ঐক্যমত্যের উপাদান, ১৯ শতকে বাংলাদেশ এর সংবাদ সাময়িকি পত্রসহ সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতি ও গণমাধ্যম নিয়ে লেখা অসংখ্য গ্রন্থ। তিনি অসাম্প্রদায়িকতার প্রচারক। আব্দুল গাফফার চৌধুরী ১৯৬৪ সালে শান্তি রক্ষা কমিটির একজন উদ্যোক্তা, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী গানের রচয়িতা। কলাম লেখক এবং সাংবাদিক।
আমি সাম্প্রদায়িকতা ও গণমাধ্যমের বিষয়ে বিশিষ্ট তিন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ মতামত নিচে উপস্থাপন করছি।

শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতা, ভারত-বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও রাষ্ট্রের করণীয় বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতের গান্ধীবাদি নেতা শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়কে। ড.আহমদ শরীফ স্মারক বক্তৃতা দিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি। অসাম্প্রদায়িকতার গবেষক এই প্রসিদ্ধ লেখক পশ্চিমবঙ্গে জনসংযোগের জন্য পেয়েছেন পদ্মশ্রী পুরস্কার। বর্তমানে তিনি ভারত সরকারের 'খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগ'-এ দায়িত্ব পালন করছেন।

** ভারত একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র কিন্তু তার মধ্যে জাত্যাভিমান এত বেশি কেন?

দেখুন সংবিধানে লেখা আছে সেকুল্যার তাতেই কি সব সেকুল্যার হয়ে গেছে ? হয়নি। মানুষের উস্মিতা-আত্মপরিচয়ের একটি বড় অংশ ধর্ম। আমি যদি এই মুহূর্তে কোথাও শুনি হিন্দুর উপর আক্রমন হয়েছে নিজেকে যতই অসাম্প্রদায়িক দাবি করি না কেন আমার মধ্যে যে হিন্দু ইনস্টিংক্ট রয়েছে তা জেগে উঠবে, আমাকে প্রভোক করবে। তেমনি আপনার মধ্যেও ইসলামের বোধ জেগে উঠবে, উঠবেনা? একটা মানুষের আইডেনটিটি হয় অনেক কিছু থেকে-ভাষা পরিচয়, এথনেসিটি, জিওগ্রাফিক্যাল, জীবিকার সূত্রেও আইডেনটিটি হয় তাই না? কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে সহজে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবিত করে তার ধর্মপরিচয়। এবং আদিমকাল থেকেই সংঘবদ্ধ হবার প্রেষণা রয়েছে মানুষের মধ্যে। এটি বুঝতে পারে বলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নেতা-কর্মিরা যে অস্ত্রটি ভারতে বেশি ব্যবহার করে সেটি ধর্ম। আবার দেখুন, হয়ত মানুষটির মধ্যে অতটা জাত্যাতিমান নেই যতটা পরিস্থিতিতে পরে সে হয়। স্বেচ্ছায় যে সবাই চড়মপন্থী হয় তা কিন্তু নয়। মিজানুর রহমানের কৃষ্ণ ষোলই বইটি পড়লে দেখবেন, মিজান ভাইয়ের মত একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষের হাতেও কেমন করে ৪৬ এর ডাইরেক্ট একশন ডের দিনে মুসলমানদের দোকানে হামলা দেখে ইট উঠে এসেছিল! তাই সংবিধানে বললেই মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ হয়না আবার নিরপেক্ষ হলেও ধর্ম পরিচয় কিন্তু একেবারে চিরদিনের জন্য মুছে যায়না। ভারতে এত মানুষের একসাথে অবস্থান তাই ঘোষণা দিলেইত আর সেক্যুলার হয়ে যায়না।

**** সেকুল্যার রাষ্ট্র বলার পরও মেজরিটি আর মাইনরিটির মধ্যে ভারতে যে সহিংসতা সেটা নজীরবিহীন। আমাদের দেশেত এমন দাঙ্গা হয়না**

দেখুন প্রতিরোধ করতে গেলে হয় দাঙ্গা। অর্থাত দুপক্ষ যখন জড়িত থাকে। কিন্তু এখানে যদি একপক্ষ থাকে তবেত তা আর দাঙ্গা হয়না। ভারতে আইনের প্রতি সংখ্যা গুরুদের যেমন আস্থা রয়েছে সংখ্যালঘুদেরও তাই। সংখ্যালঘুরাও মনে করে তারা সঠিক বিচারটি পাবে এই মানষিক জোর থেকে হলেও তারা আক্রমনের প্রতিরোধ করে। কিন্তু কোন সংখ্যালঘু যদি ভাবে যে পুলিশ তার অভিযোগ আমলে নেবেনা। এবং পরবর্তীতে তার জান-মালের নিরাপত্তা থাকবেনা তখন সে আর প্রতিরোধ করেনা, দাঙ্গাও হয়না। নিরবে সন্ত্রাস হয় যা এক পাক্ষিক। তখন সংখ্যালঘুরা ঠিকানা বদল বা মেনে নেয়াই শ্রেয় মনে করে।

**** ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার যে উল্লেখ রয়েছে আদৌ সরকার নিজেই কি তার চর্চা করে?**

সরকার সেকুল্যার হবার চেষ্টা করছে তাই বলে সবাই সেকুল্যার হয়নি। বেশিরভাগই হয়নি। এমনকি রাষ্ট্র কি বললেও সেকুল্যার হয়েছে? প্রদীপ জ্বালানো বা নারকোল ভাঙ্গাকে না হয় মনে করলাম যে একটি জীবনাচার, সংস্কার । কিন্তু সরকারি ভবন নির্মাণের আগে যেখানে খোদ সরকারই একজন পুরোহিত নিয়ে এসে পূঁজো করে তারপর বাড়ির কাজ শুরু হয় সেটা কি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়? বাংলাদেশে দেখলাম টিভিতে কোরআন তেলওয়াত, গীতা পাঠ, ত্রিপিটক, শ্লোক এবং বাইবেল পাঠ করে অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। এ একরকম মন্দের ভাল তবে আসলেই ধর্মনিরপেক্ষ হলে এর কোনটাইত আমি প্রয়োজন মনে করিনা। সব অনুষ্ঠানে যে আবার এই চারটিই পাঠ হয় তাওত না।

Dhaka University Institutional Repository

**** ভারতের সেকুল্যারিজমের চিহ্নটা কি?**

আমরা কোন রাষ্ট্র ধর্ম করিনি। সংখ্যালঘুদের আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করিনি। আইন আদালতে যেতে পারলে তারাও ন্যায় বিচার পায়।

**** অধিকার না হয় বুঝলাম রাষ্ট্র এবং সংখ্যাগুরুদের উপর নির্ভর করে কিন্তু ভারত বা বাংলাদেশ যেখানেই হোক সংখ্যালঘুদের কি নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য কিছু করার নেই ?**

বাংলাদেশে একটা বিষয়ের পরিবর্তন হওয়া খুব জরুরি সেটা হলো হিন্দু মেয়েদের বিয়ের পদ্ধতি। যদিও এখন রেজিস্ট্রি শুরু হয়েছে তবে সেটাত আইনগত ভাবে বাধ্যবাধকতায় পড়েনি। তারপর ধরেন, ডিভোর্স এবং দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়েও জটিলতা আছে। এই যে হিন্দু মেয়েরা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় সেটার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। মুসলমান মেয়েরা সম্পত্তির যে ভাগ পায় তাওত পুরুষের সমান না। এখানে যে মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে মুখে ৩ তালাক প্রযোজ্য হয়না এটা খুব ভালো কিন্তু ভারতে আবার এটাকে আইন করা যায়নি। ভারতে মুসলমানদের বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলতে গেলে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠতে পারে। এখানেও সংখ্যালঘুদের বিষয় তাই। এমন অনেক অনেক অসংগতি রয়েছে যার জন্য নিজেরাই সাফার করছে। এটাত সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পড়েনা। নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনে প্রথম ইচ্ছে প্রচেষ্টাত নিজেদের কাছ থেকেই আগে আসতে হবে।

**** সংখ্যালঘুদের নেতৃত্বর বিষয়ে কি বলবেন?**

গুরুত্বপূর্ন বিষয়। শুধু সংখ্যাগুরুদের সদিচ্ছা বা সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত হলেত হবেনা। সংখ্যালঘুদের নেতৃত্ব কারা দেন, কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন সেটাও দেখার বিষয় আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্ষণশীল এমন বয়োজেষ্ঠ্যরা এগিয়ে আসেন তারা নিজেরাই অনেক আচার আচরণ আর সংস্কার দিয়ে পূর্ণ। আবার ধরেন ব্যক্তিগত সুবিধা পেলে অনেক নেতা আর তার সম্প্রদায়ের দাবি দাওয়া নিয়ে ভাবেন না। তাই শুধু সংখ্যাগুরুদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে হবেনা । নেতাদেরও তার সম্প্রদায়ের বিষয়ে সৎ থাকতে হবে। আর যুগের সাথে তাল না মেলালে আপনি পেছাবেন সেত জানা কথাই। এখন সংখ্যালঘুদের দাবি দাওয়া, পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বে আসা উচিত তরুনদের। সেটা ভারতের মুসলমান মাইনরিটি বা বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু যেখানেই হোক।

**** সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মিডিয়ার ভূমিকা কতখানি?**

যথেষ্ট। দেখুন গণমাধ্যম সাধারণের মুখপত্র হলেও এর নিয়ন্ত্রন কাদের কাছে? মালিক কারা? সে কোন রাজনীতির পক্ষপাতিত্ব করে? কাদের সাথে গণমাধ্যমের লেনদেন চলছে, তার বিজ্ঞাপন দাতা কারা সেটা দেখতে হবে। এসব কিছুর সাথে গণমাধ্যমের কতটা লাভ ক্ষতির বিষয় রয়েছে তার উপর নির্ভর করে সে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করবে এবং তাই-ই করে।

Dhaka University Institutional Repository

যদি পলিটিক্যাল এফিলিয়েশন থাকে তবে সেটি প্রাধান্য পাবে এবং সেই অনুযায়ী হবে নিউজের ট্রিটমেন্ট। অবশ্যই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মিডিয়ার রোল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছে করলেই উস্কানী দিয়ে বাড়াতে পারে আবার নিয়ন্ত্রনও করতে পারে।

**** তার মানে কি সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কমিটমেন্ট সেখানে কোন স্বাধীনতা নেই গণমাধ্যমের?**

যতই মুখে বলি স্বাধীনতা স্বাধীনতা! আসলে কি স্বাধীনতা? যে কোন গণমাধ্যমই তার লিডারশীপ, অর্থনৈতিক লেনদেন, রাজনীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। সবসময় সত্য খবর প্রকাশ পেলেত আর দাঙ্গার মত ভয়াবহ ঘটনা পর্যন্ত গড়ায়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অতিরঞ্জন বা খবরকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে প্রকাশে যা খুব অল্পতেই থেমে যেত সেটি আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে রাজনৈতিক লাভ মাথায় রেখেই গণমাধ্যম পরিচালিত হয় সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা অবান্তর।

**** গণমাধ্যমই বড় ভুমিকা, মেজরিটি-মাইনরিটির মধ্যেকার বৈষম্য মুলক বিষয়টি প্রধান নয়?**

দাঙ্গাত সব সময় যে ভেবে চিন্তে করে তা কিন্তু নয়। স্থির ভাবে সিদ্ধান্ত নিলে অনেক সময়ই সহিংসতা এড়ানো যায় কিন্তু স্বভাবে উগ্রতা বেশি থাকলেই সেখানে দাঙ্গার আশংকা বেশি। এর মধ্যে যদি পত্র-পত্রিকা বা গণমাধ্যমের উস্কানী থাকে তবেত আর কথাই নেই। রাজনৈতিক ভাবে ইন্ধনত রয়েছেই। মানুষ কিন্তু সংবাদকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে দেখে।

**** এক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের গণমাধ্যমের অবস্থান কি?**

ভারতের গণমাধ্যমে এটি যথেষ্ট। তবে লোকাল পত্রিকা বা ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিসে যেমন ধরুন, গুজরাত সমাচার এগুলোতে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ বেশি। সেই তুলনায় অল ইন্ডিয়া পত্রিকা যে গুলো সেগুলো অনেক নিরপেক্ষ। একটা উদাহরণ দেই, ১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদ দাঙ্গার ঘটনায় দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল তাই বলে অত হিংস্র ? দীর্ঘদিন বসবাস সম্ভব হতো? সে সময় গণমাধ্যমইত যা হয়নি তা প্রকাশ করে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উন্মত্ত করে তুলেছিল। তার ফলাফলটা দেখুন একটা মন্দিরের সামনে মুসলমান নারী আর সাধুদের সামান্য বাক বিতন্ডা দিয়ে শুরু তারপরের ৪/৫ দিনে কত হাজার মানুষ প্রাণ হারালো? সে সময় গণমাধ্যমই কিন্তু যারপরনাই উস্কে দিয়ে ঘটনাটা ছড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

**** আর বাংলাদেশের গণমাধ্যম ?**

এ বিষয়ে আমার খুব বেশি কিছু মন্তব্য করা ঠিক হবে কি? তবে উপমহাদেশের রাজনীতি প্রায় একই ধারার। মানষিকতাও তাই। ভারতে মুসলমানরা নির্যাতিত হলে এখানেও হিন্দুদের উপর চরাও হয় আর এ ক্ষেত্রেত সত্য মিথ্যা প্রকাশ করে বড় ভূমিকা রাখে গণমাধ্যম তবে এখানে পরিস্থিতি অনেকটা ভালো হয়েছে। ৯০ এর দশকে এদেশের পত্র-পত্রিকায় যতটা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাওয়া গেছে এখন তেমন নয়। আগের তুলনায় অনেক বেশি সম্প্রীতি তৈরী হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।

**** সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কতটা ভূমিকা রাখতে পারে ?**

পুরোটা না হলেও বেশিরভাগটাই। মানুষ গণমাধ্যমকেই বিশ্বাস করে তাই গণমাধ্যমের অসাম্প্রদায়িক হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

**** বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়েছে, তবে শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম উল্লেখ করা রয়েছে।**

আগেই বলেছি মানুষের মধ্যে তার সহজাত ধর্মীয় প্রবৃত্তি রয়েই যায় কিন্তু লক্ষ্য থাকতে হয়। প্রতিটি মানুষকে অসাম্প্রদায়িক হতে হলে চর্চা করতে হয় আর স্বপ্ন দেখতে হবে অসাম্প্রদায়িকতার এভারেষ্ট চূড়ায় পৌছুতে। সবাই যে পৌছাবে এমনটা নয় কেউ হয়ত যাবে কালিম্পং অব্দি, কেউ গ্যাংটক কেউবা পৌছে যাবে এভারেষ্টে। কিন্তু আপনার লক্ষ্য যদি থাকে বঙ্গোপসাগর তবে কতটা যাবেন? মানুষের মধ্যে এই চেতনা তৈরি করার দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রের। মানুষ সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠলে রাষ্ট্র তার সমস্ত নীতি নির্ধারনী-সংস্কৃতি, আচরণ উৎসব দিয়ে মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা তৈরি করবে। সেখানে যদি একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষ আবার রাষ্ট্রধর্ম উল্লেখ থাকে তবে বিষয়টা কি দাড়ায় ? রাষ্ট্র নিজেই কি অসাম্প্রদায়িকতার আচরণ করলো?

**** তুলনামূলক বাংলাদেশ অনেক বেশি অসাম্প্রদায়িক। আপনি কি বলেন?**

তাহলে আমি এবার জিজ্ঞেস করি ? দেশভাগের সময় ভারতের মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি। এখন ১৫ কোটি ছাড়িয়েছে। রেশিওতেও বেড়েছে। সংখ্যালঘু হয়ে সেটা কিভাবে হলো ? কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর শতকরা হারত আশংকাজনকভাবে কমছে, দাঙ্গা হয়না তবে কমছে কেন? কেউ কি অনিরাপত্তা বা সংকটে না পড়লে স্থান পাল্টে ফেলে? আগেই বলেছি অধিকার আছে জানলে প্রতিরোধ আর অধিকার নেই মনে করলে ঠিকানা পরিবর্তন।

Dhaka University Institutional Repository

**** সমাধান কি? সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?**

সবসময় সংখ্যালঘুদের তার ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে এক বা দুই একটু বেশি দিতে হবে। যে দেশেই হোক যে কারণেই সাম্প্রদায়িকতা তৈরি হোক তারা যখন পাওনা থেকে খানিকটা বেশি পাবে তখনই অনিরাপত্তার আশংকা কমে যাবে। আর যদি আপনি দমিয়ে রাখতে ফতোয়া তৈরী করেন, ব্লাসফেমী আইন বা এমন নানা ধর্মীয় কঠোর অনুশাষণের বিধি নিষেধ আরোপ করেন সেত আর উত্তোরণের পথ হলোনা বরং বাড়লো। আর একটা কথা প্রতিবেশির ঘরে যদি আগুন লাগে তা না নিভিয়ে উস্কে দিলে ওই আগুন কিন্তু আপনার ঘরেও এসে পড়বে। আগুন কিন্তু পুড়িয়ে গ্রাস করার সময় হিন্দু-মুসলমান মানেনা।

** আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সবার মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতার কামনা করি। বাংলাদেশের সবাইকে ধন্যবাদ।

শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়
ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জনসংযোগের জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত গান্ধীবাদি নেতা।
১ মার্চ ২০১১। ধানমন্ডি/ঢাকা

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

প্রখ্যাত সাংবাদিক, কলামিষ্ট, লেখক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী তার স্মৃতিচারণায় পাকিস্তান শাষণের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে জানিয়েছেন।

আপনার স্মৃতিতে ৫০ এর দাঙ্গা কিভাবে আছে?

১৯২৬ সাল থেকেই ঢাকায় একটি কনটিনিউয়াস রায়ট শুরু হয়েছিল। এ সময়ত ঢাকায় বছরের পর বছর দাঙ্গা চলে। শাখারীপট্টিতে মুসলমান গেলে ফিরে আসতো না আবার নওয়াবপুরে হিন্দু গেলে ফিরে আসতো না এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বিখ্যাত লেখক সোমেন চন্দ্র এ সময় নিহত হন। ঢাকার রায়ট কখনো বড় আকারে হয়নি তবে প্রতিদিন ই হতো। ব্যাপক দাঙ্গা হয় ১৯৫০ সালে বরিশাল, নোয়াখালীতে। মুসলমান ছিল কৃষক, নিজেদের জমি ছিলনা। ১৯৫০ সালে এমন হয়েছে যে দেখা গেছে ৭৫ টাকায় ঢাকা শহরে বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেছে হিন্দুরা। নালিন্দায় এক হিন্দু জমিদার প্রাণভয়ে পালিয়ে যাবার সময় শুধু যাওয়ার খরচ চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ির বদলে। পাঠ্যপুস্তক-চার আনা পাঁচ আনায় বিক্রি হয়েছে। হিন্দু ছাত্রদের ফেলে যাওয়া বই পুস্তক কিনে কিনে মুসলমান ছাত্ররা পরীক্ষা দিত। আমরাও দিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় তখন সোনার বাংলা নামে একটা ভালো পত্রিকা ছিল। রাউন্ড রীমের কাগজ, কালারে ছাপা হতো। শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল এ পত্রিকায়, এ কাগজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছেন। বর্তমান বিউটি বোর্ডিং এ ছিল সোনার বাংলার অফিস। এই সোনার বাংলার মালিকরা চলে যায় ১৯৫০ এর দাঙ্গায়। পরে এর নাম হয় বিউটি বোর্ডিং এই বিউটি বোর্ডিং এর মালিককেও খুন করা হয় দাঙ্গায়। এখন যেটা বিউটি বোর্ডিং এটার নাম ছিল সোনার বাংলা।

কেন হয়েছিল দাঙ্গা ?

১৯৫০ এর দাঙ্গা লাগানো হয়েছিল সরকারের ইন্ধনে, তারা ভেবেছিল এই দাঙ্গা লাগিয়ে হিন্দুদের ওই পারে পাঠাতে পারলে রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে আর কোন সমস্যা থাকবেনা। সেসময় মুসলমান কৃষকরা ভেবেছিলেন হিন্দু জমিদার চলে গেলে খাজনা দিতে হবেনা। আর সরকার ভেবেছে শুধু মুসলমান বাঙ্গালীরা আর কতটা দাবি জানাবে ভাষার প্রতি? ১৯৪৮ সালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর বাংলা ভাষা প্রস্তাবকে দেখা হয়েছিল হিন্দুদের দাবি হিসেবে।

উল্লেখযোগ্য কি কি মনে আছে দাঙ্গার?

এখন যেটা রোজ গার্ডেন সেটা ছিল ঋশিকেশ বাবুর বাড়ী, মুসলমানরা নিয়ে যেয়ে রোজ গার্ডেন বানালো। সন্তোষের রাজবাড়ী নিয়েছিলেন মাওলানা ভাষাণী তবে তিনি সেটা কিনে নিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।
বাংলা বাজার এখন যেটি সেটার নাম ছিল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। বিখ্যাত নেতা সি আর দাশ তার নামে। এখানে বক্ষ ধর্মের একটি বড় উপাসানলয়ের মত ছিল। এই বাংলা বাজার পাড়াকে বলা হতো লাইব্রেরী পাড়া, আশুতোষ লাইব্রেরী, সাহিত্য কুটির। এগুলি আর কিছুই এখন নেই। সব বেহাত হয়েছে। বরিশালে অশ্বিনী কুমার হলের পিছনে রুচিরা নামে একটি রেস্টুরেন্ট ছিল। এর মালিককে শুধু হিন্দু হওয়ার জন্য পিটিয়ে হত্যা করা হয়। রহমতপুর গ্রামের ১০ থেকে ১২ মাইল দুরে একটা গ্রাম আছে ওখানে ৯ বছর বয়সি একটা মেয়ে ছাড়া আর কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি ৫০ এর দাঙ্গায়। ১০ মাইলের মধ্যে চারপাশে শুধু লাশ আর লাশ ছিল।

১৯৫০ এর আগে থেকেইত সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা শুরু হয়েছিল?

নিজের স্মৃতি কথাই বলি। ১৯৪৫ সালে বরিশাল থেকে ঢাকায় এসেছি চাচাত ভাইয়ের বিয়ের দাওয়াতে। সে সময় লঞ্চে করে এসে নামতে হয়েছে সোয়ারী ঘাটে। চাচাতো ভাই বিয়ে করেছিলেন আব্দুল খালেক ডিআইজির মেয়েকে। সোয়ারী ঘাট থেকে বড়যাত্রী পুলিশ প্রহরা দিয়ে আনা হয়েছিল বিয়ে বাড়ীতে (মাহুতটুলীতে)। কেন জানেন? হিন্দুদের আক্রমনের ভয়ে। তখন থেকেই এখানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আর সু'সম্পর্কে ছিলনা। তবে ১৯৪৬ সালে আর এস পি (রেভ্যুলেশনারী সোশালিষ্ট পার্টি) এবং কমিউনিষ্ট পার্টি খুব শক্তিশালী ছিল। তারা দাঙ্গা বিরোধী মিছিল, শ্লোগান দিত।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানরাওত ঠিক আবার হিন্দুদের জন্য ত্রাস তৈরি করেছিল

হ্যা তাত নিশ্চই। আমার নিজেরইত হেমন্ত কুমার ও জয়ন্ত কুমার নামে দুজন শিক্ষক ছিল। তারা স্টিমারে করে কোথাও জাচ্ছিলেন। সম্ভবত ভাষাণচরের দিকে। হটাত মুসলমানরা নামিয়ে দিয়ে বলে এই স্টিমারে যত হিন্দু আছে সবাইকে হত্যা করা হোক। হত্যা করা হয়েছিল আমার দুই শিক্ষককেও। আরো একজন প্রিয় শিক্ষক ছিল আমার, আশুতোষ ঘোষাল- বরিশালে ঘোষাল পরিবার লেখাপড়া, শিক্ষা দীক্ষা গান বাজনার জন্য ছিল বিখ্যাত। আমার স্কুল সহপাঠি বন্ধু ছিল হিন্দু তারাও ৪৬ সালের দাঙ্গার সময় পালিয়ে ভারতে চলে যায়। এই ক্ষতি বিশাল। আমার বন্ধুদের নাম ছিল, মানিক চন্দ্র, জীবন কুমার গুহ, শিব শংকর ঘোষাল, নারায়ন চন্দ্র ঘোষাল। আমরা সবাই মিলে হাতে লেখা ম্যাগাজিন তৈরি করতাম। ওই বাড়ির সামনে দিয়ে পরে যেতে আমার খুব কষ্ট হতো। প্রতিদিন যেখানে সন্ধ্যা প্রদীপ জলতো, উলু ধ্বনি, শাঁখ বাজতো সেখানে আযানের সুর মানা যায়না, আমার যে কেমন লাগতো! ৪৬ এর পর খুব নামেমাত্র দামে মুসলমানদের কাছে বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। দেশভাগের সময় এ দেশ থেকে যে শিক্ষিত হিন্দুরা চলে গেছে তার যের আমরা এখনও টানছি। আমাদের সময় স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন প্রতাপ চন্দ্র গুহ এম এস সি বিএল। তারা ইংরেজি বাংলা শেখালে তা আর ভুলা যায়না। কোথায় ফজলুল হক ছিল মিনিস্টার সেখানে হাসিনা-খালেদা। তখন ছিল মানের দিক থেকে প্রকৃত শিক্ষিত জনেরা কিন্তু এখন হলো সংখ্যাগত দিক থেকে শিক্ষিত কিন্তু মান নেমে গেছে। এখন আর্থিক ও কমার্শিয়াল দিকের মান বেড়েছে। এখন ভুলে ভরা বাংলা, ইংরেজি। আর ইংরেজি শেখাবার জন্য তখন অসাধারণ শিক্ষকেরা ছিলেন।

দাঙ্গায় আমাদের দেশে মিডিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে বলুন

এখনত মিডিয়া অনেক ভালো আর তখন মিডিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াতো। কাগজ বিক্রির জন্য তখন দেখা গেল এক পত্রিকা লিখেছে শ্যামবাজারে দুই মুসলমান তরুনী অপহৃত সাথে সাথে আরেক পত্রিকা লিখে ফেলত বরিশালে দুই হিন্দু তরুনী ধর্ষিত। এখানে মাইনরিটি কমছে অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার কারনে আর পশ্চিমবঙ্গে যে সাম্প্রদায়িকতা সেটা হলো সামাজিক। সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে মিডিয়ার ভূমিকা নেতীবাচক না ইতিবাচক বলতে বললে আমি এক কথায় বলবো গণমাধ্যম এখন অসাম্প্রদায়িক। তবে তখন তা ছিলনা। গণমাধ্যম উস্কে দিয়েছে। কিন্তু এদেশের মানুষ প্রতিহত করেছে বলেই এখন অসাম্প্রদায়িকতার রুপ নিচ্ছে। ১৯৬৪ সালে কি হয়েছে? আমরাইত গিয়েছিলাম হিন্দুদের বাচাঁতে। আমরাইত পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম রুখে দাড়াবার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৪ র দাঙ্গা বিষয়ে কি বলবেন?

এসময় ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হলো, মুসলমানরা শারদ উৎসব, বাংলা নববর্ষ পালন করছে, শেখ মুজিব তখন বাংলা জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন সেই সময় পাকিস্তান সরকার ইচ্ছে করে দাঙ্গা তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও নজরুল সঙ্গীতের উপর বাধা আরোপ করা হয়।

ও দাঙ্গাটি ছিল হিন্দু- বিহারীদের মধ্যে। মোনায়েম খা সরকার ইচ্ছাকৃত আদমজীর বিহারী শ্রমিকদের পয়সা দিয়ে এনে হিন্দুদের উপর আক্রমন করিয়েছিলেন। নারায়নগঞ্জ ও সাভারে সবচেয়ে বেশি নৃশংসতা ছড়িয়ে পড়ে এসময়। মোনায়েম খা যে পয়সা দিয়ে শ্রমিক ভাড়া করে এনে দাঙ্গা লাগিয়েছিল তার অনেক প্রমান রয়েছে।

সেই সময় ওয়ারীর লাল মিনিস্ট্রিতে মানিক সাহা নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন তিনি ছিলেন অভিনেতা পাহাড়ী স্যানালের মামা। তার ছিল বিরাট বড় বাড়ি। এসময় বাড়িতে বাড়িতে হিন্দুদের উপর আক্রমন হচ্ছে খবর পেয়ে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হক ও আমরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম শান্তি মিছিল করবো। মানিক মিয়া, বাম নেতা মাহবুবে আলী, সম্পাদক আহমেদুর রহিম, জহির রায়হান, ওয়াহিদুল হকসহ আরো অনেকে বেরিয়েছিলেন সেই শান্তি মিছিলে। শান্তি মিছিল করতে করতে যখন আমরা লাল মিনিস্ট্রিতে যাই তখন মানিক সাহার বাড়ির দেয়াল বেয়ে ছোড়া হাতে উঠছেন অনেকগুলো গুন্ডা। তখন ওই বাড়িতে প্রায় ২০০র মত মানুষ আশ্রিত। দিন্নে দুপুর বেলা পুলিশ নেই। পরিস্থিতি এমন খারাপ দেখে ওয়াহিদুল হক পুলিশকে খবর দিলেন কিন্তু পুলিশ আসেনা তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেভাবেই হোক প্রতিরোধ করতেই হবে কিন্তু আমাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই। বুদ্ধি করে জোড়ে জোড়ে শ্লোগান দেয়া শুরু করলাম আমরা 'গুন্ডা ধরো, গুন্ডা ধরো'।

গুন্ডারা যত যাই হোক তারা কিন্তু আসলে সাহসী হয়না। তাদের ধাওয়া দেওয়ার পর যানা গেল এরা সবাই মোনায়েম খান সরকার এর পাঠানো আদমজী মিলের শ্রমিক। পরে গুন্ডাদের তাড়িয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে দেখি অসংখ্য হিন্দু নারী শিশু ওখানে আশ্রিত অবস্থায় রয়েছেন। এর পরই খবর পাওয়া গেল সাভারে লঙ্কা কান্ড ঘটেছে আমরা গেলাম সাভারে, আহমেদুর রহমান আর মিনিস্টার টি আলীর ছেলে নামটা মনে আসছেনা। গেলাম সাভারে ট্রাকের মত বড় একটা গাড়িতে। অনেকগুলো হকিস্টিক হাতে করে গিয়েছিলাম। আমাদের কাছেত আর অস্ত্র নেই তাই হকিস্টিক আরকি। গিয়ে দেখি হিন্দু বড়লোক- ছোটলোক সমস্ত মেয়ে ছেলে সাভার স্কুলে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছে গুন্ডাদের ভয়ে। এবং যে কোন সময় নদীর ওপার থেকে আল্লাহু আকবর বলে আক্রমন হওয়ার আশংকায় তারা সব ভীত সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এর মধ্যে কতগুলো এলাকা আক্রমনের স্বীকার হয়ে গেছে। তখন কিন্তু আমরা নিজেরাও আক্রমনের ভয়ে কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছি কারণ অস্ত্র নেইত। পাশের মিলিটারী ক্যাম্পে জানাতে গেলাম পরিস্থিতির কথা।

যেয়ে দেখি সেখানে একজন ওয়্যারলেসম্যান বসে বসে পাহাড়া দিচ্ছে, পরিস্থিতি জানাতে কি বলে জানেন? আমিত বন্দুক চালাতে জানিনা। এক কনস্টেবল বললো, ওসি ঢাকায় গেছে। আসলে সব সরিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে প্রটেকশন দিতে না পারে।

টি আলীর ছেলে তখন বললো চলেন ঢাকায় যেয়ে পরিস্থিতি জানাই। টি আলীর ছেলে চলে গেল ঢাকায় আর আহমেদুর রহমান আর আমি তখন স্কুলের মাঠে বসে পাহাড়া দিচ্ছি। ওপাড়ে নদী

Dhaka University Institutional Repository

পাড় হয়ে কিন্তু বিহারীরা আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সব বয়সী মানুষ তখন স্কুল ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে। এর মধ্যে যদি আক্রমন করে বসে তাহলে কি করবো? সবাইকে বললাম যার যার বাড়ি থেকে লাঠি নিয়ে আসার কথা। একটা বন্দুক ছিল পুরো গ্রামে একজনের কাছে সেটাই আনতে বললাম। এর মধ্যে ঢাকা থেকে ওয়াহিদুল হক আর টি আলীর ছেলে ফিরে এসেছে। কি আশ্চর্য জানেন? একজন পুলিশও আনতে পারেনি শুধু বেশ কিছু হকিস্টিক নিয়ে এসেছে।

মৌলিক গণতন্ত্র দল নামে একটি দল ছিল তার প্রেসিডেন্ট ছিল ওয়াহিদুল হকের মামা শ্বশুর সে একটি বন্দুক এনেছে সাথে করে। আহমেদুর রহমান সাহেবের ভায়রা তিনি গিয়েছেন রাইফেল নিয়ে। কিছুটা হলেও সাহস বাড়লো আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম গ্রামে যেয়ে যার যাই আছে প্রতিরোধের জন্য নিয়ে আসা হবে। সেই অনুযায়ী স্কুল থেকে আমরা কয়েকজন রওনা দিলাম গ্রামের ভেতরে।

মর্মান্তিক, এরই মধ্যে আক্রমন হয়ে গেছে। ১৬ বছর বয়সী এক মেয়ের স্তন কেটে ফেলা হয়েছে। রায়টত হয়নি হয়েছে গণহত্যা। ওই গ্রামে যেয়ে ৩ জনকে পাওয়া গেল যারা গোঙাচ্ছে তখনও মরেনি। তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হলো সাভারে। সেখান থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার পথেই ২ জন মারা গেল।

পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাড়াও পত্রিকার জন্য ইস্তেহারটি কিভাবে তৈরি হয়েছিল?

ওই যে বললাম ৩ জনের মধ্যে ২ জন পথেই মারা গেল। আমরা লাশ ফেরত পাঠিয়ে চলে এলাম প্রেসক্লাবে। এ বিষয়ে সবার প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার জন্য বৈঠক দরকার। আমরা এসে দেখি আরো অনেকেই এরই মধ্যে জড়ো হয়েছেন। এমনকি গোলাম আযমও এসেছিলেন সেদিন প্রেসক্লাবে। ওখানেই সিদ্ধান্ত হলো যেভাবেই হোক এ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাড়াবোই। আমরা কয়েকজন মিলে ইস্তেহার তৈরি করলাম। সিদ্ধান্ত হলো পরের দিন সব পত্রিকায় হেডিং-এ যাবে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও'। এসময় জহুরু হোসেন চৌধুরী বলেছিলেন, কিসের পূর্ব পাকিস্তান, কাটো-লিখো 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাড়াও'। সবাই স্বাক্ষরও করেছিলাম সেই ইস্তেহারে। ইস্তেহারে স্বাক্ষরের কারণে আমাদের নামে মামলা করেছিলো মোনায়েম সরকার।

তারিখটা ঠিক মনে নেই। জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে সব পত্রিকার হেডিং-এ এক শিরোণাম ছাপা হয়েছিল। এমনকি তখন স্টেট পত্রিকাগুলোও উপায়ন্তর না দেখে এ দাঙ্গার বিরুদ্ধে লিখতে বাধ্য হয়েছে।

প্রেসক্লাবের উল্টো দিকে একটা অফিস ছিলো সাইদুর রহমানের। ওখানে এসে বঙ্গবন্ধু বসতেন। ইস্তেহার লেখার পর সিদ্ধান্ত হলো সম্ভাব্য আক্রান্ত যায়গাগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হবে। ওই অফিসে বসেই স্কট পাঠানো হলো ওয়ারীতে, বনগ্রামসহ বিভিন্নস্থানে। কিন্তু দেখুন ১৯৬৪র সেই দাঙ্গায় হিন্দুদের পাশে মুসলমানরা দাড়ায়নি? মুসলমানরাইত দাড়িয়েছে। গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক সময়েই উস্কানী দিয়ে বাড়িয়েছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যে সম্প্রীতি এবং গণমাধ্যমও যে অসাম্প্রদায়িক সেই প্রমান ১৯৬৪র দাঙ্গায় গণমাধ্যম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগতভাবে কি আপনি অসাম্প্রদায়িক হতে পেরেছেন?

আমরাও ছোটবেলায় সাম্প্রদায়িকই ছিলাম কিন্তু অসাম্প্রদায়িক হয়েছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখার ফলে।

আমার শিক্ষক আশুতোষ ঘোষাল এত ভালো বাংলা জানতের নজরুল বলেছিল কলকাতায় চলে আসো, জাননি। এত বড় অসাম্প্রদায়িক মানুষ যে ইকবালের নয়া শীর বা সীমানা অনুবাদ করেছিলেন তিনি। সেই মানুষ ৫০ এর দাঙ্গায় এতটা আহত হয়েছিলেন যে অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রীকে রেখে চলে গিয়েছিলেন নিরুদ্দেশে। এরপর তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো কোথায় জানেন? পাবনার একটি ঠাকুরের দলে। অনুকুল ঠাকুরের শিষ্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। আসলে জন্মগতভাবে সবাই কম বেশি সাম্প্রদায়িক এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে সাম্প্রদায়িকতা দেখে কেউ আরো বেশি সাম্প্রদায়িক হয় কেউ হয় অসাম্প্রদায়িক।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কি বলবেন?

আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এখনও সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কি পরিমাণ সংখ্যালঘু আছে ভাবুনত? সব ক্ষেত্রেইত এমন। সরকার ও জনগণ সবারই মনে রাখা উচিত, ধর্ম যার যার কিন্তু রাস্ট্র সবার সমান।
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

ফেব্রুয়ারী ২০১১, বনানী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন

১. বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে দাঙ্গার সংজ্ঞা কি?

দাঙ্গার অনেক রকম কনসেপচুয়াল থিওরেটিক্যাল থিওরি থাকতে পারে তবে এক পক্ষ আরেক পক্ষর উপর ঝাপিয়ে পড়লেই শুধু দাঙ্গা নয়। এই যে হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গা হচ্ছে, জমি দখল হচ্ছে এসবই দাঙ্গা। নানারকম নির্যাতন যে ধর্মের কারণে হচ্ছে সেটা দাঙ্গা। সন্ত্রাসইত এক ধরনের দাঙ্গা। ৭২ সালের পরে আমাদের এখানে (বাংলাদেশ) যা হয়েছে সেগুলোতো হিন্দুদের টার্গেট করেই হয়েছে। অবশ্যই এগুলো দাঙ্গার ডেফিনেশনের মধ্যেই পড়ে। যেমন বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পরে আমাদের এখানে যা হয়েছে সেগুলিত দাঙ্গা। তারপর ২০০১ থেকে ২০০৬ এ যেটা হয়েছে সেগুলোকে সন্ত্রাস বলা যেতে পারে কিন্তু দাঙ্গাওত এক ধরণের সন্ত্রাস। সুতরাং দাঙ্গা হয়েছে।

২. কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকার সময় বেশি হয়েছে?

বেশিরভাগ হয় যখন স্বৈরাচারী শাষণ হয় তখন। এরশাদ আমলে হয়েছে, খালেদা জিয়ার আমলে হয়েছে। শুধু জমি নেয়াই দাঙ্গা না। ৪৭ এ মুসলমানরা হিন্দুদের জমি নিয়েছে। ৭৫ এ হয়েছে। ৭১ এ আবার মুসলমানরা মুসলমান মহাজনদের জমি নিয়েছে। হিন্দুরাওত দেখা গেছে পরিবারের একজনের জমি আরেকজন নিচ্ছে। ফলে সবই যে আওয়ামী লীগ-বিএনপি নিচ্ছে তাও কিন্তু নয়। নিজেরাও নিজেদের জমি গ্রহন করছে সেসব ইতিহাসও রয়েছে। তাই জমি গ্রহন করাই শুধু দাঙ্গা নয়। অংশ মাত্র। দাঙ্গা বলতে যেটা বোঝায় ফিজিক্যালি ইনহেরেট করা, উপাসনালয় ভাংচুর এগুলোত বিএনপি, এরশাদের আমলে হয়েছে। তার আগে পাকিস্তানের স্বৈর শাষণের সময় হয়েছে।

৩. এর পেছনে ডিভাইড এন্ড রুলস কতটা দায়ি?

রাজনীতিত অবশ্যই দায়ি তবে এটা একটা তত্ত্ব যে ডিভাইডস এন্ড রুলস। যতদিন হিন্দুরা আধিপত্য বিস্তার করেছে ততদিন এই প্রশ্নগুলো আসেনি। কিন্তু ১৯ শতকের শেষ দিক থেকে যখন মুসলমানদের দাবি -দাওয়া বাড়তে লাগলো তখন থেকেই কিন্তু টেনশান বাড়লো। আর এর সুযোগ নিয়েছে রাজনীতিবিদরা, সুযোগ নিয়েছে যারা শাষক তারা। দু'পক্ষের কারণেই কিন্তু বিভেদটা চড়ম আকারে যেয়ে দাঙ্গা ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. তার মানে এক পক্ষ অন্য পক্ষর আধিপত্য মেনে নিলে আর দাঙ্গা হতো না?

মুসলমানরা ভয়েস রেইজ না করলে দাঙ্গা হতো না। ডিভাইড এন্ড রুলস এতে ইন্ধন দিয়েছে কিন্তু সমস্যা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেই ছিল। আর মুসলমান বলেন, হিন্দু বলেন এক পক্ষ তার অধিকার না পেলে ভয়েস রেইজ করবে সেটাই স্বাভাবিক। অতএব দাঙ্গা কিন্তু হতোই। ভাগ হলো কেন দেশ? মুসলমানরা আলাদা দেশ চেয়েছিল বলেইত ভাগ হলো। সেটাওত রাজনীতিরই একটা অংশ। মুসলমানরা যদি বলতো পৃথক দেশ হবেনা তবে দাঙ্গা হতো?

৫. রাজনীতি, অর্থনীতি বা ধর্ম কোনটির জন্য দাঙ্গা বেশি হয়েছে বা হচ্ছে?

ধর্ম ও অর্থনীতিকে ব্যবহার করেই আসলে দাঙ্গা হচ্ছে। যেমন আমিনীরা করছে। কিন্তু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আসলে দাঙ্গা হয়নি, হচ্ছেওনা। শাষকরা ও রাজনীতিবিদরা নিজেরাই চায় ডিভাইস। ফ্র্যাকশন থাকলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সুবিধা হয়। আওয়ামী লীগ-বিএনপি দলের মধ্যেও দেখবেন অনেক ফ্র্যাকশন। উপর থেকেও এগুলো ইচ্ছেকৃত করা হয় যাতে আধিপত্য বজায় থাকে। আধিপত্য বজায় রাখা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা এটাই হচ্ছে মুল ব্যাপার। দাঙ্গায় রাজনৈতিক প্ররোচনা থাকেই। আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক কারনত আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। আদিকাল থেকে যতগুলি দাঙ্গা হয়েছে তাতে একটা অংশ কিন্তু সবসময়েই গেছে ওই দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে। সেটা যে আমলেই হোক। উগ্র জাতিয়তাবাদি হলে দাঙ্গা বেশি হয়। যেমন এরশাদ ও খালেদা জিয়া উগ্র ডানপন্থী। তাদের সময়ই দাঙ্গা বেশি হচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ বা কমিউনিষ্টদের আচরণ? এসময় দাঙ্গা হচ্ছেনা। ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদ মিলে গেলেই একটি অন্য রুপ পায়। অতএব রাজনীতির কারণে হচ্ছে তবে ধর্মকে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬. গণমাধ্যমের ভূমিকা কি ?

আমাদের দেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা ভালো। দু-একটি পার্টি পত্রিকা ছাড়া। গণমাধ্যম সব সময় এ ধরণের বিষয়গুলোতে রুখে দাড়িয়েছে।

৭. গণমাধ্যম নিরপেক্ষ বলছেন?

একটি বিষয় গণমাধ্যমের মালিকানা হচ্ছে নতুন টাকাওয়ালাদের হাতে এরা কোন না কোনভাবে সাম্প্রদায়িক। কিন্তু এতে যারা কাজ করছে তারা বেশিরভাগই অসাম্প্রদায়িক। তাই মালিক পক্ষপাতিত্ব করলেও কর্মীদের মনোভাবের কারণে খুব সাম্প্রদায়িক হতে পারছেনা। অনেক পত্রিকাতেই দেখবেন ডানপন্থা মালিক কিন্তু যারা কাজ করছে তারা বামপন্থী। তাই মালিক চাইলেই সাম্প্রদায়িক সংবাদ প্রকাশ করতে পারেনা। অনেক পত্রিকাই ভারসাম্য রাখার জন্য সংবাদ প্রকাশ করে, আবার বেশির ভাগ পত্রিকাই নিজস্ব বিবেকবোধ থেকেই আমার মনে হয় অসাম্প্রদায়িক। যেমন ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তখন

Dhaka University Institutional Repository

থেকে এটা শুরু হয়েছে, তখন থেকেই কিন্তু নির্মুল কমিটি রাস্তায় বেরিয়েছে। জণকণ্ঠ, ভোরের কাগজ এসব পত্রিকায় কিন্তু নিউজগুলো আসা শুরু করেছে। মেজর পত্রিকাগুলো যারা নাকি তখন বিএনপির সমর্থক ছিল তারা মাসখানেক পর দেখলো যে এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ না করা হলে পক্ষপাতিত্ব দৃষ্টি কটু হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশ শুরু করলো। তবে সাধারণভাবে বলবো যে মিডিয়া সবসময় ভালো রোল নিচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে। এমনকি যারা সাম্প্রদায়িক আচরণ করে তাদেরও কিন্তু মানুষ ভালোভাবে গ্রহন করেনা। যেমন ধরেন ৯০ এর দশকে গিয়াস কামাল চৌধুরীর ভুল খবর এখানে দাঙ্গা শুরুর একটা কারণ। কিন্তু গিয়াস কামালত সেই যে নিন্দিত হলো তারপরত আর নন্দিত হয়নি।

৮. ভারতের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন আর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন কি এক শ্রেণীর ?

আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের এখানে সংখ্যালঘুরা যেভাবে নিপীড়িত ভারতে সেভাবে নয়। ভারত একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু নির্যাতন হয় পাকিস্তানে এরপর বাংলাদেশে। পাকিস্তানেত এক রকম সংখ্যালঘু শেষই করে ফেলেছে। আমাদের এখানে সংখ্যালঘুদের পক্ষেও অনেকে রুখে দাড়িয়েছে। এখানে নিপীড়িত হচ্ছে চাকরির ক্ষেত্রে। ভারতে চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য হতে পারে, স্ট্রং মিডিল ক্লাশ এলিগেশেন থাকতে পারে তবে জ্ঞানত একেবারে বাধা দেয়া হয় তা নয়। ভারতে প্রেসিডেন্ট হয়েছে মুসলমান। আমরা কি ভাবতে পারি যে আমাদের দেশে হিন্দু রাষ্ট্রপতি হবে ? এ দেশে যদি কোনদিন হিন্দু বা কোন সংখ্যালঘু সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর হয় সেদিন বোঝা যাবে আমরা একটু হলেও অসাম্প্রদায়িক হয়েছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যথেষ্ট সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে। যেমন হাসানুজ্জামান নামে একজন ছিলেন যিনি মেয়েদেরকে বলতেন, মাথায় আচল দাওনি কেন? কলেমা পড়ো ইত্যাদি। একমাত্র ইউনিভার্সিটিতে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন পর্যন্ত কোন সাম্প্রদায়িক জটিলতায় আবর্তিত হয়নি। এছাড়া সব ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতার দোষে অভিযুক্ত। সেনাবাহিনী বলেন বিচার বিভাগ বা সরকারি চাকরী।

৯. সরকারের কি করা উচিত?

মানুষকে সচেতন করা উচিত। একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাস্ট্রের জন্য সেইভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করা উচিত।

১০. সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম উল্লেখ বিষয়ে কি বলবেন?

আমরাত স্ট্রংলি এ বিষয়ে অমত পোষণ করেছি। পার্লামেন্টে বিশেষ নাগরিকদের ডাকা হয়েছিল অভিমত চাইতে। আমরাত রাষ্ট্রধর্ম উল্লেখ এর বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষেধ করে এসেছি। এটা হতে পারেনা। সংবিধানে কোন রাষ্ট্রধর্ম উল্লেখ রেখে আমরা অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ বলা হাস্যকর।

Dhaka University Institutional Repository

১১. সংখ্যালঘুদের কিছু করা উচিত না? তাদের কি কোন মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন নেই?

করার আছে। পাশে প্রতিবেশি ভারত বলে হিন্দুরা ভাবে ওটা হিন্দুদের দেশ, কিছু হলেই তারা দেশ ছেড়ে যায়। এ দেশকে নিজেদের দেশ মনে করেনা। কিন্তু আমিওত নির্যাতিত হচ্ছি। নির্যাতনের কোন শ্রেণী নেই। আমি কি ভাবি যে কিছু হলেই দেশ ছেড়ে যাব ? আমিত ভাবিনা। নির্যাতন হলেও এটা আমারই দেশ এখানেই বোঝাপড়া করতে হবে এমন মনোভাব কাজ করে। সংখ্যালঘুদের মধ্যেও এমন মনোভাব কাজ করতে হবে। এটা নিজেদের দেশ মনে করতে হবে। আমিও যখন মার খাচ্ছি তখন তাকে বুঝতে হবে যে সে মার খেলেই এটা শুধু সংখ্যালঘুর জন্য এটা ভাবা ঠিক না। সংখ্যালঘুদের সমস্যা হচ্ছে তাদের যে একটা স্ট্রং মিডিল ক্লাশ ছিল সেটা নেই। সেটা থাকলে শিক্ষায় তারা এগিয়ে যেত। কম্পিটিশনে আগাতো তাহলে একটা ব্যালেন্স হতো। সংখ্যালঘুত হ্রাসও পেয়েছে। যতদিন সংখ্যালঘুদের স্ট্রং মিডিল ক্লাশ তৈরী না হচ্ছে ততদিনে এই বৈষম্য দুর হবেনা।

১২. এ ধরনের নির্যাতনে সমাজে সরাসরি খারাপ প্রভাব কি পড়ছে?

না সেভাবে সরাসরি প্রভাবেরত আর এখন কিছু নেই। যারা নির্যাতন করে তারা কি এটা নিয়ে কিছু ভাবে? ভাবেনাত। ৪৭ এর আগে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা ছিল। এখনত হ্রাস পেতে পেতে আর তাদের ভূমিকা না থাকলে বড় কোন প্রভাবের কথা ভাববার নেই। মুসলমানও তো অনেকেই নেই। তাতে কি আসে যায়? সে অর্থে প্রভাব পড়েনা।

১৩. সংখ্যালঘুদের নিজেদের মধ্যে কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন অধিকার আদায়ের জন্য?

তাদের কে কতগুলো বাস্তব বিষয় নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে। তাদের নিজেদের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন দরকার। তাদেরত আমাদের শত্রু ভাবলে হবেনা। এখানে আমার যতটুকু অধিকার আছে সংখ্যালঘুরও তাই। সে যদি মনে করে কিছু হলেই সে সংখ্যালঘু বলে নির্যাতন হয়েছে, কিছু হলেই আমরা তাদের শত্রু আর তারা সুযোগ পেলেই ভারতে চলে যাবে তাহলেত অবস্থার পরিবর্তন হবেনা। এ ধরনের মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসার অনুশীলন করতে হবে। তাদের নিজেদের বাংলাদেশ-এর নাগরিক ভাবতে হবে। তার নিজেরওত অনেক কর্তব্য আছে দেশের জন্য। হিন্দু না মুসলমান সেটাত ভাবলে চলবেনা। আমাকে অধিকার না দেয়া হলে আমি সেই ভাবে অগ্রসর হবো। এই মনোভাব তাদের থাকা উচিত। প্রথমেই যদি নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক না ভেবে ভাবি আমি হিন্দু তাহলেত আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব না। তবে প্রত্যেক দেশে একটা মাইনরিটি সাইকোলজি থাকে এটাও আবার আমাদের বুঝতে হবে। এটা দুর করাও কিন্তু কঠিন। এই মাইনরিটি সাইকোলজি আবার সব দেশেই আছে। ভারতেও মুসলমানদের মধ্যে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ভারতে যেমন ধর্মের কারনে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয় আমাদের এখানে কি ধর্মের কারনে সেভাবে নির্যাতিত হয়, না নির্যাতিতই আলাদা একটা শ্রেণী?

সেটা আছে কিন্তু ধর্মের জন্যও হয়। আমাদের এখানেও হয়। কিছু হলেই আমরা বলিনা , মালু করেছে? নমুর জাত? আসলে দীর্ঘদীনের এই শ্রেনী সংস্কৃতির মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসাটাই দুরহ। ভারতে নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি থাকলে বেশি হয়। কংগ্রেস থাকলে কম। বাংলাদেশেও তাই বিএনপি, জামায়াতের সময় বেশি। আওয়ামী লীগ থাকলে কম। রাজনৈতিক মনোভাবের উপর নির্ভর করে তবে ধর্মের কারণে এখানেও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হয়। এদেশের মন্ত্রীসভায় কজন হিন্দু আছে? যা আছে তাত টোকেন। আর অন্যান্য সেক্টরের কথা আগেই বলেছি। আমরা কি ভাবতে পারি হিন্দু প্রেসিডেন্টের কথা? আমাদের এখানে হবেনা।

১৫. সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য রাজনৈতিক কোন কারণগুলো বেশি দায়ি?

সামরিক শাষণ, দক্ষিণ পন্থার উদ্ভব এবং ইসলামাজাইশনের কারনে ধর্মকে বেস করে নির্যাতনের মাত্রাটা বেশি। আমার কাছে মনে হচ্ছে পাকিস্তান আমল থেকেই এটা বেশি হচ্ছে।

১৬. পুনরায় দাঙ্গা হবার কোন সম্ভাবনা আছে?

যদি বিএনপি জামাত ইসলাম আসে তাহলে পুণরায় দাঙ্গা হতে পারে।

আপনাকে ধন্যবাদ

আপনাকেও ধন্যবাদ

১৭ মে ২০১১. লেকচার থিয়েটার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পুরো আলোচনার ৭ টি অধ্যায়ে সাম্প্রদায়িকতা কি এবং এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা কি হতে পারে তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিভিন্ন গণমাধ্যম প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সেই উদাহরনই দেয়। ভারতের লোকাল বেজে পত্র-পত্রিকা এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক সে তুলনায় অল ইন্ডিয়া পত্র-পত্রিকা কম সাম্প্রদায়িক আচরণ করে। তবে ভারতের পত্র-পত্রিকার সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম অনেক বেশি অসাম্প্রদায়িক।

ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার রোল নিরপেক্ষ বলা চলে। বিশেষ করে একবিংশ শতকে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা জরুরি সেটা হলো সাম্প্রদায়িক চেতনা বাড়িয়ে দেয়াই শুধু দুর্বলতা নয়, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার খবর কম প্রচার করে তা উপেক্ষা করাও এক ধরণের সাম্প্রদায়িক আচরণ। আর এ দুর্বলতা আমাদের গণমাধ্যমের রয়েছে। অতএব পুরোপুরি নিরপেক্ষ বলাও শুদ্ধ নয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম যদি তার নিজের দায়িত্বটি সচেতনভাবে পালন করে অনেকাংশেই সহিংসতা নিরোধ সম্ভব। শুধু কোন উন্মেষ তৈরি হলেই নিরপেক্ষ থাকা দায়িত্ব নয়। সঠিক তথ্য প্রচার ও সহিংস ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে সঠিক ব্যাখ্যা মানুষের জন্য উপস্থাপন খুব জরুরি। সরকার-রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত না হয়ে এবং সংখ্যাগুরু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সঠিক কারণ নির্নয় ও তা প্রকাশ গণমাধ্যমের জন্য জরুরি। বিভৎসতা প্রচারের দিকে গণমাধ্যমের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষের ফলাফল কতটা ভয়াবহ হতে পারে কত প্রাণহানি, কত মানুষ গৃহচ্যুত হয় আর সেই প্রভাব আমাদের সামগ্রিক জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়কেও প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই ক্রমাগত সংখ্যাগুরু দ্বারা সংখ্যালঘু নির্যাতন যে একটি রাষ্ট্রে সবসময় অস্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা নতুন কথা নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার কোন বিকল্প নেই। এর সাথে ধর্মীয় বোধের কোন বিরোধ নেই। ধর্মকে রাজনীতির জন্য ব্যবহার না করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। আর গণমাধ্যম যেহেতু নিয়ন্ত্রিত হয় অনেকাংশেই রাজনীতিবিদ দ্বারা সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন কিন্তু এই নিরপেক্ষতা বাঞ্ছনীয়। রাজনীতিবিদ দ্বারা গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত হলেও স্বাধীন সংবাদ প্রচারের সব অধিকার গণমাধ্যমের রয়েছে। সেটা প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক্স সব ধরণের মিডিয়ার জন্য প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক আলোচনাতেই এ কথা স্পষ্ট যে সাম্প্রদায়িক উন্মেষ কোন সরকারের সময়ে কম হলে অন্য সরকারের ক্ষেত্রে তা বেড়ে যাওয়ার প্রবনতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমও তার রূপ পরিবর্তন করে। সরকারের সাথে সম্পর্ক রেখে সেও সাম্প্রদায়িক আচরণ প্রকাশ করে। কিন্তু সরকারের রোষে থেকেও যে গণমাধ্যম তার দৃঢ় অবস্থান নিতে পারে এর সবচেয়ে বড় উদাহরন পাকিস্তান শাষনামলে সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৬৪ সালের ১৭ জানুয়ারি সব পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও' শিরোনামটি। এই একটি অসাম্প্রদায়িকতার কলাম আমাদের গণমাধ্যমের ইতিহাসের মাইল ফলক বলা যায়। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ বিষয়েও এ দেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক পত্রিকা তখন ভারত বিদ্বেষী মনোভাব দেখিয়ে উসকে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতার আগুন কিন্তু মুল ধারার গ্রহনযোগ্য প্রত্রিকাগুলো ঠিকই নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশ করেছে। যেসব পত্রিকা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ধামাচাপা দিয়ে বরং ধর্মীয় মনোভাব উস্কে দিতে ভূমিকা রেখেছে তারা নিন্দিত এবং সময়ে দেখা গেছে সাধারণ মানুষের কাছে তারা গ্রহনযোগ্যতা হারিয়েছে। ২০০১ নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতার ঘটনা নিয়ে অনেক পত্রিকা পক্ষপাতিত্ব করলেও এক পর্যায়ে জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য তাদেরও সত্য প্রকাশের বিকল্প ছিলনা।

অল্প সময়ের জন্য পাঠক চাহিদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভূল তথ্য প্রচার করে ব্যবসা বৃদ্ধি করলেও আসলে সত্য যখন প্রকাশ হয় তখন জনপ্রিয়তা হারাতে হয় এই সত্যটি গণমাধ্যম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবার মনে রাখা খুব জরুরি।

গণমাধ্যম যদি তার নিরেপেক্ষ থাকার অধিকার মনে রেখে সচেতন হয়ে নিজস্ব ভূমিকাটি পালন করে এবং সবসময় জনগণের কাছে সত্য তথ্য উপস্থাপনের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে তাহলেই অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং দাঙ্গা প্রতিহত করা সম্ভব। গণমাধ্যমের প্রতিটি পদক্ষেপই তাই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি পুরো আলোচনায় এ বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।